আনিস চৌধুরীর নাটক: জীবন ও শিল্প

মীরহুমায়ূন কবীর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রিরজন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
এপ্রিল ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে *আনিস চৌধুরীর নাটক : জীবন ও শিল্প* শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভের বিষয়-নির্বাচন থেকে শুরু করে সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও সস্নেহ তাগিদ দিয়ে আমার কাজের গতি ত্বরান্বিত করেছেন। তাঁর কাছে আমার সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক বায়তুল্লাহ্ কাদেরী এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. নুরুন্নাহার ফয়জের নেছা। তাঁদের সবাইকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এছাড়া পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল আলীম, সহকারী অধ্যাপক তানভীর হায়দার; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক শরীফ সিরাজ, জান্নাত আরা সোহেলী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক তানিম জসিম, রাফাত মিশু; এবং দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সাংবাদিক শিবলী নোমানী প্রায়শ আমার গবেষণাকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এবং আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এঁদের বন্ধুত্ব আমি আমার জীবনের জন্য পরমপ্রাপ্তি মনে করি।

আনিস চৌধুরীর কন্যা বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরী গবেষণাকালে অনেক অজানা তথ্য প্রদান করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়া প্রয়োজনীয় গবেষণাগ্রন্থের সন্ধান দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক, নাট্যনির্দেশক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। আনিস চৌধুরীর ওপর নির্মিত একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি, অনেকগুলো দুর্লভ আলোকচিত্র এবং তাঁর বেশ কিছু পুরাতন লেখা সরবরাহ করে আমাকে ঋণী করেছেন বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক আনিসুল হক বরুণ। তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণা-অভিন্দর্ভ রচনার জন্য আমি ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সেমিনার এবং পাবনার অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি। বিশেষত অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক জনাব আহসানুল আলম বকুল নানা সময় প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য বই প্রদান করে আমাকে চিন্তামুক্ত করেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

বাবা মীর হান্নানুর রহমান, মা হাসিনা বানু এবং অনুজ হুসাইন কবীর বাঁধন পারিবারিক সকল প্রকার দায়দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে আমার গবেষণাকালকে বহুলাংশে নির্বিঘ্ন করেছেন। সহধর্মিণী কবিতা সুলতানার হাসিমুখ আমাকে উদ্দীপিত করেছে, শিশুকন্যা মৃত্তিকার সুখসঙ্গ আমার গবেষণা-মুহূর্তকে করে তুলেছে আনন্দময়। এঁদের প্রতি আমার অফুরাণ ভালোবাসা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বাংলা নাটকে আনিস চৌধুরীর অবস্থান বিশিষ্ট। সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় বিচরণ করলেও নাট্যকার হিসেবেই তাঁর পরিচিতি সমধিক। কেবল বিষয়বৈচিত্র্যেই নয়, সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানেও তাঁর নাটক সমৃদ্ধ। আমাদের সদ্যসম্পন্ন এম. ফিল. গবেষণা-অভিসন্দর্ভও রচিত হয়েছে তাঁর নাট্যকর্ম অবলম্বনে। তাঁর প্রকাশিত বারটি নাটকেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে মধ্যবিত্ত জনজীবনের পরিচিত পরিসর। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিচিত্তের প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা, হতাশা-ব্যর্থতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বেদনা-বিলাপ কিংবা নৈতিক স্খলন-পতন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নাটকে। তাই তাঁকে মধ্যবিত্ত জীবনবৃত্তের শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় অনায়াসে। তাঁর জীবন ও শিল্পের স্বরূপ অন্বেষাই বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য।

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম *আনিস চৌধুরীর নাটক : জীবন ও শিল্প*। এর প্রথম অধ্যায় 'আনিস চৌধুরীর জীবন ও মানসগঠন'। এখানে আনিস চৌধুরীর ব্যক্তিজীবন এবং তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তিনি কীভাবে বেড়ে উঠেছেন তা তথ্যাকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলা নাট্যধারায় আনিস চৌধুরীর অবস্থান'। এ-অধ্যায়ে বাংলা নাটকের উৎস ও বিকাশের পর্যায়সমূহ পরিচিহ্নিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন নাট্যকারের নাট্যকর্ম এবং তাদের নাট্যপ্রবণতা প্রদর্শিত হয়েছে। সর্বোপরি বাংলা নাটকের সুদীর্ঘ এ পথযাত্রায় আনিস চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্যও সুচিহ্নিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'আনিস চৌধুরীর নাটকে উপস্থাপিত জীবনের স্বরূপবৈশিষ্ট্য'। এ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই মধ্যবিত্তের ক্রমবিবর্তমান স্বরূপ-সন্ধানসূত্রে আনিস চৌধুরীর নাটকে মধ্যবিত্ত চরিত্রের গতিপ্রকৃতি নির্দেশিত হয়েছে। অধ্যায়টি বিন্যস্ত হয়েছে দুটি পরিচ্ছেদে–

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিভাগোত্তরকালের নাটক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীনতা-উত্তরকালের নাটক

প্রথম পরিচ্ছেদে বিভাগোত্তরকালে আনিস চৌধুরীর রচিত নাটকের স্বরূপবৈশিষ্ট্য অঙ্কিত হয়েছে; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকালের নাটক।

'উপসংহার' অংশে উপস্থাপিত হয়েছে আনিস চৌধুরীর জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত বয়ান-বৃত্তান্ত।

সর্বশেষে প্রদর্শিত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আনিস চৌধুরীর জীবন ও মানসগঠন ৫-১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা নাট্যধারায় আনিস চৌধুরীর অবস্থান ১৯-৫৩

তৃতীয় অধ্যায়

আনিস চৌধুরীর নাটকে উপস্থাপিত জীবনের স্বরূপবৈশিষ্ট্য ৫৪-৭১

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভাগোত্তরকালের নাটক ৭২-১০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা-উত্তরকালের নাটক ১০৫-১৪৪

উপসংহার ১৪৫-১৪৭

গ্রন্থপঞ্জি ১৪৮- ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
আনিস চৌধুরীর জীবন ও মানসগঠন

বাংলাদেশের সাহিত্যধারায় আনিস চৌধুরীর (১৯২৯-১৯৯০) অবস্থান অনন্য। পেশাগত জীবনে সাংবাদিক হলেও সাহিত্যের নানা শাখায় ছিল তাঁর গর্বিত পদচারণা। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য প্রভৃতি রূপকল্প প্রণয়নে কারুদক্ষতার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করলেও নাটক রচনায় তিনি অর্জন করেছেন সমধিক খ্যাতি। *মানচিত্র* (১৯৬৩) কিংবা *এ্যালবামের* (১৯৬৫) মতো বহু অভিনীত ও মঞ্চসফল নাটকের সফল নির্মাতা তিনি। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে বিভাগোত্তর পর্যায়ে যে কজন নাট্যকার বেতার ও মঞ্চোপযোগী নাটক নির্মাণে কৃতিত্ব সম্পাদন করেছেন তাঁদের মধ্যে আনিস চৌধুরীর অবস্থান উল্লেখযোগ্য। নাগরিক মধ্যবিত্তের ভাঙাগড়াময় জীবনের সফল রূপকার তিনি।

১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের মধ্য দিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক যে সৃজনশীল সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তাদের অন্যতম ছিলেন আনিস চৌধুরী। এ-সময় পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক শিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মানসক্ষুধা মেটানোর গুরুদায়িত্ব যাঁরা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। বস্তুত আনিস চৌধুরী ছিলেন বাস্তববাদী নাট্যকার। তিনি তাঁর নাটকে বাস্তবজীবনের বিচিত্র গতিচিত্র ব্যাপকভাবে অঙ্কন করেছেন। সমকালে নুরুল মোমেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আসকার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ নাট্যশিল্পী যখন নাট্যরচনায় বৈচিত্র্যধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জনচিত্ত আকর্ষণে সক্ষমতা প্রদর্শন করছিলেন তখনই তাঁর নির্মোহ আত্মপ্রকাশ ঘটে। গল্প-উপন্যাসে তিনি রোমান্টিকতা-আশ্রয়ী জীবন-ভুবনে বিচরণ করলেও মঞ্চ, টেলিভিশন এবং বেতার নাটকে তিনি অবলম্বন করেছেন মধ্যবিত্তের চিরপরিচিত জীবন-পরিসর। বিশেষত মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখ, স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা এবং অচরিতার্থতা ব্যাপকভাবে শিল্পরূপ পেয়েছে তাঁর নাটকে।

আনিস চৌধুরী ছিলেন জনান্তিকের সাহিত্যিক। অনেকটা নীরবেই তিনি সাহিত্যসাধনা করেছেন। আশৈশব সংগ্রামশীল এ-মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ, কর্তব্যসচেতন ও উদ্যমী। ব্রিটিশ আর পাকিস্তানি শাসনামলের দুর্দশা তিনি যেমন দেখেছেন ঠিক তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশে বিপুল মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যাতনাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই অর্থে

তিনি ছিলেন ত্রিকালদর্শী। ত্রিকালের ভাঙাগড়াময় জীবনবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য-মানস। এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজপরিসর এবং বিচিত্রমাত্রিক অধ্যয়ন ও পঠনপাঠনের রয়েছে কার্যকর ভূমিকা।

পারিবারিক ঐতিহ্য

১৯২৯ সালের ১৫ এপ্রিল কলকাতার তালতলা লেনে নানা-বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন আনিস চৌধুরী। তাঁর পিতৃদত্ত নাম আনিসুজ্জামান কামরুদ্দিন। অবশ্য শিক্ষাসনদে তাঁর নাম আনিসুজ্জামান চৌধুরী। পরবর্তীকালে, বিশেষত লেখক-জীবনে তিনি আনিস চৌধুরী নামেই লিখেছেন এবং এই নামেই তিনি পাঠকদের কাছে পরিচিত ও সর্বাধিক সমাদৃত হয়েছেন। আনিস চৌধুরীর পিতৃপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল ত্রিপুরা জেলায় (বর্তমানে কুমিল্লা জেলা)। এ অঞ্চলে নাতিস্বল্প জমিদারিও ছিল তাদের। কিন্তু কালক্রমে মামলা-মোকদ্দমা এবং উত্তরপুরুষদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার ফলে তাঁর পিতামহ আব্দুল গফুরের আমলে জমিদারির অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। তবে জোতজমিনির্ভর হলেও শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এ পরিবারের।

আনিস চৌধুরীর পিতা নূরুল হুদা চৌধুরী ছিলেন কুমিল্লা জেলার কসবা থানার গোপিনাথপুরের অধিবাসী। ১৯১৪ সালে বি.এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। জানা যায়, তৎকালীন কসবা থানার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বি.এ.পাশ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর কলকাতায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করেন নূরুল হুদা। কিন্তু স্বাধীনচেতা এবং প্রতিবাদী মানসিকতার কারণে স্বল্পকাল ব্যবধানে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং যুক্ত হন ব্রিটিশ বিরোধী খেলাফত আন্দোলনে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। কলকাতা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী অফিসার হিসেবেও কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এ সময় মেদেনীপুর অঞ্চলের আব্দুল হামিদের কন্যা আসেমা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নূরুল হুদা। ১৯২০ সালে জন্ম হয় তাঁদের প্রথম সন্তান চৌধুরী কুদরত গণির। ১৯২৯ সালে কলকাতা সিটি কর্পোরেশনের চাকরি ত্যাগ করে তিনি কুমিল্লায় চলে আসেন এবং শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন নওয়াব বাড়ির হোস্মামিয়া মাদ্রাসায়। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের

অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি । ১৯৪৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন আনিস চৌধুরীর পিতা নূরুল হুদা চৌধুরী।

আনিস চৌধুরী তাঁর ধমনীতে বরাবরই লালন করেছেন এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার। শুধু পিতৃকুল বিবেচনায়ই নয়, বরং 'পিতৃ মাতৃ উভয়কুল থেকেই আনিস চৌধুরী লাভ করেছেন উচ্চ আভিজাত্য ও ঋদ্ধ উত্তরাধিকার। পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংস্কৃতিচর্চার উদার ও মুক্ত পরিবেশ আনিস চৌধুরীর কৈশোরক মানস গঠনে দূরস্পর্শী ভূমিকা পালন করে। উত্তরকালে তাঁর জীবনচর্যায় ও সাহিত্যকর্মে যে প্রগতিশীল ভাবনার পরিচয় পাই, তার ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছে পারিবারিক শিক্ষা এবং গৌরবিত উত্তরাধিকার।'[১] আনিস চৌধুরীর প্রমাতামহ আব্দুল জব্বার ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকর্তা লর্ড ডালহৌসির অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান ট্রান্সলেটর। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের 'মীর মুন্সী' হিসেবে তিনি অর্জন করেন সাত বিঘা জমি।

আব্দুল জব্বারের পুত্র আব্দুল হামিদ এম.এ. পাশ করে সাংবাদিকতা করতেন কলকাতায়। পরে সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে তিনি ভাওয়ালপুরের 'সাদিক ইজারটন' কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। 'আব্দুল হামিদ এক সময় ভূপালের শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন।'[২] তাঁর তিন কন্যা : আসেমা খাতুন (আনিস চৌধুরীর মাতা), আলেমা খাতুন এবং আরেফা খাতুন। ব্রিটিশ নারী মিস নেলির নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন আব্দুল হামিদের কন্যাত্রয়।

নূরুল-আসেমা খাতুন দম্পতির চার পুত্র এবং তিন কন্যার মধ্যে আনিস চৌধুরীর অবস্থান তৃতীয়। বড় সন্তান চৌধুরী কুদরত গণি পড়ালেখা করেছেন দেরাদুন ফরেস্ট কলেজে, দ্বিতীয় সন্তান বদরুদ্দোজা নাসিরউদ্দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন শেষে সরকারি বৃত্তি নিয়ে পড়ালেখা করতে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আনিস চৌধুরীর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা জামিল চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম মহাপরিচালক। বোনদের মধ্যে শামীম আহমদ গৃহিণী, নাজমা সিদ্দিকী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এবং সালমা খান একজন প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ। আনিস চৌধুরীর মা আসেমা খাতুন ছিলেন প্রকৃতই রত্নগর্ভা। ১৯৮৬ সালে জীবনাবসান ঘটে তাঁর।

---

[১] *আনিস চৌধুরী : নাটক সংগ্রহ*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১০,পৃ. ৬

[২] সৌরভ সিকদার, *জীবনী গ্রন্থমালা : আনিস চৌধুরী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৫, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যয়ন-সূত্র

সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী আনিস চৌধুরীর প্রথম পাঠগ্রহণ শুরু হয় মাইজভাণ্ডার শরীফে (নওয়াজ বাড়ি,কুমিল্লা)। প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিদ্যাচর্চায় অমনোযোগী হলেও পরবর্তীকালে মেধাবী ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন তিনি। ১৯৪৩ সালে পিতা নূরুল হুদা চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে পুরো পরিবারে অনাহুত বিপর্যয় নেমে আসে। পরিবারের অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এতৎসত্ত্বেও ১৯৪৪ সালে কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন (এসএসসি) পাশ করেন আনিস চৌধুরী। ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান শাখা থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। ১৯৪৭ সালে ভারতবিভক্তির পর পড়ালেখা একরকম অসমাপ্ত রেখেই তিনি চলে আসেন পূর্ববাংলায়। 'দেশভাগের মর্মান্তিক বাস্তবতা আর ঢাকা চলে আসবার পর স্থিতির অনিশ্চয়তা, পিতার অকাল মৃত্যু ও বাস্তব পৃথিবীতে তাঁর টিকে থাকবার লড়াই'[১]– এসবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় আনিস চৌধুরীর পরবর্তী শিক্ষাজীবন। তিনি ভর্তি হন সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকার আহসানউল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে বুয়েট)। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের অবাঙালি অধ্যক্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধের কারণে পড়ালেখা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিএসসি (পাস) কোর্সে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আনিস চৌধুরী ছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের (তৎকালীন ইকবাল হল) আবাসিক ছাত্র। এসময় তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে ছিলেন ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শহীদ সাংবাদিক আবু তালেব, সাংবাদিক কেজি মুস্তফা, খালেক নওয়াজ প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অবশ্য আনিস চৌধুরীর পথচলা খুব একটা মসৃণ ছিল না। সৈয়দ শামসুল হকের একটি লেখায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় :

> আনিস মানুষটা ছিলেন ঈষৎ লাজুক ধরনের, ১৯৫০-এর দশকের সেই সময়ে তিনি কার্জন হলে ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র আবার বংশাল রোডে *সংবাদ*-এর তখনকার ঠিকানায় সম্পাদকীয় বিভাগেও একই সঙ্গে কাজ করতেন, পিতৃহারা সংসারে এতগুলো ভাইবোনের ভেতর তিনি ছিলেন দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ, পড়াশুনার পাশাপাশি কাজও তাই তাঁকে করতে হতো। *সংবাদ*-এ গিয়ে দেখতাম, আপিসেই বসে গল্প লিখছেন, আনিস চৌধুরী। নিউজ প্রিন্টের প্যাডে, দোয়াতে কলম চুবিয়ে, বড় বড় হরফে, এমন যে, তিন চারটি বাক্যেই ভরে উঠত একেকটা পাতা, ছাপলে যদি গল্পটা তিন কলামের তার পাণ্ডুলিপি হতো প্রায় সত্তর আশি পাতার। আনিস সারা দিনের কাজ শেষে বাড়িতে

[১] *আনিস চৌধুরী : উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১১

> ফিরে কপালের ঘাম মুছে দেয়াল থেকে প্রথমেই নামিয়ে আনতেন গিটার, আপনমনে বেশ কিছুক্ষণ বাজাতেন, লোহানী ঠাট্টা করে বলতেন আনিস ওই একটা সুরই সারা জীবন বাজিয়ে গেল- ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু![১]

বস্তুত আনিস চৌধুরী ছিলেন জীবনপথের এক হার-না-মানা পরিব্রাজক; প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেছেন কিন্তু হার মানেননি। শিল্পীর নিষ্ঠা ছিল তাঁর, সুন্দরের জন্য প্রাণপাত করতেও দ্বিধান্বিত হননি তিনি। তবে 'নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করলেও, আনিস চৌধুরী আসলে ছিলেন, প্রকৃত অর্থেই একজন স্বশিক্ষিত আলোকিত মানুষ। বিপুল অধ্যয়ন ও সাধনা দিয়ে তিনি নিজেকে সব সময় রাখতেন সাম্প্রতিক ও আধুনিক।'[২]

কর্ম-পরিসর

আর্থিক প্রয়োজনে আনিস চৌধুরী ছাত্রজীবনেই উপার্জনের পথ বেছে নেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকাকালে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত *ইত্তেহাদ* পত্রিকার সাব এডিটর পদে যোগ দেন তিনি। এ-পর্যায়ে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন স্বনামখ্যাত কবি আহসান হাবীবের অধীনে। সহকর্মী হিসেবে এখানে তিনি পেয়েছেন রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, আবুল মনসুর আহমদ, খন্দকার ইলিয়াস, কাজী আনওয়ারুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে। দেশ-বিভাগের পর ঢাকায় ফিরে আনিস যুক্ত হন ফজলে লোহানীর *অগত্যা* নামক মাসিক পত্রিকার সঙ্গে। 'সেই পত্রিকাটিই প্রথম পত্রিকা যেটি আমাদের বাঙালিসত্তাকে বোধের ভেতরে রেখে জিন্না লিয়াকত নাজিমুদ্দিন আর তাবৎ পাকিস্তানপ্রেমীদের কুপোকাত করতে লাগল সরস সব লেখা দিয়ে।'[৩] এ-পত্রিকার কর্মযজ্ঞীদের মধ্যে আনিস চৌধুরীও বিশিষ্ট একজন। এ-পর্যায়ে *সংবাদ* পত্রিকায়ও বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন তিনি। এ পত্রিকায় অবস্থানকালে তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরীর নিবিড় সান্নিধ্য অর্জন করেন। *সংবাদের* পর তাঁর কর্মস্থল হয়ে ওঠে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত *দৈনিক আজাদী* পত্রিকা। এ পত্রিকায় আনিস

---

[১] *প্রথম আলো*, ঈদ সংখ্যা, আগস্ট-২০১৩,পৃ. ১৫৫

[২] *আনিস চৌধুরী : নাটক সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৩] *আনিস চৌধুরী : উপন্যাসসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

চৌধুরী 'বহুদর্শীর ডায়েরী' শিরোনামে নিয়মিত কলাম লিখতেন। *আজাদী* পত্রিকার 'প্রকাশনার ৩১ বছর' উপলক্ষে এক স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন :

> লেখালেখির ব্যাপারে *আজাদী*র সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় পঁচাশির শেষাশেষি। জানি আমার তুলনায় আরও সুযোগ্য ও জ্ঞানী লেখক, নিবন্ধকার রয়েছেন। নিঃসন্দেহে *আজাদী*র অগনিত পাঠক পাঠিকাকে আরও বেশি আকৃষ্ট আর বেশি মোহিত করতে পারতেন তাঁরা তাঁদের শক্তিধর লেখনীর মাধ্যমে। তবু, অনেকটা আজাদী গোষ্ঠীর অপরিসীম অনুগ্রহ ও ভালোবাসার কারণেই নিজের অক্ষমতা ও দৈন্যের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে যে সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে এলাম, সেজন্য ধন্যবাদ দেব কাকে। আজাদীর পাঠকপাঠিকা ও গুণগ্রাহীদের, না আজাদী কর্তৃপক্ষকে? আমার মনে হয় কাউকেই না। একত্রিশ বছরে পা রাখলো যে 'যুবক'-টি তার সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে আজ আমার নিজেরও মনে হতে শুরু করেছে ও-ত আমারই পরমাত্মীয়।[১]

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আনিস চৌধুরী বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও তাঁর পদচারণার বিশাল অংশ জুড়েই ছিল শিল্প, সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা। ১৯৫৪ সালের ১২ জুলাই তিনি প্রথম যোগদান করেন রেডিও পাকিস্তানের প্রকৌশল শাখার কারিগরি-সহকারী পদে। কিন্তু এখানকার যান্ত্রিক কর্মপরিসর খুব বেশি আকৃষ্ট করতে পারেনি তাঁকে। ফলত দুবছর পর ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে তিনি যোগদান করেন সহকারী বার্তা সম্পাদক পদে। তখন তাঁর কর্মস্থল ছিল করাচি। গণমাধ্যমে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করবার পরও তিনি এসময় পালন করতেন করাচির 'নজরুল একাডেমী'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। করাচি-অবস্থানকালে তাঁর কর্মব্যস্ততার বিবরণ পাওয়া যায় সৈয়দ হকের অন্য এক স্মৃতিচারণে :

> ১৯৬২-র জানুয়ারিতে গিয়েছিলাম সেই শহরে, ছিলাম মাস দুয়েক; আনিস চৌধুরী তখন রেডিও পাকিস্তানের সংবাদ বিভাগে সম্পাদকের পদে কর্মরত ছিলেন। সন্ধের সময়টাই ছিল তাঁর চাকুরির বিশেষ ব্যস্ত সময়; আমি সন্ধের পরপরই যেতাম তাঁর দফতরে, বসে বসে তাঁর সংবাদ-সম্পাদনা দেখতাম, তারপর রাত সাড়ে আটটা ন'টার দিকে দু'জনে বেরিয়ে আসতাম, নেমে পড়তাম পথে। পথ হাঁটা চলতো অনেক রাত অবধি, রাতে কোনো রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিতাম, কোনোদিন যেতাম নজরুল ইনস্টিটিউটে; কোনোদিন সমুদ্রের অগাধ তীরে গিয়ে বসতাম; কথা হতো; তার সবটাই সাহিত্য নিয়ে, এবং তিনি যে নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন সেই নাট্যকলা ও প্রযোজনা নিয়ে। ঢাকা থেকে করাচি অনেক দূর, আনিস চৌধুরী করুণ-অনুভব করতেন তিনি বুঝি বই-প্রকাশকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন; প্রায়ই সে আক্ষেপ করতেন। তারপর নিজেই দুঃখ ঝেড়ে ফেলে বলে

[১] স্মৃতির যাত্রায়, *দৈনিক আজাদী*, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

> উঠতেন, আসলে লেখাটাই কাজ, আমি লিখে যাচ্ছি, বই বেরুলো কি বেরুলো না সেটা নিয়ে ভাববার এত কি![১]

১৯৬৪ সালের ১৩ আগস্ট আনিস উন্নীত হন বার্তা সম্পাদক পদে। ১৯৬৫ সালে টেলিভিশনের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য তিনি চলে যান কানাডায় এবং ফিরে এসে যোগদান করেন রেডিও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম কেন্দ্রে। দুই বছর চট্টগ্রামে অবস্থানের পর ১৯৬৮ সালের মে মাসে আনিস চৌধুরী ঢাকা টেলিভিশনের নিউজ এডিটর পদে কাজ শুরু করেন। এ প্রতিষ্ঠানে থাকাকালে তিনি 'ওআইসি'র প্রথম সম্মেলনের সংবাদ-সংগ্রহ করতে মরক্কো যান। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ দায়িত্ব সম্পাদনের পর তিনি আবারও রেডিও পাকিস্তানের করাচি কেন্দ্রে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তাঁকে একরকম বাধ্য হয়ে পাকিস্তানে অবস্থান করতে হয়।

স্বাধীনতার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে আনিস চৌধুরী পুনরায় গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশ বেতারের বার্তা সম্পাদকের পদে যোগদান করেন এবং ১৯৭৫ সালে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে অধিষ্ঠিত হন বার্তা পরিচালকের পদে। এরপর স্বল্পকালের জন্য ডেপুটেশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন আনিস। ১৯৭৯ সালে তাঁকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ শহরে বদলি করা হয় বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম প্রেস কাউন্সিলর পদে। ১৯৮৫ সালে তিনি দেশে ফিরে পুনরায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের মহাপরিচালক পদে যোগ দেন। এ পদে কর্মরত থাকাকালেই ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে আনিস চৌধুরী সরকারি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরও থেমে থাকেনি আনিস চৌধুরীর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন। ১৯৮৭ সালে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্তা শাখার উপ-মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই পদে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারেননি তিনি; উপরন্তু এই কর্মপরিসর যথেষ্ট পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তাঁর জন্যে। এক পর্যায়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ সমাপ্ত হবার পূর্বেই তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। আনিস চৌধুরী হয়তো পরবর্তীকালে আরো উচ্চ সরকারি পদ লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তৎকালীন

---

[১] *আনিস চৌধুরী : গল্প সংগ্রহ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৭

স্বৈরশাসকের সঙ্গে কোনো অন্যায় আপস করেননি তিনি। অবশ্য মৃত্যুর প্রাকপর্যায় পর্যন্ত তিনি ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

সংসার-পর্ব

১৯৫৬ সালের ৪ আগস্ট আনিস চৌধুরী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন রাজিয়া মজুমদারের সঙ্গে। তাঁর শ্বশুরালয় ছিল আসামের কাছাড় জেলার শীলচরে; শ্বশুর ছিলেন সহকারী কমিশনার নসীব আলী মজুমদার। রাজিয়া মজুমদার ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত, সুসংস্কৃত। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, আনিস চৌধুরীর বিয়ের প্রস্তাবক ছিলেন *সংবাদ* পত্রিকার সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী।

বিবাহের পর চাকরিসূত্রে আনিস চৌধুরীকে যেতে হয় পাকিস্তানের করাচি শহরে। সেখানে পৌঁছে প্রথমে অগ্রজ ভ্রাতা বদরুদ্দোজা নাসিরউদ্দিনের এয়ারপোর্ট রোডের বাসায় উঠলেও পরে তাঁরা চলে আসেন জাহাঙ্গীর রোডের সরকারি কোয়ার্টারে। করাচি অবস্থানকালেই ১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণ করে আনিস চৌধুরীর একমাত্র কন্যা লুভা নাহিদ চৌধুরী। ১৯৬৬ সালে তাঁরা স্বদেশে চলে আসেন। এসময় আনিস চৌধুরীর কর্মস্থল হয় রেডিও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম কেন্দ্রে এবং তাঁর জন্য বরাদ্দ হয় কর্ণফুলি নদীর তীরে সদরঘাটের পরিত্যক্ত সরকারি বাড়ি; বাড়িটির নাম ছিল 'বুলবুল হাউজ'। চট্টগ্রাম থাকাকালে রাজিয়া চৌধুরী শিক্ষকতা করতেন লায়ন্স স্কুলে। এক বছর পর আনিস চৌধুরী ঢাকা টেলিভিশনে বদলি হন এবং সপরিবারে লালমাটিয়ার একটি সরকারি বাসায় ওঠেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী চাকরি নেন ক্যান্টনমেন্ট মডার্ন হাই স্কুলে (বর্তমানে শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ)।

১৯৬৯ সালে আনিস চৌধুরীকে বদলি করা হয় করাচিতে। অবশ্য এ যাত্রা তাঁকে একাই যেতে হয়। স্ত্রী এবং কন্যা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন ১৯৭০ সালে। করাচিতে তাঁরা বসবাস করতেন গার্ডেন রোডের একটি বাসায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে আনিস চৌধুরী সপরিবারে করাচিতে যাপন করেন উপদ্রুত জীবন। বাঙালি হওয়ার কারণে এসময় তিনি চাকরিজীবনে প্রাপ্ত সমস্ত বৈধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এমনকি দেশ স্বাধীন হবার পরও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হন তাঁরা। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে সপরিবারে ঢাকা ফেরেন আনিস চৌধুরী।

সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে এসে তিনি যোগ দেন বাংলাদেশ বেতারের নিউজ এডিটর পদে। এসময় তিনি থাকতেন শেরেবাংলা নগরের সংসদ ভবন সংলগ্ন মিনিস্টার কোয়ার্টারে। অতঃপর তাঁকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্যে সস্ত্রীক ইসলামবাদ যেতে হয়। প্রায় সাতবছর পাকিস্তানে অবস্থানের পর ১৯৮৫ সালে তাঁরা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্ত্রীর সঙ্গে আনিস চৌধুরীর সম্পর্ক কীরূপ মধুর ছিল, তা জানা যায় তাঁর রচিত *শখের পুতুল* উপন্যাসের উৎসর্গপত্র-সূত্রে– 'সহধর্মিনী হয়েছে সেজন্য নয়, সহৃদয়-চিত্ত ও সজ্জন-বন্ধু হয়েছে সেজন্য।' আনিস চৌধুরীর এ-বক্তব্য পরোক্ষভাবে এ-সত্য জ্ঞাপন করে যে, তাঁর শিল্পী হয়ে উঠবার পেছনে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকারের কন্যা লুভা নাহিদ চৌধুরীর ভাষ্য :

> আমার মায়ের হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর। তাঁকে দেখেছি প্রায়ই রাত জেগে অনেক পরিশ্রম করে আমার বাবার দুর্বোধ্য হাতের লেখা প্রকাশকদের সুবিধার্থে পরিষ্কার সাদা কাগজে লিখে দিতে। মনে হতো বাবার অস্থির, মোটামুটি রৈখিক লেখায়, ছোটগল্পের তাৎক্ষণিক টানাপোড়েন যেভাবে ফুটে উঠত, ওই সুন্দর, সভ্য, গোল-গোল হাতের লেখার ছাঁদে তা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ত।[১]

অবশ্য আনিস চৌধুরীর চৌধুরীর হস্তাক্ষর যে সর্বসাধারণের বোধগম্য ছিল না, তা তাঁর নিজের স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যায়–

> একথা স্বীকার করতে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই যে, আমার হাতের লেখা অতীতেও খুব খারাপ ছিল, এখনও অত্যন্ত খারাপ। সেটা আমার বন্ধুবান্ধবও জানেন। সেটার জন্য খুব অসুবিধা হতো।... মুস্তাফা নূরউল ইসলাম প্রমুখ যেখানে তিরিশ পাতায় বা ষোল পাতায় লেখা শেষ করতে পারতেন, আমার সেখানে প্রায় দেড়শো-দুশো পাতা লাগতো।[২]

সাহিত্য-সাধনা

শৈশবাবধি লেখালেখির প্রতি ব্যাপক আগ্রহ ছিল আনিস চৌধুরীর। কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র থাকাকালে ১৯৪১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *আজাদ* পত্রিকার শিশু-কিশোরদের আসর 'মুকুলের মাহফিলে' প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম শিশুতোষ রচনা 'বিলাতী বেগুন বেগুন নয়'।

---

[১] *আনিস চৌধুরী : গল্প সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত পৃ. ১২

[২] আনিস চৌধুরীর ওপর নির্মিত ভিডিও ডকুমেন্টারি থেকে উদ্ধৃত, গ্রন্থনা ও পরিচালনা : আনিসুল হক বরুণ

পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় *আজাদ* পত্রিকার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে এবং সে-সূত্রে লেখালেখির পরিমাণও বেড়ে যায়। এসময় *আজাদ* পত্রিকার পাশাপাশি *যুগের দাবী*, *ইত্তেহাদ* প্রভৃতি পত্রিকায়ও লিখতেন তিনি। বিভাগোত্তরকালে *অগত্যা*, *সংবাদ*, *পাকিস্তানী খবর*, *এলান*, *পাকিস্তান অবজারভার*, *ইলাস্ট্রেটেড*, *উইকলি অব পাকিস্তান* প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লেখার মধ্য দিয়ে আনিস চৌধুরী লেখক হিসেবে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। শুধু তাই নয়, ৫২'র ভাষা আন্দোলনের পর হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* (১৯৫৩) সংকলনেও স্থান পায় তাঁর একটি কবিতা। দীর্ঘ পরিসরের এ-কবিতাটি তাঁর জীবনদৃষ্টি, চেতনাদর্শ ও সাহিত্যপ্রতিভাকে চমৎকারভাবে প্রকটিত করে :

> আকাশের আরশীতে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে/ সলজ্জ প্রভাতকে দেখেছিল/ রাতজাগা সূর্য্য।/ শিশির স্নিগ্ধ /কাঁচা ঘাসের নরম ডালে/ ডাগর চোখ মেলে তাকালো/ লক্ষ কোটি মুক্তোর মেয়ে।/ চারশো চুল্লীর চিমনীতে/ অভিমানী ধোঁওয়াটা উদার থেকে/ উদারতর হোল। তারপর কখন/ অজান্তে ছুঁয়ে চলে গেল/ মোটা শালিকের হলুদ পেখম/ আলোর ঝরণাকে সচকিতে/ ঝাপসা করে দিয়ে।
>
> সাদা কেম্বিসের টুকরো ফিতেটা/ আনাড়ী বন্ধনে বেঁধে নিয়ে/ স্কুলধাওয়া করা ছেলেটা/ সাবানঘোলা চোখ নিয়ে/ তাকালো সবচে' পুরোন বাড়ীর/ সবচে' বুনেদী ঘড়িটার দিকে।/ আর/ পাংশুটে ঘণ্টার চীৎকারে পুকুরের / ঘাটে এসে ভীড় দেখে/ ভীরু অফিসী কেরানীরা/ আর নাবলোনা ঘাটের/ সিঁড়ি বেয়ে।
>
> আমলকির বন সরিয়ে/ অশথ গাছের ছায়া মাড়িয়ে/ আস্তাকুঁড়ের ভিটে ছাড়িয়ে/ মেয়েস্কুলের বাসটা কাঁকরের/ বুকে হিমসিম খেয়ে/ বড় সড়কে চললো।
>
> তখুনি কে জানে কেন,/ দুপুরের খর-উত্তাপ-সূর্য্যকে/ শাসিয়ে দিয়ে লক্ষ কোটি চীৎকারের/ বজ্র স্ফুলিঙ্গ বন্যার মত/ অজস্র প্রতিজ্ঞা/ছড়িয়ে দিয়ে গেল/ উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হাওয়ার পালকে
>
> জনতার চীৎকারে কাজীর দেউড়ির/ ভীত-সন্ত্রস্ত বউটা ভুলেই গেল/ সাত পুরুষের আবরু বাঁচাতে।/ কেন না, আগর বাতির গন্ধমাতাল/ ছোট চিল কোঠা থেকে শেষ নামাজের/ রুকু ভেঙ্গে দিয়ে বিদ্রোহী চুলের/ ফিতে খুলে দিয়ে সে দেখছিল/ কেমন কোরে বিজলী তারের/ দুটো তারে তারে/ স্ফুলিঙ্গের আলিঙ্গন/ দিয়ে আত্মহত্যা কোরছিল/ ঘুম ঘুম দুপুরের বোকা কাকটা
>
> নাম জানা না জানা/ নামতার মত আনাগোনা/ মানুষের।/ দেখতে দেখতে ছেয়ে গেল মাঠটা,/ পুকুর পারের ঘাটটা,/ পীচঢালা রাস্তার আবলুশ বুকটা।/ তখুনি ঠিক তখুনি কোন এক স্কুলফেরতা/ হাবা ছেলের কথাটা না ফুরোতেই/ কালো মেয়ের লাল টকটকে ফিতের/ গেরোটা বাঁধা না হোতেই/ দুপুরের রোদের দাহকে কটাক্ষ/ কোরে আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গ/ লিখে গেল তার যাত্রীর নাম।/ ঋণ হোয়ে গেল রক্তের দাম।

রুদ্র সূর্য্য তাকালো আবার–/ দেখলো আকাশের আরশীতে সলজ্জ/প্রভাতকে নয়,/রক্তাক্ত মাটির চাঁদোয়ায়/ জ্বলন্ত দুপুরকে।[১]

চাকরিসূত্রে করাচি চলে গেলেও সাহিত্যচর্চা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি আনিস চৌধুরী। এসময় *সচিত্র সন্ধানী*তে 'ক্লিফটনের হাওয়া' শিরোনামে তাঁর কলাম প্রকাশিত হত; *চিত্রালী*তে প্রকাশিত হয় 'উত্তম পুরুষের ডায়েরী'। করাচি অবস্থানকালে তিনি রচনা করেন তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দুটি নাট্যগ্রন্থ : *মানচিত্র* (১৯৬৩) এবং *এ্যালবাম* (১৯৬৫)।

নাট্যকার হিসেবেই আনিস চৌধুরী অর্জন করেন সমধিক খ্যাতি। ষাটের দশক থেকেই বেতার ও টেলিভিশনের জন্য নিয়মিত নাটক রচনা করেছেন তিনি। তবে বেতার-টেলিভিশনের জন্য নাটক রচনা করলেও 'মঞ্চ নাটকের রচয়িতা হিসেবেই তাঁকে আমরা অগ্রগন্য বলে মানবো।'[২] *মানচিত্র*, *এ্যালবাম* ছাড়াও *প্রত্যাশা* (১৯৬৭), *ছায়া হরিণ* (১৯৬৮) *যখন সুরভী* (১৯৬৮), *চেহারা* (১৯৭৯), *যেখানে সূর্য*, *তবু অনন্য*, *নীলকমল*, *তারা ঝরার দিন*, *বলাকা অনেক দূরে*, *রজনী* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম। নাটকের পাশাপাশি আনিস চৌধুরী রচনা করেছেন দশটি উপন্যাস। এগুলো হচ্ছে : *প্রশ্ন জাগে* (১৯৫১), *উত্তাপ* (১৯৫৪), *শখের পুতুল* (১৯৬১), *সরোবর* (১৯৬৭), *স্রোত* (১৯৬৮), *সৌরভ* (১৯৬৮), *মধুগড়* (১৯৭৪), *লোকজন* (১৯৮৪), *ঐরকম একজন* (১৯৮৬) এবং *চোখের রং*। ছোটগল্প রচনায়ও তিনি পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আনিস চৌধুরীর রচিত ছোটগল্পের সংখ্যা আটাশিটি। তাঁর রচিত 'সুদর্শন ডাকছে', 'এক বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা', 'ছায়া সূর্য', 'বুনোহাস', 'ছাড়পত্র', একটি ঋণ ও শ্বেত গোলাপ', 'আবিষ্কার', 'একদিন কুয়াশা', 'নিজস্ব সংবাদদাতা' প্রভৃতি ছোটগল্প বেশ পাঠকপ্রিয়। পরবর্তীকালে তাঁর ছোটগল্পগুলো অনূদিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। তবে ঔপন্যাসিক অথবা ছোটগল্পকার রূপে নয়, নাট্যকাররূপেই আনিস চৌধুরীর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে ব্যাপক ও ফলপ্রসূ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৮ সালে তিনি অর্জন করেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার।

১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সময়-পরিসর আনিস চৌধুরী অতিক্রম করেছেন অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। করাচিতে এসময় তিনি যাপন করেছেন দুঃসহ অবরুদ্ধ জীবন। এই তিন

---

[১] *একুশে ফেব্রুয়ারী*, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), সময় প্রকাশন, ঢাকা, সময় প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০১, পৃ.৩৯-৪১

[২] *আনিস চৌধুরী : গল্প সংগ্রহ*, মাওলা ব্রাদার্স, প্রাগুক্ত, পৃ.৯

বছর তাঁর কলম ছিল শোকস্তব্ধ। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি পুনরায় লিখতে শুরু করেন। তবে চাকরিজীবনের শেষ-পর্যায়ে তিনি যে প্রতিকূল জীবনবাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছেন, তার ফলে সৃষ্টিশীল সাহিত্যরচনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এসময় কয়েকটি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতেন তিনি। এছাড়া দেশবাসীকে গ্রন্থপাঠে উৎসাহিত করতে আনিস চৌধুরী বাংলাদেশ টেলিভিশনে ধারাবাহিক গ্রন্থ-সমালোচনামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতেন। সাংবাদিক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর এক স্মৃতিচারণে লেখেন–

> সেদিনের একটা কথা এখন বেশী করে মনে পড়ছে। তিনি তাঁর লেখা প্রসঙ্গে বলছিলেন, সৃজনশীল লেখা (গল্প, উপন্যাস) সম্পর্কে তিনি আর এখন আগ্রহী নন। তাঁর ধারণা, পাঠক দু'-একজন লেখক ছাড়া অন্য কারো বই কেনে না, পড়ে না। তাহলে লিখে লাভ কি। তিনি বলেছিলেন, এখন কলামই লিখি। লিখে আয় হয়। লোকে পড়েও। বিষয় বলবেন, লিখে দেব।[১]

সাহিত্য-সাধনায় আনিস চৌধুরীর ছিল নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সাহিত্যে দলবাজি তিনি কখনোই পছন্দ করেননি। কোনো বিশেষ গোষ্ঠী কিংবা দলভুক্ত হয়ে সাহিত্য রচনা সমর্থন করেননি তিনি। তাঁর মতে– এভাবে রচিত সাহিত্যকর্ম হয়তো পুরস্কার অর্জন করতে পারে, কিন্তু এতে কখনও লেখকের শিল্পীসত্তা পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন –

> সাহিত্য যদি জীবনে করতে চাও তাহলে এসব সমিতি, সংঘ, সংসদ করে কোনোদিন সাহিত্য করা যায় না। যারা সাহিত্য করে তারা এগুলো করে না, আর যারা এগুলো করে তারা সাহিত্য করে না।[২]

রাজনৈতিক-সচেতনতা

আনিস চৌধুরীর নাটকে রাজনীতি কখনও মুখ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়নি। রাজনীতি এবং সাহিত্য তাঁর নিকট দুটি পৃথক সত্তা। তিনি বলেছেন :

> রাজনীতি নষ্ট দুষ্ট বলে কি সাহিত্যকেও তা হতে হবে। সাহিত্যই তো একটি জাতির চিন্তা-সুস্থতার শেষ আশ্রয়স্থল।[৩]

---

[১] বহুদর্শীর বিদায়, *দৈনিক আজাদী*, ১০ নভেম্বর ১৯৯০

[২] আনিস চৌধুরীর ওপর নির্মিত ভিডিও ডকুমেন্টারি থেকে উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

[৩] *আনিস চৌধুরী : উপন্যাসসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

আনিস চৌধুরীর সমগ্র নাটকে সাবের (*বলাকা অনেক দূরে*) একমাত্র রাজনীতি-সম্পৃক্ত চরিত্র; যদিও নাটকে তার রাজনৈতিক বক্তব্য এসেছে কেবলই স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে। তবে তাঁর নাটকে রাজনৈতিক-প্রসঙ্গ জোরালোভাবে উচ্চারিত না হলেও ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন যথেষ্ট রাজনীতি-সচেতন; মুক্তচিন্তক এবং সংস্কারমুক্ত। ছাত্রজীবনে এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্কের কালে তিনি সক্রিয় বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এমনকি সরকারি চাকরির সঙ্গে যুক্ত হয়েও রাজনীতি-বিমুখ হননি তিনি। দেশ-বিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে, মৌলবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যাঁরা কলম ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আনিস চৌধুরী অন্যতম। সামাজিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান বিবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আনিস চৌধুরী সম্পাদন করেছেন এক দুঃসাহসিক ভূমিকা। 'মূলত ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আবহমান বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিষ্ঠ অনুসারী হয়ে যে কজন সাহিত্য-শিল্পকর্মীর জন্ম এবং যাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ধারা আজো সব ধরনের বিঘ্ন উজিয়ে অক্ষুণ্ন কিংবা প্রধানতম ধারারূপে বিদ্যমান, আনিস চৌধুরী সেই ধারাপ্রবাহের অন্যতম কারুকার।'[১] এতৎপ্রসঙ্গে অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলামের একটি বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

> কত অজস্র লেখা যে আনিস লিখেছে 'অগত্যা'য় স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে। একটা কম্পিটিশনের মতো ছিল– কে কতো হুল ফোটানো লিখতে পারে, কতো ত্যাড়া করে লিখতে পারে। হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল তখনকার পাকিস্তানী প্রভুরা। লেখায় কেউ কারুর চাইতে কম যেত না, তবে আমাদের মধ্যে সবচাইতে নির্বিরোধী, সবচাইতে সরল চেহারার স্বল্পবাক আনিস চৌধুরী যে ঐ বিশেষ কর্মটিতে অমন ধারালো হয়ে উঠতে পারত, বাজপাখির মতো হয়ে যেত, ভেতরের আমরাই কেবল তা জানতাম।...প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আনিসকে তেমন দেখিনি– মিছিলে,সমাবেশে কিংবা মঞ্চে। তবে প্রতিরোধী কিংবা প্রতিবাদী লেখালেখিতে কতো অজস্রবার যে ঝলসে উঠতে দেখেছি তাকে।[২]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় আনিস চৌধুরী কর্মক্ষেত্র পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করলেও স্বদেশের মুক্তির জন্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন অনেক ঝুঁকির পথ। তাঁর বন্ধু পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক-লেখক পার্থ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের *প্রাসাদ* পত্রিকায় 'ওপারেও বাংলা' শিরোনামে লেখেন–

---

[১] কথাশিল্পী আনিস চৌধুরী, *সচিত্র সন্ধানী*, ১৩ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ৯ নভেম্বর ১৯৯০

[২] উদ্ধৃত:সৌরভ সিকদার, *জীবনী-গ্রন্থমালা : আনিস চৌধুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

> আনিশ চৌধুরী পাকিস্তান আমলে কাজ করতেন পাকিস্তান রেডিওতে। পোস্টেড ছিলেন ইসলামাবাদে। তারপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যেই ডাক এলো সেই ডাকে সাড়া দিলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রতি লয়াল বাঙালীদের নজরবন্দী করে রাখা হল। সেখান থেকে যথাসর্বস্ব দিয়ে আফগানিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে দিল্লি হয়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন তিনি। সে এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস।[১]

নব্বইয়ে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধেও আনিস চৌধুরীর কলম ছিল প্রতিবাদী। পরিণামে তাঁর ওপর বর্ষিত হয় শাসকগোষ্ঠীর কোপদৃষ্টি। সামরিক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদের সময় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে টেলিভিশনের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এতকিছুর পরও আনিস চৌধুরী ছিলেন আপসহীন।

মৃত্যু

১৯৯০ সালের শুরুর দিকে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন আনিস চৌধুরী। মার্চ মাসে তিনি ব্যাংকক যান চোখের চিকিৎসায়। এ্যাজমা-রোগের যন্ত্রণাও তাঁকে পীড়িত করে এসময়। শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি শেষজীবনে স্বৈরশাসকের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা তাঁর মনোজগতকে করে তোলে বিধ্বস্ত। সীমাহীন অস্থিরচিত্ততার মধ্যে কালাতিক্রম করেন তিনি। এ বছরেরই ২ নভেম্বর, শুক্রবার মধ্যরাতে হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন আনিস। সেই রাতে ঢাকা শহরে জারি করা হয়েছিল কারফিউ। তাই অসুস্থ আনিস চৌধুরীকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছতে বেশ সময় লেগে যায়। পরে অবশ্য হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এভাবে জীবননাট্যের অবসান ঘটে বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনের এক অন্যতম কাণ্ডারী আনিস চৌধুরীর। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একষট্টি বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকবাণী প্রকাশ করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী; শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ বেতার এবং তাঁর শেষজীবনের কর্মস্থল ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের কার্যালয়ে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিশেষ ক্রোড়পত্র।

---

[১] উদ্ধৃত:সৌরভ সিকদার, *জীবনী-গ্রন্থমালা : আনিস চৌধুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলা নাট্যধারায় আনিস চৌধুরীর অবস্থান

সংস্কৃত কাব্যতাত্ত্বিকদের বিবেচনায় নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য। প্রায় সবকালেই এটি বিবেচিত হয়েছে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হিসেবে। মূলত কবিতার মতোই এর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে নাট্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আদিম সমাজে মানুষ জীবনরক্ষা এবং জীবিকার প্রয়োজনে পশুশিকার করেছে; এজন্যে তারা পছন্দের পশুকে আকৃষ্ট করবার প্রয়োজনে অনুকরণ করেছে সেসব পশুর কণ্ঠস্বর; কখনও কখনও শিকারযোগ্য পশুর সঙ্গে একাত্ম হতে তাদের আচার-আচরণও আয়ত্তের চেষ্টা করেছে তারা। এভাবে অনুকরণের বিষয়টি হয়ে উঠেছে তাদের জীবনাচারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং এই অনুকরণ প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে অঙ্কুরিত হয়েছে নাট্যশিল্পের বীজ।

পরবর্তীকালে পশুশিকারের পাশাপাশি আদিম সমাজে আরম্ভ হয়েছে প্রকৃতি-পূজা। ধীরে ধীরে সূর্যের দেবতা, বৃষ্টির দেবতা, শস্যের দেবতা প্রভৃতি তাদের দৈনন্দিন জীবনের ত্রাণকর্তারূপে বিবেচিত হয়েছে এবং এসব দেবতার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সেই সমাজে প্রবর্তিত হয়েছে নানারকম প্রার্থনা। তবে 'শুধু হাতে আবেদন নিবেদন করলেই কেউ আর খুশি হয় না– তার জন্য চাই আয়োজন, অনুষ্ঠান। ভাষাও খানিকটা গড়ে উঠেছে– প্রার্থনা সঙ্গীতের জন্য এই সমস্ত দেবতাদের ঘিরে নানান লৌকিক কাহিনীরও উদ্ভব হতে লাগল– সেগুলোও অনুষ্ঠানে নৃত্যসহ গীত হত। এই জন্যই পৃথিবীর সর্বত্রই নাটক মন্দির ও পূজানুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাথমিক অবস্থায় গভীরভাবে সংলগ্ন ছিল।'[১] প্রাচীন গ্রিক নাট্যকলার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে এ উক্তির সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ্রিকদের লৌকিক দেবতা ডায়ানিসাসের উদ্দেশে তৎকালে যে নৃত্যগীত সমন্বিত শ্রদ্ধার্ঘ্য উৎসবের প্রচলন ছিল, তার মধ্য দিয়েই মূলত গ্রিক নাটকের সূত্রপাত। এ উৎসবে পঞ্চাশ সদস্যের একটি দল অর্ধমানব এবং অর্ধপশুর সাজে সজ্জিত হয়ে সমবেত সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশন করতো। এরা কোরাস নামে পরিচিত ছিল। মঞ্চে দেবতা ডায়ানিসাসের স্তবগাথা তারা নৃত্য ও গীত সহযোগে পরিবেশন করতো। কালক্রমে 'ডিয়োনাইসাসের স্তবগাথার সঙ্গে

[১] ডক্টর গীতা সেনগুপ্ত, বিশ্বরঙ্গারয় ও নাটক, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫,পৃ. ৮

সঙ্গে বিভিন্ন গ্রীক পৌরাণিক দেবতা, জাতীয় বীর ও কিংবদন্তীর বিখ্যাত চরিত্রগুলোর জীবন-বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য কোরাসের পালাগীতের বিষয় হয়ে ওঠে। কোরাস নেতা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে সংলাপ গীত আকারে বলে যেতো তাতে সে নিজেকে যুক্ত করতো না, অর্থাৎ সে শুধু একজন কথক বা গায়ক হিসেবেই বর্ণনা করে যেতো। থিয়েটারে অভিনেতার অবশ্য পরিচয় হচ্ছে, সে অন্য কোনো চরিত্রকে অভিনয়কালের জন্য নিজের মধ্যে ধারণ করে থাকে। কোরাস নেতা তা করতো না।'[১]

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে গ্রিক নাটকে অতুলনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময় থেসপিস নামের এক কোরাস নেতা শুধু কথক বা গায়ক হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেকে মূল চরিত্ররূপে উপস্থাপন করেন। থেসপিসের এ অসাধারণ নাট্যকৌশল অন্যান্য কোরাস দলও অনুসরণ করতে থাকে এবং ডায়ানিসাসের উৎসবের স্তবগাথা ক্রমবিবর্তনের ধারায় রূপান্তরিত হয় নাট্য-ট্র্যাজেডিতে। এভাবে 'নাটক ধর্মীয় তন্ত্রমন্ত্র ও বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের বিস্তৃত পটভূমিতে দাঁড়ালো, এবং মানুষের অবকাশ মুহূর্তকে ভরিয়ে তুলতে লাগল বিচিত্র গল্পে, গানে, গাথায়, ইতিহাসে, দর্শনে– কত সুখ দুঃখের ভাবাবেগে। এই নাটককে দৃশ্যরূপ দেওয়ার জন্যই এগিয়ে এল রঙ্গালয় এবং তার বহু কলাকৌশল। নাটক এবং রঙ্গালয় উভয়ই বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ এবং তার সৌন্দর্য মূল্যের উপর একান্তই নির্ভরশীল।'[২]

গ্রিক নাটক যেমন ডায়ানিসাস-উৎসবকে কেন্দ্র করে উৎপত্তি লাভ করে, তেমনি ভারতীয় নাটকের উদ্ভব দ্রাবিড়দের শিব-বিষয়ক ধর্মকেন্দ্রিক-উৎসব বা 'শিবোৎসব' থেকে। বর্তমানে শিবোৎসব পরিণত হয়েছে গম্ভীরা বা গাজন উৎসবে। এরূপ উৎসবে নাচ, গান, শোভাযাত্রা এবং নানারকম সাজসজ্জাসহকারে পাত্র-পাত্রীরা রঙ্গ-তামাশা প্রদর্শন করে। শিব বিশেষত অনার্যদের দেবতা। তাই প্রথমদিকে আর্যরা শিবোৎসবকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। পরে অবশ্য 'আর্যরা অনার্যদের বহু জিনিস গ্রহণ করিয়া তাহার বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। নৃত্যগীতবাদ্যের সহিত সংলাপ যোজনা করিয়া তাঁহারা নাট্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এরূপ সংলাপাত্মক রচনার নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যে যথেষ্ট মেলে। ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত যম-যমী, পুরুরবা-ঊর্বশী, অগস্ত্য-লোপামুদ্রা, বিশ্বামিত্র-নদীগণ প্রভৃতি সংবাদ-সূক্তগুলিই ইহার

[১] জিয়া হায়দার, নাট্য ও নাটক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১৩
[২] ডক্টর গীতা সেনগুপ্ত, বিশ্বরঙ্গারয় ও নাটক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

প্রমাণ।'[১] ভারতবর্ষের নাট্যচর্চায় আর্যদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে সমালোচক অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর যে মত পোষণ করেছেন, তা হলো–

> বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যগণ দ্রাবিড়দের শিবকে করে রেখেছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু নটনাথরূপে আখ্যাত শিবের নিকটেই আর্যগণের দেবতা ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এবং তার ফলেই রচিত হয়েছিল নাট্যবেদ নামক পঞ্চবেদ। ব্রহ্মা পরে তদীয় শিষ্য ভরতমুনিকে উক্ত বিষয় শিক্ষাদান করেন এবং ভরতের লেখনী হতে জন্মলাভ করে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশাস্ত্র।[২]

প্রাচীন ভারতবর্ষের নাট্যকলা সম্পর্কে সর্বাধিক ধারণা লাভ করা যায় ভরতমুনির এই নাট্যশাস্ত্রে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দে রচিত হয়েছিল এ গ্রন্থটি। ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রের প্রবৃত্তি-ব্যঞ্জক অধ্যায়ে অঞ্চলভেদে চার ধরনের প্রবৃত্তি বা উপভাষার কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো : আবন্তী, দক্ষিণাত্য, পাঞ্চলী এবং ওড্র মাগধী। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ওড্রমাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি থেকে; যেখানে নৃত্য, সংগীত এবং বাদ্যের উপস্থিতি অপরিহার্য। ওড্রমাগধী রীতি আবার দুই ধরনের প্রবৃত্তির আশ্রয়ে গঠিত : ভারতী এবং কৈশিকী। কৈশিকী বৃত্তি শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে সৃষ্ট এবং এক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। একারণে শিবের অসংখ্য গুণবাচক নামের মধ্যে রয়েছে : নটরাজ, নটনাথ, মহানট, নটেশ প্রভৃতি। মূলত নৃত্যশীল নটরাজের মূর্তি কল্পনা করেই বিকশিত হয় ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র। তাই লক্ষ করা যায়, 'নাটকের হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেনি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ– তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে।'[৩]

বৈদিক যুগের পর *রামায়ণ* এবং *মহাভারত*– এই দুটি ক্লাসিক মহাকাব্যেও নাটক, নট এবং সঙ্গীতের উল্লেখ রয়েছে। *রামায়ণের* কাহিনিতে দেখা যায়, অযোধ্যার অন্তঃপুরে রঙ্গালয় নামে আলাদা গৃহ থাকতো। রাজা দশরথের মৃত্যুর সময় ভরত দুঃস্বপ্ন দেখলে তার বন্ধুরা নৃত্যগীত এবং নাটক পাঠের আয়োজন করে। *মহাভারতে*র 'বিরাট পর্বে' একটি সুবিশাল নাট্যশালার সংবাদ রয়েছে; অর্জুন সেখানে বৃহন্নলা-বেশে রাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্যশিক্ষা প্রদান করতেন।

---

[১] শ্রী বিভাস রায়চৌধুরী, *নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা*– (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংযোজিত সংস্করণ: ফাল্গুন ১৩৮১, পৃ. ১০৯

[২] উদ্ধৃত: ডক্টর গীতা সেনগুপ্ত, বিশ্বরঙ্গারয় ও নাটক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

[৩] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৬, পৃ. ৩

অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহোৎসবেও আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় নৃত্য, নাটক এবং সংগীত। একইরকম আয়োজনের বিবরণ পাওয়া যায় 'উদ্যোগ পর্বে'; যখন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে হস্তিনাপুরের যুবরাজ দুর্যোধনের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। এছাড়া *মহাভারতে*র 'বনপর্বে'ও নট এবং নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেদের যুগ থেকে সংস্কৃত নাট্যযুগে প্রবেশ করতে অতিবাহিত হয় দীর্ঘসময়। সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষের মতে– 'প্রথম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের গৌরবময় বিকাশ চলিয়াছিল।'[১] তবে সংস্কৃত নাটক অধিক অলঙ্কারসমৃদ্ধ এবং কাব্যময় হওয়ার কারণে তা সীমিতসংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই শেষপর্যায়ে প্রকৃত সাহিত্যরস আস্বাদনের লক্ষ্যে ভারতীয় অন্য ভাষাগুলো সংস্কৃতের বন্ধন ছিন্ন করে এবং নিজ নিজ ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করে। এরকম প্রেক্ষাপটই বাংলা নাটকের দিগন্ত উন্মোচন করে; যদিও মৌলিক বাংলা নাটক তৈরি হতে অপেক্ষা করতে হয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। এর পূর্বে যা ছিল তা নাটকের লক্ষণ মাত্র, অথবা অনুবাদকর্ম।

বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন *চর্যাপদে* (১৯১৬) বুদ্ধনাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বীণাপাদানাম্ রচিত ১৭-সংখ্যক চর্যায় রয়েছে :

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥[২]

অর্থাৎ

নাচেন বজ্রধর, গান দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিষম হয় ॥

এ পদটি থেকে সহজেই অনুমেয় যে, নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণে মঞ্চস্থ হত বুদ্ধনাটক এবং এ প্রক্রিয়া ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। ১০-সংখ্যক চর্যায় নৃত্যপটিয়সী ডোম্বীর নৃত্যগীতাভিনয় প্রদর্শনের জন্য নৌকাযোগে নানা স্থানে আসা-যাওয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে :

এক সো পদমা চউসটঠা পাখুড়ি।
তঁহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ি।।
হালো ডোম্বী তো পুছামি সদভাবে।

---

[১] অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১০, পৃ. ২

[২] Dr. Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, Dhaka, First Mowla Brothers Edition : February 2007, P. 65

আইসসি জাসি ডোম্বি কাহেরি নাবেঁ।।[১]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*(১৯১৬) কাব্যটিকেও একটি নাট্যকাব্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অশিথিল কাহিনী রচনায়, অখণ্ড আখ্যান গ্রন্থনে, ত্রয়ী-চরিত্রের যুগপৎ প্রযোজনায় এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংঘর্ষে, সর্বোপরি রাধা চরিত্রের সুদক্ষ চিত্রণ এবং সমগ্র কাব্যটির সংলাপ-নির্ভর বিকাশ ও পরিণতিতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* নাট্যধর্ম প্রকাশিত। বড়ু চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ির নিপুণ চিত্রণ, গতিময় ও দ্বন্দ্বময় সংলাপ-যোজনা, চরিত্রের সংঘাত ও বিষাদান্ত কাব্যসমাপ্তি প্রভৃতির মাধ্যমে এ কাব্যটিকে করে তুলেছেন নাট্যগুণান্বিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংলাপ চরিত্রের বাচনিক আচরণ ও কর্মের ক্রমগতির সূচক হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস কখনো নিজের বক্তব্য দেয়ার জন্য কাব্যের কাহিনি-ক্রমে প্রবেশ করেননি, পাত্র-পাত্রীর মুখে সকল সংলাপ ও অভিপ্সা সিদ্ধ হয়েছে। আরেকটি বিষয় লক্ষ করা যাবে এবং তা হলো সংলাপ-রচনায় বড়ুকবির ঔচিত্যবোধ। রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ি– এই তিনটি চরিত্র তিন রকম; তিন রকম তাদের স্বভাব, পরিস্থিতি, মনস্তত্ত্ব এবং আচরণ; বড়ুকবি সে সম্পর্কে শেষাবধি সচেতন ছিলেন। সচেতন ছিলেন বলেই চরিত্রত্রয়ের সংলাপ তিনি স্বতন্ত্রভাবে বিন্যাস করেছেন। 'বংশীখণ্ডে' রাধা এবং কৃষ্ণের সংলাপের কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য। বাঁশি চুরির অভিযোগে রাধাকে কৃষ্ণ অভিযুক্ত করলে, রাধা দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করে :

বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী
আহ্মে আইহনের রাণী।
আহ্মে বাঁশী তোর চোরায়িল কাহ্নাঞি
মুখে আন হেন বাণী।।[২]

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণও রাধাকে জানিয়ে দেয় :

আহ্মে সে তোহ্মার সকল বেভার
রাধা জাণোঁ ভালমতেঁ।
তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে
বাঁশী নিলে কোণ ভিতে।।[৩]

---

[১] Dr. Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[২] *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* (বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ: বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ১২৫

[৩] প্রাগুক্ত পৃ. ১২৫

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাট্যধর্ম বর্ণনা করতে গেলে তার চরিত্রবিচার জরুরি। কারণ একমাত্র চরিত্র ও চরিত্রায়ণ দক্ষতাই নাট্যগুণান্বিত কোনো শিল্পকর্মকে মহার্ঘ্য করে তোলে। সৌভাগ্যজনক সংবাদ হলো– বড়ু চণ্ডীদাস এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সফল। বিশেষত রাধা-চরিত্র রূপায়ণে কবি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, আধুনিক পাঠক তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। রাধা চরিত্র রূপায়ণে সুদক্ষ নাট্যকারের মতো কবি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেছেন। রাধা বিবর্তিত হয়েছে এবং এ বিবর্তনের পেছনে তার যৌবন-চেতনাই ক্রিয়াশীল। বড়ু চণ্ডীদাস প্রেম বর্ণনায় প্রথাগত যে পূর্বরাগ ধারণা রয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ কাব্যে রাধার মধ্যে কৃষ্ণের যে প্রেমাবেগ রয়েছে তা দেহ মিলনের প্রতিক্রিয়ায় জাগ্রত, প্রকাশিত এবং প্রবাহিত হয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা অনেক দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের পর প্রেমে মজ্জমান হয়ে তার গার্হস্থ্য আবেষ্টনী, সামাজিক আবহ ও সাংসারিক পরিপার্শ্ব অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে– যার মাধ্যমে তার গোটা জীবনধর্মই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এছাড়াও চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে 'Strength of will' বলে যে কথাটি রয়েছে রাধা চরিত্রে তার মূর্ত প্রকাশ দেখা যায়।

মধ্যযুগের একটি গুরত্বপূর্ণ কাব্যধারা মঙ্গলকাব্য। মধ্যযুগের চারশত বছরেরও অধিক সময় অজস্র কবি নানা ধরনের মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণির মঙ্গলকাব্যের মধ্যে *চণ্ডীমঙ্গল*, *মনসামঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল* এবং *অন্নদামঙ্গলই* প্রধান। এ শ্রেণির কাব্য পরিবেশনায় এবং গায়েনের ভাবভঙ্গির সঙ্গে দোহারের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হতো নাট্যরস। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যকে গীত এবং নাট-রূপে অভিহিত করেছেন। 'প্রার্থনা' অংশে তিনি বলেছেন–

বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান। [১]

চণ্ডীমঙ্গলের বন্দনায় গীতনাট্য রচনার যে প্রত্যয় কবি ব্যক্ত করেছেন সমগ্র কাব্যেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। এতৎপ্রসঙ্গে কালকেতুর বিবাহ, অরণ্যচারী পশুকুলের উপস্থিতি, চণ্ডীর ছলনা, কালকেতু-ফুল্লরার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, দেবীর ইচ্ছায় কলিঙ্গরাজ্যে বন্যা, কলিঙ্গ রাজার সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ ও দেবী চণ্ডীর বরে মুক্তিলাভ, গঙ্গা ও চণ্ডীর সপত্নীকলহ এবং ভাঁড়ুদত্তের প্রসঙ্গ স্মরণীয়।

[১] মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *কালকেতু উপাখ্যান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ১

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যেও (১৭৫৩) পরিলক্ষিত হয় নাট্যগুণ। পুরাণ, ইতিহাস এবং প্রণয় কাহিনীর এক অভিনব সন্নিবেশে রচিত এ কাব্যে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ-প্রতিসংলাপ লক্ষণীয়। কাব্যমধ্যে দাসু-বাসু, মানসিংহ, মালিনী, বিদ্যাসুন্দর প্রমুখ চরিত্রের সংলাপে বৈচিত্র্য এসেছে এবং ইঙ্গিতায়িত হয়েছে নাট্যধর্ম।

মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অমর কীর্তি। ধর্মতান্ত্রিক দৈবচেতনার পরিবর্তে এ-পর্যায়ের সাহিত্যিকরা সংযুক্ত করেন দুর্মর প্রেমের আস্বাদ। শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলতউজির বাহরাম খান, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল প্রমুখ কবি এ শিল্পধারাকে এক অভূতপূর্ব উচ্চতা প্রদান করেন। এ শ্রেণির প্রথম কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা*। এ কাব্যের 'জোলেখার যৌবন নিবেদন ও ব্যর্থতা' অধ্যায়ে চারটি, 'কারাগারে ইউসুফ : শিশুর সাক্ষ্য' অধ্যায়ের ছয়টি এলাকায় পদশীর্ষে 'দৃশ্য' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে; যা মধ্যযুগের কোনো সাহিত্যে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, এ অংশগুলো তৎকালে প্রচলিত 'পটনাট' বা 'চিত্রনাটের' আকারে উপস্থাপিত হতো।

রোমান্টিক প্রণয়মূলক কাব্য হিসেবে *লায়লী-মজনু* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কাব্যের নানাস্থানে বর্ণিত হয়েছে তৎকালে প্রচলিত নাট, নৃত্য এবং গীত প্রসঙ্গ। মঙ্গল উৎসবে 'ইব্নে সালাম পুত্রের সঙ্গে লায়লীর বিবাহ' অধ্যায়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো :

> শানাই বিগুল বাজে বিউর কন্নাল
> অনেক মধুর বাদ্য বাজত্র বিশাল।।
> অবলা সুন্দরীগণ সুবেশ উত্তম
> কৌতুকে করএ নাট অতি মনোরম।।[১]

এছাড়াও কাব্যের নানা স্থানে পরিলক্ষিত হয় চরিত্রভিত্তিক উক্তি-প্রত্যুক্তি; যা নিঃসন্দেহে নাট্যগুণান্বিত।

তবে মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে নাটকের কিছু কিছু লক্ষণ প্রদর্শিত হলেও এগুলো মূলত নাটক নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটকের স্মরণীয় পথযাত্রা সূচিত হয় ১৭৯৫ সালে। এসময় গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ নামক এক রুশ-দেশীয় অস্থির, স্বপ্নতাড়িত, প্রবল উদ্দীপনাময় বহুস্তর মেধাসম্পন্ন সৃষ্টিশীল যুবক কলকাতায় বেঙ্গলী থিয়েটার (১৭৯৫) নামের একটি

[১] আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ বিরচিত লায়লী-মজনু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, নবম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৩৭-১৩৮

নাট্যশালা স্থাপন করেন এবং তার ভাষা- শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় *The disguise* (১৭৯৫, Richard Paul Jodrell-কৃত) এবং *Love is the best doctor* (সম্ভবত ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের-কৃত) নামক দুটি ইংরেজি প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করেন। লিয়েবেদেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' এবং বঙ্গভাষায় বিদেশি নাটকের রূপান্তরিত মঞ্চায়ন ও প্রযোজনা এদেশে এমন একটি দূরপ্রসারী নাট্যদৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা যুগপৎ সমান সম্পর্কে যুক্ত। দূর-সংস্কৃতির স্লাভ-জগৎ থেকে এসেছিলেন মনস্বী পুরুষ লিয়েবেদেফ; অথচ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। যদিও লিয়েবেদেফের নাট্যমঞ্চের অব্যবহিত পরে কোনো বাংলা নাটক মঞ্চায়নের খবর মেলে না, কিন্তু তাঁর মঞ্চকৌশল ও অভিনয়রীতি বিশেষত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ধারণা উত্তরকালের বাংলা নাটক ও নাট্য-মঞ্চায়নে স্থায়ী প্রভাব রাখে।

এদেশে এভাবেই নাটকের সূত্রপাত হওয়ার সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে হলে অন্ত্য-অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার মতো একটি বিকাশমান রাজধানীর জীবনবাস্তবতা অনুধাবন করা আবশ্যক। তখনকার কলকাতা ছিল সে যুগের তুলনায় বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত। তাছাড়া কলকাতার মতো একটি আধা-গ্রাম আধা-শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনসূত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ছাড়াও অনেক অবাঙালি এবং বহিরাগত অভারতীয় ভাগ্যান্বেষী ভিনদেশি মানুষ ভিড় করেছিল। ব্রিটিশ-শাসিত কলকাতার অর্থনৈতিক জীবন ইংরেজ এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ইউরোপীয় ও এদেশীয় উঠতি ধনিক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে ছিল। সংখ্যালঘু অথচ নিয়ন্ত্রক-ক্ষমতাবান এই মিশ্রশ্রেণি ইউরোপীয় সংস্কৃতির নানা তরঙ্গ ও অভিঘাত স্থানীয় সমাজজীবনে ছড়িয়ে দেয়। নাটক-থিয়েটার এই সাংস্কৃতিক তরঙ্গের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী বিনোদন-মাধ্যম, এবং এটি বাঙালি সংস্কৃতিতে মুদ্রিত করে স্থায়ী প্রভাব। কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম থিয়েটার 'দি প্লে হাউস' স্থাপিত হয় ১৭৭৫ সালে, দ্বিতীয় থিয়েটার 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ১৭৭৫ সালে, এবং লিয়েবেদেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ সালে। পরবর্তীসময়ে বিত্তবান বাঙালিরাও নাট্যশালা নির্মাণে প্রয়াসী হন। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা : 'হিন্দু থিয়েটার'। এ থিয়েটারেই অভিনীত হয় *জুলিয়াস সিজার* এবং উইলসন অনূদিত *উত্তর রামচরিত*। এরপর নবীনচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় *বিদ্যাসুন্দর* এবং আশুতোষ দেবের বাড়িতে অভিনীত হয় *অভিজ্ঞান শকুন্তলা*। এ নাটকগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চের প্রতি বাঙালি দর্শকদের অনুরাগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং গড়ে ওঠে অসংখ্য নাট্যমঞ্চ। বিদোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা,

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রভৃতি নাট্যমঞ্চ স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলা নাটকের জন্মলগ্নকে। একটি বিষয় স্মরণীয় যে, এ পর্যায়ে নাট্যকাররা প্রধানত সংস্কৃত এবং ইংরেজি নাটকের ওপর নির্ভর করে মঞ্চোপযোগী নাটক নির্মাণে প্রয়াসী হন।

সংস্কৃত নাটকের ব্যাপক আধিপত্যের শৃঙ্খল থেকে বাংলা নাটককে সর্বপ্রথম অবমুক্ত করতে সচেষ্ট হন নাট্যকার যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর রচিত *কীর্তিবিলাস* (১৮৫২) নাটকের মাধ্যমে বাংলা মৌলিক নাটকের সূত্রপাত। বাংলার জনজীবনে অতি সুপরিচিত শীত-বসন্তের রূপকথায় বিমাতার নিষ্ঠুরতা বর্ণিত হয়েছে নাটকটিতে। *কীর্তিবিলাস* পাশ্চাত্য নাটকের মতো পঞ্চাঙ্কবিশিষ্ট হলেও ভাষা এবং রচনারীতিতে ছিল সংস্কৃত-আশ্রয়ী।

কীর্তিবিলাসের প্রায় একইসময় প্রকাশিত হয় তারাচরণ শিকদারের *ভদ্রার্জুন* (১৮৫২) নাটক। *মহাভারতের* অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের কাহিনি নাট্যরূপ পেয়েছে এখানে। তবে *মহাভারত* থেকে কাহিনি গ্রহণ করলেও এটিকে বাঙালির সমাজবাস্তবতার সঙ্গে একাকার করে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার।

ভদ্রার্জুনের সমসাময়িককালে প্রকাশিত হয় হরচন্দ্র ঘোষের *ভানুমতী চিত্তবিলাস* (১৮৫২); যদিও এটি তাঁর মৌলিক নাটক নয়। নাটকটি মূলত শেক্সপিয়রের *মার্চেন্ট অব ভেনিস* অবলম্বনে রচিত। অনুবাদকর্ম হলেও এতে নাট্যকার কয়েকটি অতিরিক্ত চরিত্রের অবতারণা করেছেন এবং নাটকের শেষে 'অঙ্গ' নামে নতুন দৃশ্যের সংযোজন করেছেন। মৌলিক নাটক হিসেবে হরচন্দ্রের *কৌরব বিয়োগ* প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। তাঁর অন্য নাটকগুলো হলো– *চারুমুখ চিত্তহারা* (১৮৬৪), যা *রোমিও জুলিয়েটের* অনুবাদ; এবং *রজতগিরি নন্দিনী* (১৮৭৪)।

বাংলা নাটকে কালীপ্রসন্ন সিংহের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনি নাটকে কথ্যভাষারূপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং তার মাধ্যমে নাট্যাভিনয় ও নাট্যরচনার পথ সুগম করে দেন। তিনি কালিদাসের *বিক্রমোর্বশী* (১৮৫৭), ভবভূতির *মালতীমাধব* (১৮৫৮) এবং *মহাভারতের* বনপর্বের অনুসরণে *সাবিত্রী-উপাখ্যান* (১৮৫৮) প্রভৃতি অনুবাদ-নাটক রচনা করেন।

বাংলা নাটকের আদিপর্বে রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক সমস্যা নিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম নাটক রচনা শুরু করেন। রামনারায়ণের জন্ম এবং মানসগঠন প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে হলেও তিনি স্বসমাজের

বিরুদ্ধেই নাটক রচনায় প্রয়াসী হন। তাঁর প্রথম নাটক *কুলীনকুলসর্বস্ব* (১৮৫৪)। 'রংপুর বার্তাবহে' প্রকাশিত (১৮৫৩) জমিদার কালীচন্দ্র রায়ের নাটক-প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন পড়ে তিনি রচনা করেন *কুলীনকুলসর্বস্ব*। এ-নাটকের কাহিনি বৈচিত্র্যহীন হলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। বঙ্গললনার অশ্রুসজল নয়ন তাঁকে এই মতবাদমূলক নাট্যরচনায় প্রণোদিত করেছিল। রামনারায়ণ নিজে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাই আঙ্গিকের দিক দিয়ে *কুলীনকুলসর্বস্ব* সংস্কৃত রীতিতেই রচিত। তাঁর আরেকটি নাটক *নবনাটক* (১৮৬৬), যেটি রচিত হয় বহুবিবাহের ভয়াবহ কুফল প্রদর্শনের জন্য। তিনি পৌরাণিক নাটক এবং প্রহসন রচনায়ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলো হচ্ছে: *রুক্মিণীহরণ* (১৮৭১), *কংসবধ* (১৮৭৫), *ধর্মবিজয়* (১৮৭৫) এবং প্রহসনগুলো হচ্ছে : *যেমন কর্ম তেমন ফল* (১৮৬৮), *চক্ষুদান* (১৮৬৯), *উভয় সঙ্কট* (১৮৬৯)। এছাড়াও তিনি চারটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছেন : *বেণীসংহার* (১৮৫৬), *রত্নাবলী* (১৮৫৮), *অভিজ্ঞান শকুন্তলা* (১৮৬০) এবং *মালতী মাধব* (১৮৬৭)।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তাঁরই সাধনায় বাংলা নাটকে প্রতিষ্ঠা পায় পাশ্চাত্য নাট্যরীতি। বেলগাছিয়া নাট্যশালার আমন্ত্রণে মধুসূদন প্রবৃত্ত হন বাংলা নাটক রচনায়। *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯) তাঁর প্রথম নাটক। *মহাভারতে*র 'শমিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি' উপাখ্যান অবলম্বন করে রচিত হয় এটি। পাশ্চাত্য সাহিত্যে মাইকেলের অবাধ বিচরণ থাকলেও এ নাটকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে; যদিও ইংরেজি নাট্যরীতির প্রভাবে এখানে রয়েছে অঙ্ক বিভাগ, পঞ্চমাঙ্কে সমাপ্তি এবং গর্ভাঙ্কচ্ছেদ। সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন– '*শর্মিষ্ঠা*ই আধুনিক নাটকের পথপ্রদর্শক, সুতরাং প্রাথমিক নাটকের দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাহার মূল্য যে অনেকখানি ইহা স্বীকার করিতে হইবে। *শর্মিষ্ঠা* প্রকাশিত হইলে ইহা শ্রেষ্ঠ নাট্যরূপে বন্দিত হইয়াছিল।'[১]

শর্মিষ্ঠা দর্শকনন্দিত হবার পর মধুসূদন রচনা করেন *পদ্মাবতী* (১৮৬০) নাটক। সমকালীন থিয়েটারগুলোর উন্নাসিকতার কারণে মধুসূদন পাশ্চাত্য নাট্যরীতি প্রবর্তনে সাহসী হননি। এই বাধা অপসৃত করবার জন্য তিনি সুকৌশলে গ্রিক পুরাণের স্বর্ণ-আপেলের কাহিনিকে দেশীয় গল্পে রূপান্তরিত করেন। কলহদেবী-ডিসকর্ডিয়ার নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ আপেলের কারণে জুনো, ভিনাস এবং প্যালাস দেবীত্রয়ের মধ্যকার বিবাদ এবং এরই সূত্র ধরে ট্রয়ের যে যুদ্ধ– তাকে

[১] ড.অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

ভিত্তি করে মধুসূদন ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এ-নাটকের কাহিনি নির্মাণ করেন। *পদ্মাবতী*র শচী, মুরজা ও রতি যথাক্রমে গ্রিক আখ্যানের জুনো, প্যালাস এবং ভিনাসের অনুরূপ।

মধুসূদন-প্রতিভার সর্বাধিক জাগরণ ঘটেছিল *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১) নাটকে। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি হিসেবে স্মরণীয়। দ্বিতীয় জেমস টডের *Annals and Antiquities of Rajasthan* গ্রন্থের ভগ্নাংশ অবলম্বনে নাটকটি রচিত হলেও কোনো রাজনৈতিক কিংবা ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সৃজন করতে চাননি নাট্যকার; বরং প্রত্যক্ষ পারিবারিক জীবন এবং ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তির ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি। *কৃষ্ণকুমারী*তে আলৌকিকতার প্রভাব থাকলেও নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তবে নারীচরিত্রের অঙ্কনে নাট্যকার অধিকতর সফল হয়েছেন। বিশেষভাবে কৃষ্ণকুমারী, বিলাসবতী এবং মদনিকা মাইকেলের চরিত্রসৃজনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; অপর চরিত্র ধনদাস কুটিল, কুচক্রী এবং স্বার্থান্ধ হলেও সজীব এবং প্রাণময়।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় *মায়াকানন* (১৮৭৪) নাটক। *শর্মিষ্ঠা* থেকে *কৃষ্ণকুমারী* পর্যন্ত মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার যে ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়, *মায়াকাননে* তা যেন অনেকটাই অলক্ষ্য। বিশেষত দৈবনির্ভরতা এবং সংস্কৃত নাটকের প্রতি অধিক আনুগত্যের কারণে এ নাটকের নাটকীয় সম্ভাবনা অনেকাংশেই ম্লান হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবিস্মরণীয় কীর্তি তাঁর দুটি প্রহসন : *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০) এবং *বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)। প্রথমটিতে ইংরেজি শিক্ষাভিমানী ইয়ং বেঙ্গলদের নানা উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে; দ্বিতীয়টিতে ধর্ম-আচ্ছাদিত এক বৃদ্ধের গোপন লাম্পট্য ও বিকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। দুটোই কথ্যবাংলায় স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে রচিত। এগুলোর উপহাস-ব্যঙ্গ হয়তো উচ্চমার্গীয় নয় কিন্তু যথেষ্ট মানবিক ও বাস্তব।

'উনিশ শতকে ভারতীয় সমাজ যে সময়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শগত দ্বন্দ্বসংঘাতে নবসমাজ সৃষ্টির তোড়জোড়ে মুখর তখনই আত্মপ্রকাশ ঘটে দীনবন্ধু মিত্রের। তিনি প্রকৃতই দ্বন্দ্বক্ষুব্ধসময়ের নিপুণ রূপকার। তাঁর রচনায় তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজমানসের সংগতি-অসংগতি, শোষণ-বঞ্চনা, নির্যাতন-প্রতিবাদ এবং জটিলতর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক-দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে।'[১] মানুষের বিকৃতি, তার পাপ ও বিবেকবোধের

[১] একেএম খায়রুল আলম, *দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১

যন্ত্রণাকে ভাষারূপ দিয়েছেন তিনি। দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) একদিকে যেমন বিজাতীয়দের অত্যাচারে স্বজাতির মুক্তিকামনা করেছেন, অন্যদিকে জীবনযুদ্ধে যারা পরাজিত, তাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন সহমর্মিতা। তাঁর *নীল-দর্পণ* (১৮৬০) উনিশ শতকের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতার এক বিশ্বস্ত দর্পণ এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সচেতন নাট্যপ্রয়াস। ব্রিটিশ শাসনামলের একটি পর্যায়ে নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে প্রজাবিদ্রোহ চরম আকার ধারণ ধরেছিল তা-ই প্রকটিত হয়েছে এ নাটকে। তাই '*নীলদর্পণ* সাহিত্য ছাড়া আর কিছু। *নীলদর্পণ* বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটি মানব-ভাষ্য।'[১]

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের মধ্যে *নবীন তপস্বিনী* (১৮৬৩), *লীলাবতী* (১৮৬৭) এবং *কমলে কামিনী* (১৮৭৩) অন্যতম। '*নীলদর্পণে*র প্রত্যক্ষচারী জীবনযন্ত্রণা নয়, বরং সমকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বদেশবোধ ও সামাজিক জীবন-অভীপ্সা *নবীন তপস্বিনী*র বিষয়বস্তু।'[২] পক্ষান্তরে *লীলাবতী* নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেম এবং প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতমূলক পরিণতি। তৎসঙ্গে এ নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে কৌলীন্য প্রথার ক্ষতিকর নানা দিক।

সধবার একাদশী (১৮৬৬) দীনবন্ধু মিত্রের একটি সমাজ-দর্পণমূলক প্রহসন। *নীলদর্পণে* নাট্যকারের সমবেদনা ছিল গ্রামীণ কৃষিসমাজকেন্দ্রিক; কিন্তু *সধবার একাদশী*তে তিনি নাগরিক সভ্যতার ক্লেদময় পরিবেশ-পরিসরের বেদনা-বিপর্যয়কে নাট্যরূপ দিয়েছেন। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্যায়-অতিক্রান্ত ক্রমস্ফীত মধ্যবিত্ত সমাজের স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডি *সধবার একাদশী*র বিষয়বস্তু।'[৩] এ নাটকের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে নকুলেশ্বর এবং নিমচাঁদের মদ্যপানকে কেন্দ্র করে। সুরাপান সম্পর্কে মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও অবশেষে এ আড্ডার অন্যতম সদস্য হয়ে ওঠে অটল। নিমচাঁদ-অটলরা তাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচারে বিপর্যস্ত করে তোলে দাম্পত্যজীবন এবং সামাজিক বিধান। সমকালীন ইয়ং বেঙ্গলদের এরূপ চিত্রণে 'দীনবন্ধু তাঁহার পূর্বসূরী মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ইহা সুস্পষ্ট। ঘটনা-সন্নিবেশ, চরিত্রচিত্রণ, এমনকি কথোপকথনে পর্যন্ত এই প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু *সধবার একাদশী* অধিকতর পূর্ণাঙ্গ প্রহসন। ইহার নাটকীয় রস বেশি ঘনীভূত, এবং ইহার চরিত্রসৃষ্টির

---

[১] *দীনবন্ধু রচনাবলী* (ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : ১৯৯৭, পৃ. ২৩

[২] একেএম খায়রুল আলম, *দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

[৩] একেএম খায়রুল আলম, *দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কলানৈপুণ্যের পরিচয় সুপরিস্ফুট।'[১] *নীল-দর্পণ* যদি সমকালীন গ্রামজীবনের দর্পণ হয়, তবে *সধবার একাদশী* নিঃসন্দেহে শহরজীবনের দর্পণ।

সধবার একাদশী যেমন *একেই কি বলে সভ্যতার* অনুকরণে রচিত, তেমনি *বিয়ে পাগলা বুড়োও* (১৮৬৬) মধুসূদন দত্তের প্রহসন *বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ*– এর প্রভাবে পরিকল্পিত। *বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ*-র ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে *বিয়ে পাগলা বুড়োর* রাজীবের রয়েছে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য। তবে পার্থক্য হচ্ছে ভক্তপ্রসাদের মতো রাজীব লম্পট চরিত্র নয়। দীনবন্ধুর তৃতীয় প্রহসন *জামাইবারিকে* (১৮৭২) ধিক্কার জানানো হয়েছে কুলীন ঘরজামাই রাখবার প্রথা এবং বহুবিবাহ রীতির প্রতি। এ প্রহসনের 'প্রতিটি দৃশ্য হাসির বারুদ। তা ব্যঙ্গাশ্রয়ী এবং ব্যঙ্গাতিক্রমী।'[২]

'কলিকাতার নাগরিক জীবন ও রঙ্গমঞ্চ থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী মীর মশাররফ হোসেনের নাট্য সৃষ্টি অবহেলার বস্তু নয়।'[৩] বরং বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে তিনি এক অবিসংবাদিত শিল্পী। 'তাঁর মাধ্যমেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের যোগসূত্র রচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সমাজ-প্রগতির মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বাঙালি মুসলমানের ভাষাগত সংস্কার, দোভাষী পুথির রুচি, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-চিন্তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসা প্রথম সার্থক সাহিত্যশিল্পী।'[৪] মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) প্রথম নাটক *বসন্তকুমারী* (১৮৭৩)। এতে প্রতিপাদিত হয়েছে– সপত্নীপুত্র নরেন্দ্রর নিকট প্রণয় নিবেদনে ব্যর্থতার ফলে ইন্দ্রপুরের রানী রেবতীর চিত্তে জ্বলে ওঠে প্রতিহিংসার আগুন। যার পরিপ্রেক্ষিতে রানী রেবতী রাজার কাছে নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে। প্রহসনমূলক বিচারে নরেন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে তার স্ত্রী বসন্তকুমারীও সহমৃতা হয়। অবশেষে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে রাজা বীরেন্দ্র সিংহ রেবতীকে হত্যা করে এবং নিজেও আত্মহত্যা করে। এভাবে বারবার হত্যা, মৃত্যু এবং আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে *বসন্তকুমারী নাটকের*।

---

[১] ড.অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*,প্রাগুক্ত পৃ. ৯২

[২] *দীনবন্ধু রচনাবলী* (ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[৩] নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ: ভাদ্র ১৩৭৯, পৃ. ১৩৫

[৪] *মীর মশাররফ হোসেন নাট্য-সমগ্র* (ড. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ১

জমীদার দর্পণ (১৮৭৩) মশাররফ হোসেনের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এ নাটকের কাহিনি সমাজবাস্তবতা নির্ভর; যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় জমিদারতন্ত্রের স্বরূপ এবং তাদের অত্যাচারের ভয়াবহতা। এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোশলপুরের জমিদার হায়ওয়ান আলী। ভোগবিলাস আর প্রমোদমত্ততা তার জীবনসঙ্গী। হায়ওয়ান আলীর কামনাবহ্নিতে বিনষ্ট হয় অগণিত নারীর সতীত্ব। অন্তঃসত্ত্বা নুরুন্নেহার তার উদগ্র লালসার আরেক শিকার। নুরুন্নেহারের অনুনয়-বিনয়-কাতরোক্তি কোনো কিছুই তাকে দমিত করতে পারে না। অবশেষে জমিদারের পাশবিক অত্যাচারে মৃত্যু ঘটে তার। এভাবে *জমীদার দর্পণে* জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিপীড়িত মানুষের প্রতি নাট্যকারের গভীর সহানুভূতি এবং জমিদারদের প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়েছে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র (১৭৯৩) প্রভাবে গ্রামবাংলার সরল-সাধারণ কৃষকসমাজের ওপর যে দুর্যোগ এবং হতাশার অন্ধকার নেমে এসেছিল তারই ট্র্যাজিক রূপায়ণ এটি।

মদ্যপান এবং রক্ষিতা সংসর্গ তৎকালীন বাংলায় যে বৃহৎ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, তারই শিল্পরূপ মশাররফ হোসেনের *এর উপায় কি?* (১৮৭৫)। এ প্রহসনের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধাকান্ত মাতাল অবস্থায় রক্ষিতা নয়নতারা এবং তার এক মদ্যপ বন্ধুকে নিয়ে নিজ গৃহে আসে। এক পর্যায়ে নয়নতারার মনোতুষ্টির জন্য সে তার স্ত্রী মুক্তকেশীর ওপর খড়গহস্ত হয়। পরিশেষে মুক্তকেশীর দৃঢ়তা এবং প্রতিবাদী ভূমিকার ফলে রাধাকান্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হয় এবং সুস্থজীবনে প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগী হয়।

সমকালীন বাংলা নাট্যাঙ্গনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)। বাংলা নাটকে ভাষাপ্রয়োগে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেন তিনি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের সংলাপ যেখানে সংস্কৃতের প্রভাবে আড়ষ্ট সেখানে গিরিশচন্দ্রের নাটকের ভাষা অনেকাংশেই সাবলীল এবং প্রাণবন্ত। তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব গৈরিশী ছন্দ। এই নাটকীয় ছন্দের প্রয়োগ তার নাটকগুলোকে প্রদান করে এক ভিন্ন মাত্রা। 'মধুসূদনের মতোই পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব তাঁকে এক পৃথক মানস চেতনা দান করেছিল।'[১] ফলত দেখা যায়, *রামায়ণ* এবং *মহাভারত* উভয় গ্রন্থ থেকেই তিনি নাট্য-উপাদান সংগ্রহ করেছেন। *রামায়ণ* অবলম্বনে তাঁর প্রথম নাটক *রাবণ বধ* (১৮৮১) তৎকালে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। একই বছর প্রকাশিত হয় *সীতার বনবাস* এবং *লক্ষ্মণ বর্জন*। পরের বছরও তাঁর দুটি নাটক প্রকাশিত হয় :

[১] নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

রামের বনবাস এবং *সীতাহরণ* নাটক। *মহাভারতের* কাহিনি অবলম্বনে রচিত তাঁর দুটি নাটক : *অভিমন্যু বধ* (১৮৮১) এবং *পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস* (১৮৮৩)। এছাড়া গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটক হলো : *ধ্রুব চরিত্র* (১৮৮৩), *কমলে-কামিনী* (১৮৮৪), *নল-দময়ন্তী* (১৮৮৩), *শ্রীবৎস-চিন্তা* (১৮৮৪), *প্রহলাদ চরিত্র* (১৮৮৪), *নিমাই সন্ন্যাস* (১৮৮৫), *বুদ্ধদেব চরিত্র* (১৮৮৫), *চৈতন্যলীলা* (১৮৮৬), *বিল্বমঙ্গল* (১৮৮৮), *রূপসনাতন* (১৮৮৮), *পূর্ণচন্দ্র* (১৮৮৮), *বিষাদ* (১৮৮৯), *জনা* (১৮৯৪), *করমেতি বাঈ* (১৮৯৫), *নসীরাম* (১৮৯৬), *কালাপাহাড়* (১৮৯৬), *পাণ্ডব গৌরব* (১৯০০), *শঙ্করাচার্য* (১৯১০), এবং *তপোবল* (১৯১১) প্রভৃতি।

সমকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের নানা সমস্যা-সংকটের চিত্রও পরিস্ফুটিত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের নাটকে। সমাজে বিরাজমান জাল, জুয়াচুরি, প্রতারণা, হত্যা, দেহোপজীবিনীদের কদর্য জীবনযাপন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন তিনি। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকসমূহ হলো : *প্রফুল্ল* (১৮৮৯), *হারানিধি* (১৮৯০), *মায়াবসান* (১৮৯৮), *বলিদান* (১৯০৫), *শাস্তি কিশাস্তি* (১৯০৮), *গৃহলক্ষ্মী* (১৯১২) প্রভৃতি।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায়ও গিরিশচন্দ্র পারঙ্গমতার পরিচয় প্রদর্শন করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে তিনি নাটক রচনা করেছেন। এ শ্রেণির নাট্যধারায় *সিরাজদ্দৌলা* (১৯০৬) তাঁর অমর কীর্তি; যদিও তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসনের নানা বিরোধিতা ছিল *সিরাজদ্দৌলার* মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে। তাঁর অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক : *চণ্ড* (১২৯৭), *মীরকাসিম* (১৩১৩), *ছত্রপতি শিবাজী* (১৩১৪), *ভ্রান্তি* (১৯০২), *সৎনাম* (১৯০৪), *বাসর* (১৯০৬), *অশোক* (১৯০৬) প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্র কিছু প্রহসনও রচনা করেছেন, সেগুলো পঞ্চরং নামে পরিচিত। এগুলো হলো : *সপ্তমীতে বিসর্জন (১৩০৩)*, *বেল্লিকবাজার, বড়দিনের বকশিস* (১৮৯৪), *সভ্যতার পাণ্ডা* (১৮৯৪) প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর রচিত কয়েকটি গীতিনাট্যের মধ্যে *আগমনী* (১৮৭৭), *অকালবোধন* (১৮৭৭), *দোললীলা* (১৮৭৮), *মায়াতরু* (১৮৮১), *মোহিনী প্রতিমা* (১৮৮২), *মলিনমালা (১৮৮২), মলিনা বিকাশ (১২৯৭), আবু হোসেন (১৩০৩)* প্রভৃতি অন্যতম।

তৎকালে যে সকল অভিনেতা নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শ-সাহচর্যে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল বসু (১৮৭৫-১৯২৮) অন্যতম। তবে গিরিশচন্দ্রের অনুসারী হলেও নাটক রচনায় তিনি অবলম্বন করেন একটি স্বতন্ত্র রীতি। 'গিরিশচন্দ্রের

ভাবনিষ্ঠ, তত্ত্বসন্ধানী দৃষ্টি জীবনের গূঢ় এবং গভীর বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিত। কিন্তু তরল ও হালকা জীবনের বিপর্যয় এবং বিকৃতির দিকেই অমৃতলালের তীক্ষ্ণ এবং বক্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।'[১] সমকালীন নবজাগরণলব্ধ প্রগতিচেতনাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন বিদ্রূপের দৃষ্টিতে। যেমন : *বিবাহ-বিভ্রাট* (১৮৮৪) প্রহসনে তিনি নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। এ নাটকের চরিত্রপাত্রও হয়ে উঠেছে তাঁর সনাতনপন্থী জীবনধারার বাহন।

বাবু (১৮৯৪) প্রহসনে ষষ্ঠীচরণ ইংরেজি শিক্ষিত বাবু এবং একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক। তাই নাট্যকারের দৃষ্টিতে সে বিবেচনাবোধ-বর্জিত চরিত্র। ইংরেজি শিক্ষার কুপ্রভাবে সে তার মায়ের প্রতি চরম বিরূপতা প্রকাশ করে। স্ত্রীকে সে 'লেডি'রূপে গড়ে তুলতে চায় এবং বৈকালিক ভ্রমণে তাকে নিয়ে যায় ইডেন গার্ডেনে। অন্যদিকে ফটিক এবং তিনকড়ি এখানে আধুনিকতা-বিরোধী চরিত্র। তাই এদের প্রতি নাট্যকারের পক্ষপাত স্পষ্ট।

সমকালীন নবজাগরণের প্রতি অমৃতলালের ক্ষোভ প্রতিফলিত হয়েছে *বৌমা* (১৮৯৭) প্রহসনেও। এ নাটকে দেখা যায়, জীবনের প্রথম পর্যায়ে হিড়িম্বার মধ্যে ছিল মানবিকবোধ ও সুকোমলবৃত্তি। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের ফলে তার মনোজগতে সূচিত হয় নেতিবাচক পরিবর্তন। দূরসম্পর্কের এক কাকা বামাদাসের সঙ্গে তার প্রণয় এবং পরবর্তীকালে বিবাহ হয়; যদিও সাংসারিক জীবনে বামাদাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের মতো। হিড়িম্বার ভাবশিষ্য বৌমা কিশোরী। নভেল-পড়ুয়া নারী বাঙালি গৃহস্থ সংসারে কী ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে– তারই দৃষ্টান্ত এ চরিত্রটি। বৌমা বিদ্যার্জনের গৌরবে আত্মহারা। তাই সন্তান-ধারণ তার নিকট কুরুচিকর এবং অসভ্যতা। পিতৃদত্ত নাম কিশোরী পরিত্যাগ করে সে নিজেকে 'উল্লঙ্গিনী' বলে পরিচয় দেয় এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণে লিপ্ত হয়। অমৃতলালের অন্য প্রহসনগুলো হলো : *চোরের উপর বাটপাড়ি* (১৮৭৬), *একাকার* (১৮৯৫), *চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে* (১৮৮৬), *তাজ্জব ব্যাপার* (১৮৯০), *কৃপণের ধন* (১৯০০) প্রভৃতি।

অমৃতলাল বসুর সাহিত্যিক খ্যাতি মূলত প্রহসন রচনায়। পাশাপাশি বেশ কিছু নাটকও রচনা করেছেন তিনি। *তরুবালা* (১৮৯১), *বিমাতা বা বিজয় বসন্ত* (১৮৯৩), *হরিশচন্দ্র* (১৩০৭), *আদর্শ বন্ধু* (১৯০০), *খাসদখল* (১৯১২), *নবযৌবন* (১৯১৪), *যাজ্ঞসেনী* (১৯১৮), *ব্যাপিকা বিদায়* (১৯২৬) তাঁর নাট্যচর্চার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

---

[১] ড.অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

বাংলা সাহিত্যের অন্যসব রূপকল্পের মতো নাট্যরচনায়ও একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাট্য, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য, সামাজিক নাটক, প্রহসন– অর্থাৎ নাট্যসাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় রবীন্দ্রনাথ বিচরণ করেছেন সাবলীলভাবে। 'বাঙলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্র নাটক একটি পৃথক অধ্যায় এরূপ বলিলেও ভুল বলা হয় না।'[১] 'রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রধান গুণ, ইহার অনবদ্য অতুলনীয় ভাষা। ভাষারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট তাঁহার ভাষাকে যেভাবে ইচ্ছা গঠিত এবং চালিত করিয়াছেন। এই ভাষার কৃতিত্বেই তাঁহার নাটক বিরল-ঘটনাময় হইলেও যথেষ্ট আবেগময় এবং গতিমান হইয়াছে।'[২]

রবীন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক পর্যায়ের নাটকগুলো সাংগীতিক সৌন্দর্যে ও সৌকর্যে মণ্ডিত। তাঁর রচিত প্রথম গীতিনাট্য *বাল্মীকি-প্রতিভা* (১৮৮১)। দেবী সরস্বতীর কৃপালাভের মধ্য দিয়ে দস্যু রত্নাকর হলেন ভারতের আদিকবি– এই কাহিনিই নাট্যরূপ পেয়েছে এখানে। *কালমৃগয়া* (১৮৮২) গীতিনাট্য রচিত হয়েছে রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধের কাহিনি অবলম্বনে। '*বাল্মীকিপ্রতিভার* মতো *কালমৃগয়ার* কয়েকটি গানের সুর সম্পূর্ণ বিলাতী সুরে তৈরি।'[৩] *বাল্মীকিপ্রতিভা* ও *কালমৃগয়া* যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, তেমনি *মায়ার খেলা* (১৮৮৮) নাট্যের সূত্রে গানের মালা।

১৮৮৬ সালে *রাজা ও রাণী* কাব্যনাট্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-নাটকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু হয়। এ পর্যায়ের নাটকের মধ্যে *বিসর্জন* (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা। এ-নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে প্রেমের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। *বিসর্জনের* মতো *মালিনী* (১৮৯৬) নাটকেও রবীন্দ্রনাথ সনাতন আর্যধর্ম এবং কল্যাণধর্মের দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ সর্বকালেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষ মানবতা কিংবা মনুষ্যত্বের সংকট বিষয় হিসেবে গৃহীত হলেও তাঁর রূপক কিংবা রূপকাশ্রিত নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে জগৎ ও জীবনসম্পর্কিত গূঢ়তত্ত্ব এবং দার্শনিকতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য রূপক-সাংকেতিক নাটক হচ্ছে : *রাজা* (১৯০৯), *অচলায়তন* (১৯১২), *ডাকঘর* (১৯১২),

---

[১] শ্রী বিভাস রায়চৌধুরী, *নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা*– (দ্বিতীয় খণ্ড) নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংযোজিত সংস্করণ: ফাল্গুন ১৩৮১, পৃ. ৪৩

[২] ড.অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

[৩] বিপ্লব হুমায়ূন, রবীন্দ্রনাথ: তৃতীয় দশ বছর, মূধণ্য, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ২৯

ফাল্গুনী (১৯১৫), *মুক্তধারা* (১৯২২), *রক্তকরবী* (১৯২৩), *কালের যাত্রা* (১৯৩২),*তাসের দেশ* (১৯৩৩) প্রভৃতি। *রাজা* নাটকে এক অভিনব পন্থায় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁর জগৎ-পরিচালনার ধারা প্রতীকী তাৎপর্যে উপস্থাপন করেছেন। সত্যকে দূরে সরিয়ে রাখলে নিজেদের মধ্যে তৈরি হয় সংকীর্ণতা, জীবন হয়ে যায় বৃত্তাবদ্ধ; অনেকটা অচলায়তনের মতো; যা আত্মঘাতী প্রবণতারই নামান্তর– এ সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে *অচলায়তনে*। 'ডাকঘর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটকগুলির অন্যতম।'[১] দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত পরিবেশ অবলম্বনে রচিত এ নাটকে রূপকায়িত হয়েছে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের সার্থকতা। রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি, জাতীয়তা প্রভৃতি বহু বিষয় রূপকার্থসমন্বিত হয়ে অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে *মুক্তধারায়*। অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার চারিত্র্য, তার বিচিত্রমাত্রিক প্রবণতা এবং মানবতার মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে *রক্তকরবী* নাটকে।

বাংলা নাট্যক্ষেত্রে ঋতুনাট্য এবং নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিল্পপ্রয়াস। 'ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যে চারিটি বস্তুর সম্মেলন ঘটিয়াছে– কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্র। ইহাকে কবির নাটকীয় টেকনিকের চতুরঙ্গ রীতি বলা যাইতে পারে।'[২] রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলো : *শেষবর্ষণ*, *বসন্ত* (১৯২৬), *নটরাজ*, *ঋতুরঙ্গশালা*, *নবীন* (১৯৩১), *শ্রাবণ-গাথা* (১৯৩৪) এবং নৃত্যনাট্যগুলোর মধ্যে *শাপমোচন*, *শ্যামা (১৯৩৯)*, *নটীর পূজা (১৩৩৩)*, *চিত্রাঙ্গদা* (১৯৩৬), *চণ্ডালিকা* (১৯৩৭) প্রভৃতি অন্যতম। সামাজিক নাটকও রবীন্দ্র-নাট্যের একটি বিশেষ দিক। এসকল নাটকের মধ্যে *প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬)*, *গৃহপ্রবেশ* (১৯২৫), *শোধবোধ* (১৩৩৩), *বাঁশরী* (১৩৪০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ বেশকিছু প্রহসন রচনা করেছেন। যেমন : *শেষরক্ষা* (১৩৩৫), *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৮৯৭), *হাস্যকৌতুক* (১৯০৭), *ব্যঙ্গকৌতুক* (১৯০৭), *গোড়ায় গলদ* (১৮৯২), *চিরকুমার সভা* (১৯০৮) প্রভৃতি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পচর্চার প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে নাটক। বাংলা নাটকে তিনি নির্মাণ করেন এক স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল। পৌরাণিক নাটক না লিখে তিনি ঐতিহাসিক নাটকের প্রাচুর্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। স্বদেশহিতৈষণা, পরাজিত ও পরাধীন জাতির মর্মপীড়া

[১] শ্রী অশোক সেন, *রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮২. পৃ. ২৯৫

[২] শ্রী প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৬, পৃ. ১০২-১০৩

এবং জাতীয় জীবনের সংক্ষোভ তাঁর নাটকে দ্রষ্টব্য। তাঁর প্রথম ইতিহাসাশ্রিত নাটক *তারাবাঈ* (১৯০৩)। 'পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের রোমান্টিক কাহিনীই এই নাটক রচনায় নাট্যকারকে প্রেরণা দিয়েছিল।'[১] *রাণা প্রতাপসিংহ* (১৯০৫) নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজদের প্রতীক হিসেবে মোগলদের এবং স্বদেশীদের প্রতীক হিসেবে রাজপুতদের প্রদর্শন করেছেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাণা প্রতাপের চিতোর উদ্ধারের কঠোর সংকল্প থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছরের কাহিনি বিবৃত হয়েছে এ নাটকে; যেখানে নাট্যকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল সৈনিক প্রতাপের অতুল বীরত্ব, অনুপম দেশপ্রেম এবং অপরিমেয় ত্যাগের চিত্র সশ্রদ্ধ নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। *রাণা প্রতাপসিংহ* নাটকে যে আন্দোলনের সূত্রপাত *মেবার পতন* (১৯০৮) নাটকে তারই সমাপ্তি। '*প্রতাপসিংহ* নাটকে চরিত্রগুলির মাধ্যমে নাট্যকারের আদর্শবাদ ধ্বনিত হয়েছে বটে, কিন্তু ইতিহাসকে অতিক্রম করে নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রাধান্য লাভ করেনি। অপরপক্ষে *মেবার পতন* নাটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারধর্মিতা মুখ্যস্থান অধিকার করেছে।'[২]

দ্বিতীয় জেমস টডের *Annals and Antiquities of Rajasthan* গ্রন্থের 'মারবারের ইতিহাস' অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন *দুর্গাদাস* (১৯০৬)। এ নাটকে সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তাল ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় মোগল, মেবার, মারবার, মারাঠা– এই চার জাতিগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ উল্লেখসূত্রে তিনি তাঁর জাতীয়তাবোধকেই অনেকবেশি উচ্চকিত করে প্রকাশ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকসমূহের মধ্যে মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় নাটক *সাজাহান* (১৯০৯)। সম্রাট সাজাহানের রাজত্বের শেষপর্যায়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সম্রাটের চার পুত্রের মধ্যে যে বিরোধ এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয়– তাকেই নাট্যকার মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিধৃত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে *তারাবাই* (১৩১০), *সিংহলবিজয়* (১৩২২), *নুরজাহান* (১৯০৮), *চন্দ্রগুপ্ত* (১৯১১) এবং সামাজিক নাটকের মধ্যে *পরপারে* (১৯১২), *বঙ্গনারী* (১৯১৬) প্রভৃতি অন্যতম। এছাড়া পুরাণ অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেছেন *পাষাণী* (১৯০০), *সীতা* (১৯০৮) এবং *ভীষ্ম* (১৯১৪)। প্রহসন রচনায়ও তিনি প্রদর্শন করেছেন অসামান্যতা। *কল্কি*

[১] *দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী*– প্রথম খণ্ড,(ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ : জুন ১৯৯২, পৃ. ২৮

[২] *দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী* – প্রথম খণ্ড, (ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

অবতার (১৮৯৫), *বিরহ* (১৮৯৭), *ত্র্যহস্পর্শ* (১৯০০), *প্রায়শ্চিত্ত* (১৯০২), *পুনর্জন্ম* (১৯১৯) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রহসন।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)। বাস্তবজীবনের দুঃখ-গ্লানি চিত্রণের পরিবর্তে তিনি রোমান্টিকধর্মী কাল্পনিক কাহিনি অবলম্বন করে নাটক রচনা করেন। 'নাচ-গানের প্রাচুর্য থাকাতে'[১] তাঁর নাটকের দর্শকপ্রিয়তা ছিল অনেকবেশি। *আলিবাবা* (১৮৯৭), *বেদৌরা* (১৯০৩), *বরুণা* (১৯০৮), *ভূতের বেগার* (১৯০৮), *বাসন্তী* (১৯০৮), *কিন্নরী* (১৯১৮) প্রভৃতি গীতিনাট্য এ কারণেই সমকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এক্ষেত্রে শুধু প্রাচ্যদেশীয় নয়, বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য তিনি কখনও কখনও আশ্রয় নিয়েছেন আরব-পারস্য-তুরস্ক প্রভৃতি দেশের নানা কল্পিত কাহিনির। এ প্রসঙ্গে *জুলিয়া* (১৩০৬), *সপ্তম প্রতিমা* (১৩০৯), *দৌলতে দুনিয়া* (১৩১৫), *পলিন* (১৩১৭), *মিডিয়া* (১৯১১), *রূপের ডালি* (১৩২০), *বাদশাজাদী* (১৩২২) নাটকগুলো স্মরণীয়।

ইতিহাস-আশ্রিত নাটক রচনায়ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনি ইতিহাসকে খুব বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেননি; বরং অনেকক্ষেত্রে তিনি কল্পনাশ্রয়ী ঘটনা এবং চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। *অশোক* (১৯০৮), *পদ্মিনী* (১৯০৬), *প্রতাপাদিত্য* (১৯০৩), *আলমগীর* (১৯২১), *বাঙ্গালার মসনদ* (১৩১৭), *বিদুরথ* (১৯২৩) *চাঁদবিবি* (১৯০৭), *রঘুবীর* (১৯০৩), *খাঁজাহান* (১৯১২), *আহোরিয়া* (১৯১৫), *বঙ্গে রাঠোর* (১৯১৭) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্স। ক্ষীরোদপ্রসাদ বেশ কয়েকটি পৌরাণিক নাটকও রচনা করেছেন। যেমন : বভ্রুবাহন (১৩০৬), *সাবিত্রী* (১৯০২), *উলুপী* (১৯০৬), *ভীষ্ম* (১৯১৩), *রঞ্জাবতী* (১৯০৪), *রামানুজ* (১৯১৬), *মন্দাকিনী* (১৩২৮), *নরনারায়ণ* (১৯২৬) প্রভৃতি।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) বাংলা নাটকের ধারায় এক অবিসংবাদিত শিল্পী-ব্যক্তিত্ব। 'দেশপ্রেম, মানবকল্যাণ, উদার-অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি, হিন্দু-মুসলমান মিলন-কামনা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ব্যক্তিচরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য।'[২] *গৈরিক পতাকা* (১৯৩০) নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যচর্চার সূত্রপাত। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর গৌরবময় অভ্যুত্থানের কাহিনি এ

[১] ড.অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

[২] ড.অমৃতলাল বালা ও ড. ঊষা রাণী সরকার (সম্পাদিত), *শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা-২০০৯, পৃ. ১৬

নাটকের বিষয়বস্তু। তবে তাঁর জনপ্রিয়তা মূলত *সিরাজদ্দৌলা* (১৯৩৮) কেন্দ্রিক। সিরাজকে তিনি দেশাত্মবোধী জাতীয় বীরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ নাটকে ইতিহাসের মূলসত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে নাট্যকার কল্পনাশ্রয়ী নানা চরিত্রের অবতারণা করে একটি অসাধারণ নাট্য-পরিবেশ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন । এতৎপ্রসঙ্গে আলেয়া এবং গোলাম হোসেন চরিত্র দুটি স্মরণীয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের *সাজাহান* নাটকের অনুকরণে শচীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন *রাষ্ট্রবিপ্লব* (১৯৪৪) নাটক। এখানে দারা এবং ঔরংজীবকে কেন্দ্র করে নাটকের ঘটনাংশ আবর্তিত ও পল্লবিত হয়েছে। এছাড়া দুই অঙ্কে বিভক্ত *ধাত্রীপান্না* (১৯৪৩) তাঁর একটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটক। শচীন্দ্রনাথ কয়েকটি সামাজিক এবং পারিবারিক নাটক লিখেছেন। তবে এগুলোতে কোনো জটিল কাহিনির অবতারণা নেই। তাঁর এ শ্রেণির নাটকগুলোর মধ্যে *স্বামী-স্ত্রী*, *তটিনীর বিচার*, *প্রলয়*, *নার্সিংহোম*, *জননী* (১৯৩৩), *মাটির মায়া* (১৯৪৩), *ঝড়ের রাতে*, *রক্তকমল*, *সুপ্রিয়ার কীর্তি*, *কালো টাকা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শচীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কিংবা দেশাত্মবোধক নাটকের সংখ্যাও কম নয়। যেমন : *দশের দাবী* (১৯৩৪),*নরদেবতা*, *সংগ্রাম ও শান্তি*, *ভারতবর্ষ*, *এই স্বাধীনতা*, *সবার উপর মানুষ সত্য* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে আধুনিক জীবনের সঙ্গে সমীকৃত করে নাটক রচনা করেছেন মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)।'কল্লোল-যুগের সাহিত্যর সঙ্গে যোগ রাখিয়াই তিনি প্রচলিত সমাজনীতির বিরুদ্ধে অনেক স্থানে বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নিষিদ্ধ ও নিন্দিত জীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন।'[১] মূলত নাটকের মাধ্যমে পুরাণের স্তব কিংবা ধর্মের গুণকীর্তন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর মাধ্যমে মানব-মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন তিনি। মন্মথ রায়ের প্রথম পৌরাণিক নাটক *চাঁদ সদাগর* (১৯২৭)। *মনসামঙ্গল* কাব্যের প্রচলিত কাহিনি এ নাটকের মূল উপজীব্য। নাটকে চাঁদ সদাগরের দেবদ্রোহিতা এবং বেহুলার প্রচলিত সমাজবিধি অস্বীকার করবার মধ্য দিয়ে নাট্যকার চরিত্র দুটিকে আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন করে উপস্থাপন করেছেন। বৈদিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত তাঁর অপর নাটক *দেবাসুর* (১৯২৮); যেখানে মহর্ষি দধিচীর আত্মদানের চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে একটি দেশাত্মবোধক নাট্যপরিমণ্ডল। শনির কোপদৃষ্টির ফলে রাজা শ্রীবৎসকে বারবার যে লাঞ্ছনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে– তারই নাট্যরূপ *শ্রীবৎস*। তবে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক

[১] ড.অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৮

নাটকগুলোর মধ্যে *কারাগার* (১৯৩০) প্রথম শ্রেণিভুক্ত। *শ্রীমদ্‌ভাগবতের* কংস-বাসুদেব-দেবকীর কাহিনি অনুসারে নাটকটি রচিত হলেও অনেক স্থানেই নাট্যকারের মৌলিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ সুস্পষ্ট। তাঁর অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মধ্যে *সাবিত্রী*, *খনা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পৌরাণিক নাটকের মতো ঐতিহাসিক নাটক রচনার মাধ্যমেও মন্মথ রায় ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেন। *অশোক* (১৯৩৪) তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক নাটক। 'ধর্মপ্রবৃত্তি আর চণ্ডপ্রবৃত্তির মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লান্ত পৃথিবীর অন্যতম নরপতি দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের জীবনবেদনাকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটক রচনা করা হইয়াছে।'[১] তাঁর অন্য ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে রয়েছে *মীর কাশীম*, *সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৫৮)*, *অমৃত অতীত* প্রভৃতি। মন্মথ রায়ের সামাজিক নাটকসমূহ হচ্ছে *মমতাময়ী হাসপাতাল* (১৯৫২), *জীবনটাই নাটক* (১৯৫২), *পথে-বিপথে* (১৯৫২) *ধর্মঘট* (১৯৫৩), *মহাভারতী* (১৯৫৩), *চাষীর প্রেম* (১৯৫৩), *উর্বশী*, *মরা হাতী লাখ টাকা*, *বন্দিতা* (১৯৫৩), *অমৃত অতীত* (১৯৬০), *বন্যা* (১৯৬১) প্রভৃতি। এ বিষয়টিও স্বীকার্য যে 'মন্মথ রায় বাংলা সাহিত্যে আধুনিক একাঙ্ক নাটকের জন্মদাতা।'[২] অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন তিনি। *মুক্তির ডাক* (১৯২৩), *রাজপুরী*, *যজ্ঞফল*, *লক্ষহীরা*, *উপচার*, *কানাই বলাই*, *অসাধারণ*, *অর্কেস্ট্রা*, *টোটোপাড়া*, *উল্কাপাত* প্রভৃতি তাঁর সফল একাঙ্ক নাটক।

কথাসাহিত্যিক হিসেবে মনোজ বসুর (১৯০১-১৯৮৭) খ্যাতি সর্বাধিক হলেও নাট্যকার হিসেবেও তিনি সার্থক। 'সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁহার সুগভীর সহানুভূতির পরিচয়ে যেমন তাঁহার কথাসাহিত্যের সার্থকতা, তাঁহার নাটকের মধ্যে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাঁহার কথাসাহিত্যে বাংলার পল্লী-প্রকৃতির সহজ সুন্দর রূপটির উপর সাধারণ নরনারীর জীবন যেমন রেখাপাত করিয়াছে, নাটকের মধ্যেও তাহার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়।'[৩] মনোজ বসুর প্রথম নাটক *প্লাবন* (১৯৪২)। জলপ্লাবনের ভাঙা-গড়ার প্রতীকী চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে এক পল্লিনারীর জীবনচিত্র উন্মোচিত হয়েছে এ নাটকে। কান্তরাম এবং রহিমের

---

[১] ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৩৭১

[২] ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

অত্যাচারিত জীবন অবলম্বনে রচিত হয় তাঁর পরবর্তী নাটক *নতুন প্রভাত* (১৩৫০)। দাম্পত্য-জীবনের টানাপোড়েনের কাহিনি মনোজ বসুর *বিপর্যয়* এবং *রাখিবন্ধন* (১৩৫৬)।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬) অন্যতম। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের সমস্যাজর্জরিত নিত্যদিনের চিত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন তিনি। স্বামীর অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততা, পরিবারে তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতি এবং স্ত্রীর অকারণ সন্দেহ একটি সুখী পরিবারকে কীভাবে ক্রমবিপর্যয়ের দিকে নিক্ষেপ করে– তারই চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে বিধায়ক ভট্টাচার্যের *মেঘমুক্তি* (১৯৩৮) নাটকে। এছাড়া ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটি ছেলেকে নিয়ে *বিশ বছর আগে*, কামরূপ কামাখ্যার ওপর একটি কল্পিত কাহিনি অবলম্বন করে *কুহকিনী*, এক বেদের মেয়েকে নিয়ে *মালা রায়*, পঞ্চাশের মন্বন্তরের ওপর ভিত্তি করে *তেরোশো পঞ্চাশ* (১৯৫৬) নাটক রচনা করেন তিনি। বিধায়কের অন্য সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে *মাটির ঘর* (১৯৫৪), *রক্তের ডাক*, *তুমি আর আমি*, *চিরন্তনী*, *খেলা*, *ক্ষুধা* (১৯৫৭) আধুনিক নাট্যপ্রেমীদের নিকট সুপরিচিত। সামাজিক নাটকের বাইরে রয়েছে *রাজরাপ্পা* নামে তাঁর একটি ঐতিহাসিক নাটক, *তাই তো* (১৯৪৮) শীর্ষক একটি কমেডি এবং *কান্না* ও *হাসি* নামক দুটি একাঙ্ক।

বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার এবং নাট্যপ্রযোজক। রাজনৈতিক চেতনায় তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী। তাই সংঘচেতনার কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর নাটকে। বিজন ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ নাটক *নবান্ন* (১৯৪৪)। রাজনীতি, মহাজননীতি এবং ধনতন্ত্রের কুটিল অর্থনীতির ঘূর্ণিজালে জড়িয়ে গ্রামীণ জনজীবনে যে দুর্যোগের অন্ধকার ও চরম অসহায়তা নেমে আসে এবং পরিদৃষ্ট হয় সংঘবদ্ধ প্রতিরোধমূলক প্রয়াস-প্রচেষ্টা তারই শিল্পিত রূপকল্প *নবান্ন*। এটি প্রথাসিদ্ধ বাংলা নাটকের মধুর বীণায় এক গুরুগম্ভীর সংযোজন এবং 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘে'র ম্যানিফেস্টোর গুরুত্বপূর্ণ ফসল। বাংলার কৃষকসমাজের প্রাণোজ্জীবিত জীবনধারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মুনাফাখোর-মজুতদারদের অত্যাচার-নিপীড়নের ফলে কীভাবে নিঃস্ব ও নিঃশেষ হয়ে যায়– তারই চিত্র *নবান্ন*। তবে নাট্যকার কৃষকসমাজের হতাশা-দীর্ণ জীবনের পাশে সম্ভাবনার কথাও ব্যক্ত করেছেন এবং এক্ষেত্রে শাসক-পীড়ক-শোষকশক্তির বিরুদ্ধে তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নবান্নের মতো *দেবীগর্জন* (১৯৬৬) নাটকেও বিজন ভট্টাচার্য মধ্যস্বত্বভোগী, অত্যাচারী, জোতদার শ্রেণির অমানুষিক নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেছেন এবং শেষপর্যন্ত কৃষক এবং সর্বহারা শ্রেণির বিজয় ঘোষণা করেছেন। *গোত্রান্তর* (১৯৬০) নাটকে একজন স্কুলশিক্ষক বাস্তবতার কষাঘাতে কীভাবে মধ্যবিত্ত জীবন থেকে গোত্রান্তরিত হয়ে বস্তিবাসী শ্রমিকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন– তারই কাহিনি বিধৃত হয়েছে। অন্যদিকে 'মিল-মালিকের মুনাফা লোভ এবং শ্রমিক শোষণের নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছে'[১] *অবরোধে*। এগুলো ছাড়াও বিজন ভট্টাচার্য অসংখ্য নাটক রচনা করেছেন। যেমন: *আগুন* (১৯৪৩), *জবানবন্দী* (১৯৪৩), *জীয়ন কন্যা* (১৯৪৮), *জতুগৃহ* (১৯৫১), *মরাচাঁদ* (১৯৬০), *ছায়াপথ* (১৯৬১), *মাস্টারমশাই* (১৯৬১), *ধর্মগোলা* (১৯৬৭), *গর্ভবতী জননী* (১৯৬৯), *লাস ধুইয়া যাউক* (১৯৭০), *সোনার বাংলা* (১৯৭১), *হাসখানির হাঁস* (১৯৭৭) প্রভৃতি।

বিশিষ্ট নট, নাট্যকার এবং আধুনিক থিয়েটারের অন্যতম পথিকৃৎ উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩)। পরিশ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামের চিত্রাঙ্কনে যেমন, ঠিক তেমনি শ্রেণিসংগ্রামের রূপ ও স্বরূপ উপস্থাপনায় তিনি প্রদর্শন করেছেন বিরল কৃতিত্ব। ফলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের বহুবিচিত্র বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নাটকে। ভারতীয় জীবন-পরিসরে মহাবিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, নৌবিদ্রোহ, সতীদাহ প্রথা, দেশবিভাগ ও গান্ধী হত্যা, নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি যেমন নাটক রচনা করেছেন, ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত মহান অক্টোবর বিপ্লব, ভিয়েতনাম-কিউবা-চীন-ফ্রান্সের বিপ্লব, জার্মানিতে নাৎসি অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট বিপ্লব প্রভৃতিও হয়ে উঠেছে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। বিশাল মনীষা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিশ্বরাজনীতি ও নাট্যতত্ত্বে অসামান্য দখল, ইতিহাসচেতনা ও সহজাত কৌতুকবোধ প্রভৃতি তাঁর নাটককে করে তুলেছে দর্শকপ্রিয় ও শিল্পসফল। আধুনিক থিয়েটারের তিনি প্রকৃতই এক স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।

উৎপল দত্তের প্রথম নাটক *ছায়ানট* (১৯৫৮)। চলচ্চিত্র-অঙ্গনের বিচিত্র জীবনছবি রূপায়িত হয়েছে এ নাটকে। বিশেষত এ জগতের উজ্জ্বল এবং আলোকিত জীবনের পাশে সাধারণ শিল্পীদের যে হতাশা ও দীর্ঘশ্বাস লুকায়িত রয়েছে, তা-ই এখানে উৎকীর্ণ হয়েছে নান্দনিক পরিচর্যায়। তবে এটি প্রথম নাটক বলে কোনো কোনো সমালোচক বিশেষ গুরুত্ব প্রদান না করলেও এ কথা নিদ্বির্ধায় বলা যায়, নাট্যকার উৎপল দত্তের হয়ে-ওঠার বীজ নিহিত রয়েছে

[১] ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬

ছায়ানটে। এ নাটকে তাঁর যে নাট্য-মানস অঙ্কুরিত হয়েছে, পরবর্তীকালে অন্যান্য নাটকে তা অনেক বেশি বিকশিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অস্থির, উত্তাল ও সংকটময় সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত হয় উৎপল দত্তের *টিনের তলোয়ার* (১৯৭১) নাটক। ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বরে উপনিবেশিত কলকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' (১৮৭২) দীনবন্ধু মিত্রের *নীল-দর্পণ* (১৮৬০) নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তন করে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন'। এ আইন প্রবর্তনের ফলে সমকালীন নাট্যকারদের পক্ষে ব্রিটিশ রাজশক্তি-বিরোধী কোনো নাট্যপ্রযোজনা সম্ভব ছিল না । এমতাবস্থায় আপসকামী প্রতাপ চাঁদ জহুরী, গুমূর্খরায়ের মতো অবাঙালি ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসে ব্যবসায়িক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে। নাট্যশালাকে তারা পুরোপুরিভাবে পরিণত করে ব্যবসানির্ভর প্রতিষ্ঠানরূপে। *টিনের তলোয়ার* নাটকে উৎপল দত্ত সে সকল লড়াকু, ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যপরিচালক এবং নাট্যকর্মীদের মহিমান্বিত করেছেন, যাঁরা শেষপর্যন্ত উপেক্ষা করতে পেরেছেন নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের রক্তচক্ষুকে। এছাড়া *অঙ্গার* (১৯৫৯), *ঘুম নেই* (১৯৬১), *কল্লোল* (১৯৬৮), *রাইফেল* (১৯৬৮), *ফেরারী ফৌজ* (১৯৬৯) প্রভৃতি উৎপল দত্তের নিখুঁত নাটকরূপে বিচার্য।

বাংলাদেশের মঞ্চনাটক এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী (১৮৭৯-১৯৫৯)। সমাজের উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত মানুষের যন্ত্রণা-বেদনা শব্দরূপ পেয়েছে তাঁর নাটকে। নবনাট্য আন্দোলনের যুগে তুলসী লাহিড়ীর সর্বাপেক্ষা ব্যবসাসফল নাটক *দুঃখীর ইমান (১৯৪৭)*। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কঠিন পরিস্থিতিতে বাংলার নিঃস্ব কৃষক সম্প্রদায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কখনও কখনও প্রদর্শন করেছে মনুষ্যত্বের মহিমা– এটিই *দুঃখীর ইমান* নাটকের বিষয়বস্তু। নাট্যকারের *ছেঁড়া তার* (১৯৫০) উত্তর বাংলার নিরক্ষর কৃষকসমাজের বাস্তব জীবন ও সংস্কারের সফল রূপায়ণ; *বাংলার মাটি* নাটক সদ্যবিভক্ত পাকিস্তান অংশের এক হিন্দু পরিবারের সমস্যা-সংকটের শিল্পিত দর্পণ। এছাড়া বিভাগোত্তর পর্যায়ের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যা-কণ্টকিত জীবনের কাহিনি নাট্যরূপ পেয়েছে তুলসী লাহিড়ীর *লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসারে* (১৯৫৯)।

বাংলা নাটকে মুসলিম নাট্যকারদের মধ্যে শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) অনন্য। কবি হিসেবে পরিচিত হলেও নাট্যাঙ্গনেও তিনি সমান জনপ্রিয়। বিশেষত ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি অর্জন করেছেন ব্যাপক সুখ্যাতি। 'শাহাদাৎ হোসেন ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতা হিসেবে

গিরিশ-দ্বিজেন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদের উত্তরসূরি হয়েও কোন প্রকার সংকীর্ণ চেতনা, অনুদারতা ও উচ্ছ্বাসের দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। সরস বৈদগ্ধ্য ও বাস্তব জীবনবোধ তাঁর নাটককে দান করেছে সত্যিকার শিল্প মহিমা।'[১] *সরফরাজ খাঁ (১৯২০), আনারকলি (১৯৪৫), নবাব আলীবর্দী* এবং *মসনদের মোহ (১৯৪৬)*– এই চারটি নাটক মূলত তাঁর নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন। এছাড়া তাঁর রচিত অন্য নাটকগুলো হলো : *শা-জাহান আলমগীর* (১৩৪৮), *জাহাঁগীরের আত্মসমর্পণ* (১৩৪৯) প্রভৃতি। নবাব সরফরাজ খাঁর সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে প্রভাবশালী রাজকর্মচারীদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এর ফলে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন এবং বরণ করেন করুণ মৃত্যু– বাংলার ইতিহাসের এ করুণ অধ্যায় *সরফরাজ খাঁ* নাটকের উপজীব্য। ঐতিহাসিক সূত্রানুযায়ী, পিতা-পুত্রের (উড়িষ্যার শাসনকর্তা শুজাউদ্দীন এবং তার পুত্র মীর্জা আসাদ) মিলনের সুমধুর চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে– শাহাদাৎ হোসেনের *মসনদের মোহ* নাটকে।

শাহাদাৎ হোসেনের সমসাময়িক নাট্যকার ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)। *কামাল পাশা* (১৯২৭), *আনোয়ার পাশা (১৯৩২), ভিস্তীবাদশা, নিজাম ডাকাত* প্রভৃতি তাঁর নাট্যরচনা। *কামাল পাশা* পঞ্চাঙ্ক নাটক। তুরস্কের ব্যক্তিত্বহীন খলিফা অপমানজনক সেভার্স চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে অসন্তুষ্ট হন কামাল পাশা। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকশ্রেণির নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হন তিনি। পরবর্তীকালে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ গ্রিক সৈন্য তুরস্ক আক্রমণ করলে কামাল পাশা মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে জাতিকে এ কঠিন সংকট থেকে উদ্ধার করেন। এভাবে তুরস্কে উসমানি রাজবংশের পতন হয় এবং নব্য গণতান্ত্রিক-রাষ্ট্র তুরস্কের কর্ণধার হন মোস্তফা কামাল পাশা– এটিই নাটকের মূল বিষয়। *কাফেলা* ইব্রাহীম খাঁর সামাজিক নাটিকা। এর আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে বাংলার গ্রামীণ মুসলিম-সম্প্রদায়ের জীবনাচার নিয়ে। সকল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং 'ফতোয়া' উপেক্ষা করে কীভাবে নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটে– তাই প্রতিপাদিত হয়েছে এ নাটকে। মূলত 'পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে যে নূতন ভাবের আলোড়ন শুরু হইয়াছিল, তাহারই সার্থক প্রতিফলন *কাফেলা*র মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।'[২]

সমকালীন জাতীয় জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসত্তাকে সঠিকপথে পরিচালিত করতে বাংলা নাটকে আকবর উদ্দীনের (১৮৯৫-১৯৭৮) আবির্ভাব। *সিন্ধু বিজয়* (১৯৩০), *সুলতান মাহ্মুদ*

[১] মুহম্মদ মজির উদ্দিন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, নওগাঁ, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭০, পৃ. ১৬০

[২] ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০

(১৯৩১), বন্দীর মুক্তি (১৯২৭), *আজান* (১৯৪৬), *নাদির শাহ* (১৯৫৩), *মুজাহিদ* (১৯৬৩) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম। সতেরো বছর বয়সী মুসলিম সেনাপতি মুহম্মদ ইবনে কাসেমের সিন্ধুজয়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয় আকবর উদ্দীনের *সিন্ধু বিজয়* নাটক। এ নাটকে নাট্যকার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, 'সাহস, শৌর্য, বীর্য, ঐক্য, ঈমান, শৃঙ্খলার মূল্যে সেদিন যেমন করে সিন্ধুর বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়েছিল আজো সেই মন্ত্রেই মুক্তি আসবে।'[১] *নাদির শাহ* নাটকে নাদিরকে যথাক্রমে দস্যু সর্দার, ইরানের বাদশাহ এবং দিগ্বিজয়ীরূপে চিহ্নিত করেছেন নাট্যকার। অন্যদিকে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর সন্দ্বীপবাসীর ওপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার-নির্যাতনের যে কলঙ্কজনক অধ্যায় সূচিত হয়েছে তারই নাট্যরূপ আকবর উদ্দীনের *মুজাহিদ* (১৯৬৩) নাটক।

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রধান পরিচয় কবি হলেও নাটক রচনায়ও তাঁর প্রয়াস প্রশংসনীয়। অবশ্য 'নাটক বলতে যে বাস্তবজীবনের ছবি তার বাহ্যিক ও অন্তর্লোকের দ্বন্দ্ব সংঘাত নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যে সুখ দুঃখ হাসি কান্নায় আমাদের জীবন উদ্বেলিত, মন সঙ্কুচিত, নজরুল নাট্য-সাহিত্যে সে জীবনের সাধ আমরা পাই না। সামাজিক মানব তার বাস্তব জীবনের কামনা বাসনার আকর্ষণ বিকর্ষণ নিয়ে নজরুলের নাটকে উপস্থিত হয়নি। তার নাটকের পাত্র পাত্রী কল্পরাজ্যের অধিবাসী।'[২] তবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও জনপ্রিয়তার বিচারে নজরুলের নাটক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে পরিগণিত হয়েছে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক *ঝিলিমিলি* (১৯২৭)। এ নাটকের আখ্যান গড়ে উঠেছে একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনির আশ্রয়ে। হাবিব এবং ফিরোজা পরস্পরের প্রেমমুগ্ধ। কিন্তু হাবিব বি.এ. পাশ নয় বলে ফিরোজার পিতা মির্জা সাহেব তাদের এ সম্পর্ককে স্বীকৃতি প্রদান করে না। অতঃপর নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে হাবিব যখন কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাশ করে আসে, তখন সে জানতে পারে– ফিরোজা চলে গেছে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে।

সেতুবন্ধ (১৯২৭) একাঙ্কিকায় ঘোষিত হয়েছে প্রকৃতির শক্তি ও মাহাত্ম্য। এ নাটকের পরিকল্পনায় নজরুলের মৌলিকতা প্রশংসনীয়। ইট, কাঠ, সুরকি, মেঘ, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানকে মানবিক সত্তায় রূপ দিয়েছেন তিনি। *আলেয়া* (১৯৩১) নাটকে মীনকেতু, কৃষ্ণা

[১] মুহম্মদ মজির উদ্দিন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

[২] নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০০

প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে মানবজীবনের চিরন্তন অনুভূতিগুলো শব্দরূপ পেয়েছে। *মধুমালা* (১৯৩৭) নাটকে ফুটে উঠেছে কাল্পনিক এক রাজপরিবারের প্রত্যাশা-প্রাপ্তির বৃত্তান্ত। মূলত এ নাটকে 'প্রেম পিয়াসী শাশ্বত প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ের অনুভূতিই রূপ নিয়েছে রাজপুত্র-রাজকন্যাদের প্রেম কাহিনীর মাধ্যমে।'[১] এছাড়া *ভূতের ভয় (১৯২৭), শিল্পী (১৩৩৭), পুতুলের বিয়ে* নজরুলের অন্যান্য নাট্যকর্ম।

গতানুগতিক ঐতিহাসিক কাহিনি পরিত্যাগ করে জীবনবোধের বাস্তব পথে অগ্রসর হন নাট্যকার নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯)। নাটকীয় রচনামাধুর্যের জন্যে মোমেনকে জনৈক সমালোচক 'সচেতন শিল্পী'[২] অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। *নেমেসিস* (১৯৪৮) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। 'পরিকল্পনায়, সংলাপের ব্যঞ্জনায় ও অনিবার্যতায় এবং উপস্থাপনায় *নেমেসিস* বাংলা নাটকে একক।'[৩] এ নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের চোরাবাজারিকে কেন্দ্র করে। নাটকের একক চরিত্র সুরজিত নন্দী প্রাক্তন শিক্ষক। ধনী ব্যবসায়ী নৃপেন বোসের কন্যা সুলতাকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে একটি শর্তে : তিন মাসের মধ্যে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে হবে। ষড়যন্ত্রের জালে আটকে পড়া সুরজিত এরপর নৃপেন বোসকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ অর্থের এক লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকতে দেশ এবং জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে ইচ্ছে হয় না তার। ইতোমধ্যে পত্রসূত্রে যখন সে জানতে পারে তার স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা, তখন এককালের সহপাঠী অসীমের ছুরির আঘাতে প্রাণ হারায় সে। মূলত 'গরীব শিক্ষক সুরজিত তার বিবেক বিক্রির পাপে ভাগ্যদেবীর ক্রুর অভিশাপে হয়েছে জর্জরিত– প্রতিশোধের দেবী দিয়েছে প্রাণঘাতি শাস্তি। এখানেই নামকরণ হয়েছে সার্থক।'[৪]

রূপান্তর নাটকে (১৯৪৮) নুরুল মোমেন জীবনযুদ্ধের এক জটিল সমস্যাকে নাট্যরূপ প্রদান করেছেন। এখানে পরিদৃষ্ট হয়, রশিদ বিলেত থেকে প্রকৌশল-বিদ্যায় কৃতকার্য হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে স্ত্রী রাজিয়াকে আর গ্রহণ করতে চায় না। উপরন্তু নিজের কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সহকারীরূপে নিযুক্ত করে এক যুগোপযোগী নারীকে। 'লেডি অব দি পার্ক' নাম্নী এ ছদ্মনারী

---

[১] নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪

[২] ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪

[৩] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৩,পৃ. ৪৭২

[৪] মুহম্মদ মজির উদ্দিন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

মূলত তারই স্ত্রী রাজিয়া। সে কীভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে রশিদকে স্বামী হিসেবে পুনর্বার অর্জনে সক্ষম হয় তারই দৃশ্যরূপ *রূপান্তর*। নুরূল মোমেনের অন্য নাটকগুলোর মধ্যে *যদি এমন হতো* (১৯৬০), *নয়াখান্দান* (১৯৬১), *আলোছায়া* (১৯৬২), *আইনের অন্তরালে* (১৯৬৭), *শতকরা আশি* (১৯৬৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় কথাশিল্পী। অবশ্য কেবল উপন্যাস রচনায় নয়, নাট্যকার হিসেবেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয় ও সমাদৃত। এদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সফল রূপায়ণে তাঁর নাটক সমৃদ্ধ। 'তিনি মানব জীবনের বিবিধ ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অবলম্বন করিয়া তীব্র ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইচ্ছাকৃত অত্যাচার ও পীড়নে সমাজের সাধারণ লোকের কিরূপ দুঃখ ও লাঞ্ছনা হয়, তাহার নিখুঁত বাস্তবচিত্র শওকতের নাটকে পাওয়া যায়।[১] *আমলার মামলা* (১৯৪৯) শওকত ওসমানের একটি 'চতুরঙ্গ কমেডি'। এ নাটকে ব্রিটিশ সরকারের কিছু উচ্চপর্যায়ের আইসিএস কর্মকর্তার অন্তঃসারশূন্যতা এবং তাদের অসংলগ্ন কর্মকাণ্ডের প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শিত হয়েছে। *তস্কর লস্কর* (১৯৪৫) নাটকে বিবৃত হয়েছে নির্যাতিত শ্রেণির লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা এবং ক্ষমতাবানদের শোষণ-পীড়নের বাস্তব চিত্র। *কাঁকর মণি* (১৩৫৬) প্রহসনেও নাট্যকার অভিজাত শ্রেণির মানবিক মূল্যবোধের শোচনীয় বিপর্যয়কে ব্যঙ্গ করেছেন; তৎসঙ্গে ধর্মকে পুঁজি করে মানুষ কীভাবে অধর্মে লিপ্ত হয়, তারও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত শওকত ওসমানের একমাত্র নাটক *বাগদাদের কবি* (১৩৫৯)। এ নাটকে বাগদাদের খলিফা হারুনর রশিদের শাসনব্যবস্থা এবং ব্যক্তি চরিত্রের অন্ধকার অধ্যায়টি উন্মোচিত হয়েছে।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) প্রধানত কবি হিসেবে বাঙালি পাঠক সমাজে সর্বাধিক পরিচিত। নাট্যকার হিসেবেও তিনি বিদ্বৎমহলে সমান সমাদৃত। মৌলিক নাটকের পাশাপাশি অনুবাদ নাটক রচনায়ও তাঁর পারদর্শিতা স্বীকৃত। 'তাঁর নাটকে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে সমকালীন রাজনীতি, ইতিহাস-নির্ভর কাহিনী; একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর নাটক হয়েছে প্রতিবাদী। ফলত ৫২র ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে এদেশের সকল স্বাধিকার-সংগ্রামে তাঁর সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে অনুপ্রেরণাসঞ্চারী। সিকান্দার আবু জাফরের প্রথম এবং অবিস্মরণীয় নাট্যকর্ম *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (১৯৬৫)।

[১] ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫

১৯৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশী প্রান্তরে সংঘটিত এক অন্যায়-যুদ্ধে পতন ঘটে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার। এ ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রকে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন নাট্যকার।'[১] এছাড়া বাংলা সাহিত্যে আরাকান রাজসভার সভাকবি আলাওলকে নিয়ে রচিত তাঁর একটি কালজয়ী নাটক *মহাকবি আলাউল* (১৯৬৬)।

ইতিহাস-আশ্রয়ী নাটক রচনায় সিকান্দার আবু জাফর সর্বাধিক সফল হলেও রূপক নাটক রচনায় তাঁর কারুদক্ষতা বিস্ময়কর। *মাকড়সা* (১৯৫৯) এবং *শকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৬১) ষাটের দশকের প্রতিকূল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর দুটি রূপক নাট্যকর্ম। 'সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানি অপশক্তি কীভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের যাপিত জীবন-পরিসরের সুন্দর ও শোভন পরিমণ্ডলকে বিপর্যস্ত করেছে, তা নাট্যকার নান্দনিক পরিচর্যায় উৎকীর্ণ করেছেন'[২] *মাকড়সা* নামক একাঙ্কিকায়। অন্যদিকে *শকুন্ত উপাখ্যানে* প্রকাশিত হয়েছে সিকান্দার আবু জাফরের যুদ্ধবিরোধী মানস-প্রবণতা। 'এখানকার কোন পাত্র-পাত্রীই মানুষ নয়, সমস্ত চরিত্রই কতগুলো বিভিন্ন জাতের পাখী। আলোচ্য নাটকটিতে এই বিভিন্ন জাতের পাখীর রূপকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিশেষ কিছুসংখ্যক উচ্চ ক্ষমতাবান মানুষের নির্বুদ্ধিতা এবং ক্ষমতার লোভকে ব্যঙ্গ করে পরিশেষে দেখাতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ নয়, ক্ষমতা নয়, ভালবাসা এবং মৈত্রীর বন্ধন দিয়েই মানুষকে জয় করা সম্ভব। মানুষের মঙ্গলের জন্য এর চাইতে শ্রেষ্ঠ পন্থা আর দ্বিতীয়টি নেই।'[৩]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) প্রধানত কথাশিল্পী হলেও নাটক রচনায় তাঁর অবদান সুদূরসঞ্চারী। 'আমাদের নাট্যসাহিত্যে এ্যাবসার্ড নাটকের জন্মদাতা সম্ভবত তিনিই।'[৪] তাঁর নাটকের সংখ্যা তুলনায় কম; কিন্তু এ স্বল্পসংখ্যক নাটকেই নাট্যকারের গভীর মানবিক চেতনা এবং সংস্কারমূলক আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। *বহিপীর* (১৯৫৫,) *তরঙ্গ-ভঙ্গ* (১৯৬৪), *সুরঙ্গ* (১৯৬৪), *উজানে মৃত্যু* (১৯৬৩)– এ চারটি নাটক রচনা করেই ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা

---

[১] মীর হুমায়ূন কবীর, 'সিকান্দার আবু জাফরের নাটক : সিরাজ-উ-দ্দৌলা', শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা, দ্বিত্রিংশ বর্ষ (প্রথম সংখ্যা), ১৪২০ বঙ্গাব্দ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭৩

[২] মীর হুমায়ূন কবীর, সিকান্দার আবু জাফরের রূপক নাটক, সাহিত্য গবেষণাপত্র, বর্ষ ॥ ১ সংখ্যা ॥ ১ অগ্রহায়ণ ১৪২১, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা, পৃ. ১৯৩

[৩] মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ২১৪

[৪] ভূমিকা, *উপন্যাসসমগ্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*, প্রতীক, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৫

নাট্যসাহিত্যে একটি ভিন্ন শিল্পকাঠামো নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। 'প্রথম উপন্যাস *লালসালুর*(১৯৪৮) মতো প্রথম নাটক *বহিপীরে* (১৯৬০) অনুস্যূত হয়েছে বহির্বাস্তবতা; যদিও সেই বহির্বাস্তবতা আবার বহুস্তর, বহুলাঙ্গ ও ব্যঞ্জনাগর্ভ। অন্য দুটি প্রধান নাটক *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬৫) ও *উজানে মৃত্যুতে* (১৯৬৩) অন্তর্বাস্তবতা (inner reality) ও উদ্ভট-বাস্তবতাই (absurd-reality) তাঁর কেন্দ্রীয় আরাধ্য। উপন্যাসের মতো তাঁর নাটকও জীবন-নির্বাচন, জীবন-অবলোকন ও জীবন-রূপায়ণের দিক থেকে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র। নিঃসঙ্গ মানুষের চেতনাময় অন্তর্জগত, অস্তিত্ব-চিন্তায় আর্ত মানবচরিত্র, নৈঃসঙ্গ্যে ও আতঙ্কে স্তম্ভিত ও তামসী প্রহেলিকায় নিমজ্জিত দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিমানুষ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটকে গভীর গুরুত্বে বিবেচিত হয়েছে। উপন্যাসে-ছোটগল্পে সর্বত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আধুনিকতার আনুগত্য করেছেন–উপন্যাসে যুক্ত করেছেন পাশ্চাত্য উপন্যাসের চেতনাপ্রবাহরীতি, ছোটগল্পে সঞ্চারিত করেছেন ব্যঞ্জিত চিত্রকল্পের সংহতি; আর নাটকে অঙ্গীকার করেছেন উদ্ভট থিয়েটার ও অভিব্যক্তিবাদী ও অস্তিত্ববাদী নাট্যকলার আধুনিকতম প্রকরণ।'[১]

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) বাংলাদেশের মাটি, মানুষ এবং ভাষার প্রতি নিবেদিত একজন নাট্যশিল্পী। শিক্ষক, গবেষক, নাট্য-প্রযোজক, অভিনেতা সকলক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। পাশ্চাত্য নাটক এবং নাট্যকারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল তাঁর। এর ফলে মঞ্চ-পরিচালনা ও প্রকরণ-নিষ্ঠায় তাঁর নাটক হতে পেরেছে ইউরোপ-মনস্ক। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সত্তর দশকের প্রারম্ভ পর্যন্ত সময়সীমায় রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া এবং অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ফলে বাংলাদেশে যে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে– মুনীর চৌধুরীর নাটক প্রধানত তারই প্রতিধ্বনি।

মুনীর চৌধুরীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক *রক্তাক্ত প্রান্তর* (১৯৬১)। নাটকটি রচিত হয়েছে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) ঘটনা অবলম্বনে। তবে ইতিহাস এবং যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এখানে নাট্যকারের প্রেমচেতনাই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। *রক্তাক্ত প্রান্তরে* দেখা যায়, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও স্বজাতির নিকট থেকে কোনো সম্মানজনক চাকরি অর্জনে ব্যর্থ হন ইব্রাহিম কার্দি। এরপর মারাঠা শিবিরে যুক্ত হয়ে নিজ দক্ষতায় সেনাপতি পদে

[১] গিয়াস শামীম 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক', *শ্যামলিমা* (রামপদ হালদার সম্পা.), ২০১৫, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৬

অধিষ্ঠিত হন তিনি। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ইব্রাহিম কার্দির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন স্বয়ং তার স্ত্রী জোহরা বেগম। কেননা মারাঠারা হত্যা করেছে জোহরার পিতা মেহেদী বেগকে। যুদ্ধক্ষেত্রে একদিকে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ, অন্যদিকে স্বামীর প্রতি ভালোবাসার দ্বন্দ্ব প্রতি মুহূর্তে তাড়া করে জোহরাকে। নাটকের শেষে পাঠান-শক্তি পরাজিত হয় এবং আহতাবস্থায় মারা যান ইব্রাহিম কার্দি। এভাবে এক তীব্র শূন্যতা এবং বেদনা পানিপথের প্রান্তরের মতো জোহরা বেগমের হৃদয়কেও রক্তাক্ত করে তোলে। *চিঠি* (১৯৬৬) মুনীর চৌধুরীর আরেকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'তবে *রক্তাক্ত প্রান্তর* দূর ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বিত ট্র্যাজেডি, আর *চিঠি* বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকালীন ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক কলহ, আন্দোলন, প্রেমানুভূতি ও কর্তৃপক্ষের হাস্যকর কার্যক্রম সমন্বিত কমেডি শ্রেণীভুক্ত প্রহসন।'[১]

রক্তাক্ত প্রান্তর এবং *চিঠি* ব্যতিত মুনীর চৌধুরীর অন্য মৌলিক নাট্যকর্মগুলো মূলত একাঙ্কিকা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয় তাঁর বিখ্যাত একাঙ্ক নাটক *কবর* (১৯৫৩)। *নষ্টছেলে* (১৯৫০) একাঙ্কিকার কাহিনি নির্মিত হয়েছে আত্মগোপনে থাকা এক বিপ্লবীকে কেন্দ্র করে। '*কবর* এর মতো তীব্র প্রতিবাদী চেতনায় ঋদ্ধ না হলেও এ নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থায় প্রচলিত মূল্যবোধকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করা হয়েছে।'[২] নাট্যকারের অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় *মানুষ* (১৯৪৭) একাঙ্কিকায়। এছাড়া মুনীর চৌধুরীর অন্য দুটি একাঙ্কিকা সংকলন *দণ্ডকারণ্য* (১৯৬৬) এবং *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য* (১৯৬৯)। দণ্ডকারণ্যে সংকলিত একাঙ্কিকাগুলো হলো– *দণ্ড, দণ্ডধর ও দণ্ডকারণ্য*; এবং *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য* অংশে স্থান পেয়েছে *পলাশী ব্যারাক*, *ফিট কলাম*, *আপনি কে*, *একতালা-দোতালা*, *মিলিটারী* এবং *বংশধর* নামক একাঙ্ক নাটক।

'পূর্ব পাকিস্তানের নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের গৌরবের দাবী আসকার ইবনে শাইখ অনায়াসে করতে পারেন।'[৩] তাঁর নাটকের অধিকাংশ বিষয় সামাজিক জীবন এবং ঐতিহাসিক উপকরণ থেকে গৃহীত। *বিরোধ* (১৯৪৮) আসকার ইবনে শাইখের

---

[১] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৩৭-৩৮

[২] মোঃ জাকিরুল হক, দুই *বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৭, পৃ. ৩০

[৩] নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৯

(১৯২৫-২০০৯) প্রথম নাট্যকর্ম। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ মামলা-মোকদ্দমা করে কীভাবে সর্বস্বান্ত এবং নিঃস্ব হয়ে পড়ে, মূলত তা-ই প্রতিপাদিত হয়েছে এ নাটকে। অন্যদিকে 'এক গভীর যন্ত্রণাময় অন্ধকার যুগ থেকে মুক্তির আলোকময় দিগন্তে মানুষের ক্রম পদচারণার আলেখ্য'[১] *পদক্ষেপ* (১৯৫১) নাটক। *বিদ্রোহী পদ্মায়* (১৯৫৩) অঙ্কিত হয়েছে অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজাদের সংগ্রাম এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার চিত্র। *দুরন্ত ঢেউ* (১৯৫৪)– এ সংকলিত হয়েছে চারটি একাঙ্কিকা : *দুর্যোগ*, *আওয়াজ*, *যাত্রী* এবং *দুরন্ত ঢেউ*। মেহনতী মানুষের প্রতি নাট্যকারের সহমর্মিতা এসব নাটকেও প্রদর্শিত হয়েছে। *অনুবর্তন* (১৯৫৯) নাটকে রয়েছে একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ-যন্ত্রণার করুণ রূপায়ণ। এছাড়া *এপার ওপার* (১৯২০) এবং *বিল বাওড়ের ঢেউ* (১৯৬০) তাঁর দুটি সমবায় ভিত্তিক নাটক। সামাজিক নাটক রচনার পাশাপাশি আসকার ইবনে শাইখ ঐতিহাসিক নাটক রচনায়ও বৈচিত্র্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন। ইংরেজদের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত ফকির আন্দোলনের কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয় তাঁর *অগ্নিগিরি* (১৯৫৯) নাটক। *রক্তপদ্ম* (১৯৬১) এবং *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫) নাটকের পটভূমি ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ। এছাড়া *লালন ফকীর* (১৩৭৫) তাঁর একটি ভিন্ন আঙ্গিকের নাট্যসৃষ্টি যেখানে 'নাট্যকারের অতীত ঐতিহ্য সন্ধানী ঐতিহাসিক মনই কাজ করেছে।'[২]

সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০) বাংলাদেশের এক ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যকার। পঞ্চাশের দশকে ইউরোপীয় সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী এবং অধিবাস্তববাদী ভাবধারার যে প্রকাশ ঘটেছিল, তার সঙ্গে এদেশের শিল্পরীতির প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় তাঁর নাটকের মাধ্যমে। তবে আঙ্গিক এবং উপস্থাপনার দিক থেকে পাশ্চাত্যধর্মী হলেও সাঈদ আহমদের নাটকের বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক নয়; বরং বাংলাদেশের বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের প্রাণান্ত সংগ্রামই হয়ে উঠেছে তাঁর নাটকের শিল্প-উপাদান। বাংলাদেশের অ্যাবসার্ড নাট্যধারায় সাঈদ আহমদের *কালবেলা* (১৯৬২) উজ্জ্বল ও অনন্য। নাটকটি রচিত হয় ১৯৬১ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিকায়। *মাইলপোস্ট* নাটকের বিষয় দুর্ভিক্ষ। স্বয়ং নাট্যকার বলেছেন– 'দুর্ভিক্ষ যে নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সংকটের এক তীব্র আর্তনাদও– এই সত্য প্রকাশের তাগিদে *মাইলপোস্ট* লেখা হয়।'[৩] *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯) নাটকের উপজীব্য

---

[১] মুহম্মদ মজির উদ্দিন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯

[২] নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩

[৩] *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক* , বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৭৬, পৃ. ৪৫

বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোককাহিনি শিয়াল এবং কুকুর ছানার গল্প। তবে নাটকটি কেবল লোককাহিনির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এর মধ্য দিয়ে নাট্যকার শিয়ালরূপী অপশক্তিকে মোকাবেলা করবার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

সাঈদ আহমদের সর্বশেষ নাটক *শেষ নবাব* (১৯৮৯)। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র; যদিও সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ইতোমধ্যে অনেক নাটকই রচিত হয়েছে। 'তবে সে সবের সঙ্গে এ নাটকটির মৌলিক একটি পার্থক্য রয়েছে। *শেষ নবাব*-এর বক্তব্য স্পষ্ট ও গভীর এবং তা সমকালকে স্পর্শ করে। পলাশীতে নবাব সিরাজ হেরে গেছেন বটে কিন্তু তাঁর বীরত্ব, স্বাধীনতা চেতনা, মর্যাদাবোধ হারেনি। নাটকে যে যুদ্ধ তা উপলব্ধির, সচেতনতার এবং সর্বোপরি তা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।'[১]

নুরুল মোমেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আসকার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর কিংবা সাঈদ আহমদ প্রমুখ নাট্যকারের পদযাত্রায় বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গন যখন মুখরিত, তখনই আত্মপ্রকাশ ঘটে আনিস চৌধুরীর। মূলত 'পঞ্চাশের দশকে মুনীর চৌধুরীর পর আনিস চৌধুরীর লেখা নাটক নিয়েই বাংলাদেশের নবনাট্যের যাত্রা শুরু হয় বলা যায়। এ কারণে সময়ের বিচারে তাঁর নাটক পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।'[২] আনিস চৌধুরী তাঁর কালের অন্য নাট্যকারদের মতো কোনো বৈচিত্র্যধর্মী নাট্যস্টাইল নির্মাণ করেননি সত্য; কিন্তু নাটকে বাস্তবজীবন, বিশেষত মধ্যবিত্তের যাপিত জীবনকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এ কারণে 'তাঁর নাটকে কোন আঙ্গিক অভিনবত্ব নেই। তবে সমাজকে তিনি রূঢ়ভাবে উপস্থিত করেছেন।'[৩] নাট্যকারের এ সমাজ-সংশ্লিষ্টতাই তাঁকে নিয়ে যায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে। সমকালে 'মুনীর চৌধুরী যেখানে তাঁর স্বসৃজিত নাটক ও একাঙ্কিকাসমূহে বাস্তববাদী হয়েও অত্যন্ত ফর্মাল, আনিস চৌধুরী সেক্ষেত্রে অসম্ভব ঘরোয়া। শুধু তাই নয়, আমাদের সমাজ পরিপার্শ্বের মানব-মানবীকুলের আন্তঃসম্পর্কজাত ঘটনার আন্তরিক চিত্রায়নে, বাস্তববাদী চরিত্রাঙ্কনে এবং তাদের মুখ নিঃসৃত স্বাভাবিক সংলাপ রচনায়, ধ্রুবার্থে এই ভূখণ্ডের নাট্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রথম প্রধান নাট্য-

[১] সাঈদ আহমদ, *শেষ নবাব*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ১৩
[২] সৌরভ সিকদার,*জীবনী গ্রন্থমালা : আনিস চৌধুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
[৩] মুহম্মদ মজির উদ্দিন, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১

কারুকার তিনিই। এবং এখানেই তাঁর এক সময়ের, বিশেষত পুরো ষাট দশকের জনপ্রিয়তম নাট্যকার হবার রহস্য নিহিত।'[১]

বিভাগোত্তরকালেই আনিস চৌধুরী তাঁর নাটক রচনা শুরু করেন এবং এক্ষেত্রে কলকাতা-বিচ্ছিন্ন পূর্ববাংলার শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবাস্তবতাকে তাঁর নাটকের অন্যতম উপকরণ হিসেবে নির্বাচন করেন। নবগঠিত এ শ্রেণির অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, তাদের সাংসারিক টানাপোড়েন, মানসিক দোদুল্যচিত্ততা এবং হতাশার চিত্র তাঁর নাটকে যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে, অন্যত্র তা দুর্লভ। এ কারণেই ঢাকার নাট্যমঞ্চে যখন 'প্রধানত ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, প্রসাদ বিশ্বাসসহ আরো কতিপয় নাট্যকারের ভাবালু সস্তা তথাকথিত নাটকের দাপট প্রবল; সে সময় আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র* এবং *এ্যালবাম* নাটক এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।'[২] বাংলা নাটকে আনিস চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, সমকালীন অন্য নাট্যকারদের মতো ইতিহাস, পুরাণ কিংবা হৃত ঐতিহ্যের ধূসর জগতে বিচরণ করেননি তিনি; বরং তাঁর সমস্ত নাট্যকর্ম জুড়েই বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত জনশ্রণির জীবনযন্ত্রণা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাঁর শিল্পদৃষ্টি প্রখর প্রতিবাদী না[৩] হলেও এ শ্রেণির প্রতি তাঁর সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট।

---

[১] *সচিত্র সন্ধানী*, ১৩ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ৯ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৩৫

[২] সৌরভ সিকদার,*জীবনী গ্রন্থমালা : আনিস চৌধুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২

[৩] আনিস চৌধুরীর নাটক যে প্রতিবাদী হতে পারেনি, এটি তাঁর সীমাবদ্ধতা নয়; বরং তাঁর কালের সীমাবদ্ধতা। বিশিষ্ট নাট্যকার আতাউর রহমান লিখেছেন– "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, নূরুল মোমেন, শওকত ওসমান, আনিস চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, সাইদ আহমদ, জিয়া হায়দার প্রমুখের নাটকে সমাজচেতনা রয়েছে, কিন্তু তাদের নাটক প্রকৃত অর্থে ষোল আনা প্রতিবাদী নয়।" [উদ্ধৃত : আমাদের নতুন নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, *বাংলাদেশের সাহিত্যের আলোচনা-পর্যালোচনা ওঅন্যান্য প্রবন্ধ* (প্রণব চৌধুরী সম্পাদিত), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩২৮]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
নাটকে উপস্থাপিত জীবনের স্বরূপবৈশিষ্ট্য

আনিস চৌধুরীর নাট্যভাবনা মূলত আবর্তিত হয়েছে সমকালকে কেন্দ্র করে। বিভাগোত্তর পর্যায়ে পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে যে নবীনসমাজের গোড়াপত্তন হয়েছে, যে ভাঙাগড়াময় জীবনবৃত্তে তিনি বিচরণ করেছেন, সেই জীবন ও সমাজের ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি। নাটকের কাহিনি নির্বাচনে তিনি ইতিহাসের দ্বারস্থ হননি, দূর কিংবা নিকট অতীতকে গ্রহণ করেননি, বরং সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনপরিসরকেই নির্বাচন করেছেন।'মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনই আনিস চৌধুরীর নাট্যসাহিত্যের কেন্দ্রীয় শিল্প উপাদান।'[১] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভে মধ্যবিত্ত সমাজে যে নাগরিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠে– তারই বাস্তব চিত্র রূপায়িত হয়েছে তাঁর নাটকে। মধ্যবিত্ত জনজীবনের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দাহ, হতাশা-বেদনা, নৈরাশ্য-যন্ত্রণার রূপচিত্রাঙ্কনে তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর। গ্রামীণ ভূস্বামী, শাহরিক ব্যবসায়ী, শিক্ষক, পরিশ্রমজীবী নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার রূপায়ণে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। তাঁর নাটকের মজিদ মাস্টার, ইনাম, কবির, আলিম, কলিম, কাইউম, রাশিদা, কিংবা মিনু সকলেরই বিচরণ মধ্যবিত্ত পরিবৃত্তে। দারিদ্র্যের কঠিন নিপীড়ন এবং উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় এরা সকলেই সংগ্রামলিপ্ত। এ সংগ্রামে কেউ বিজয়ী হয়েছে, কেউ জীবনযুদ্ধে পরাজয় বরণ করে তলিয়ে গেছে অতল গহবরে।

একথা সত্য যে, আনিস চৌধুরীর নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের যে রূপায়ণ, তা বাংলাদেশের নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে আকস্মিক বা বিচ্ছিন্নমূল কোনো বিষয় নয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিমণ্ডলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশের রয়েছে সুস্পষ্ট ইতিহাস। এজন্য দৃষ্টি ফেরাতে হয় অনেক পেছনে। ইতিহাসের তথ্যানুযায়ী বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগপর্বের সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর এদেশের সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। এসময় স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে সনাতন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত একটি বিশেষ শ্রেণি আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য ইংরেজদের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে। কখনও

[১] বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), *আনিস চৌধুরী : নাটক সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

কখনও ব্যক্তিস্বার্থের কারণে স্বজাতির কল্যাণের চেয়ে তাদের কাছে বড়ো হয়ে ওঠে বৈদেশিক শক্তি কিংবা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ। এ শ্রেণিকে বলা হয় 'কম্প্রেডর' বা মধ্যস্বত্বভোগী বা মুৎসুদ্দি। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ মুৎসুদ্দি শ্রেণি বসবাস শুরু করে এবং সম্পত্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে এ নব্য মধ্যশ্রেণি জমিদারিতে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করে স্থায়ী অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণে প্রয়াসী হয়। 'কলকাতা শহরের বিত্তবান, প্রতিপত্তিশালী, বিখ্যাত, সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহের পূর্বপুরুষ এক সময় এই লুটেরা মুৎসুদ্দি শ্রেণীরই অন্তর্গত ছিল।'[১] বলাবাহুল্য ধর্মবিচারে এরা ছিল হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সমাজব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে ছিল ইংরেজরা এবং সর্বনিম্নে ছিল কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি। বাঙালি জমিদার, চাকুরিজীবী এবং ব্যবসায়ী-মহাজনরা ছিল এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরে। এরূপ বিবেচনাসূত্রেই এদেরকে মধ্যশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই শ্রেণির ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজ রাজত্ব। নিজেদের সুবিধাবৃদ্ধির লক্ষ্যে এরা সর্বদাই অর্জন করতে চেয়েছে ব্রিটিশ অনুগ্রহ। ইংরেজ শাসকদের আনুকূল্য প্রত্যাশায় কখনও কখনও স্বজাতির ওপর শোষণ-পীড়নেও লিপ্ত থেকেছে এরা। এভাবে প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকেই এতদঞ্চলের মধ্যশ্রেণি ছিল রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত এবং নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত।

ইংরেজদের সান্নিধ্য-অর্জনের এক পর্যায়ে এই হিন্দুমধ্যশ্রেণি পরিচিত হয় ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে। ফলে ধীরে ধীরে তারা নবচেতনা লাভে সচেষ্ট হয় এবং উদ্যোগী হয় সমাজ-সংস্কারে। ইংরেজদের অধীনে থেকেই জমিদারি, চাকরি কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে তারা নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ চরিতার্থ করতে তৎপর হয়। বাঙালির এরূপ নব-জাগরণ বা রেনেসাঁস আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। এতৎসত্ত্বেও একরকম বাধ্য হয়েই তারা এদেশীয়দের জন্য উন্মোচন করে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার। এরপর থেকেই বাঙালি মধ্যশ্রেণি পরিচিতি লাভ করে ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে। 'কাজেই রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক হিসেবে মধ্যশ্রেণীর দায়িত্ব ও গুরুত্ব অপরিসীম। উনিশ শতকীয় বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি

[১] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য*, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৯, পৃ. ৩৭

নবোদ্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনন প্রক্রিয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছিল।'[১] এদের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে 'পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনচেতনায় পরিপুষ্ট'[২] নতুন প্রজন্মের একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ। লক্ষণীয় যে, এই পাশ্চাত্য শিক্ষার নব আলোড়ন বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আকৃষ্ট করলেও 'এক ধরনের অহংবোধ, অভিমান ও ইংরেজের প্রতি অসহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান তা থেকে বিরত থাকে।'[৩] ফলে রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে মুসলমান জনগোষ্ঠী থেকে যায় সুবিধাবঞ্চিত। শাসক ইংরেজদের প্রতি অব্যাহত বিদ্বেষ ও বৈরিতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনবৃত্তে নেমে আসে শোচনীয় দুর্গতি।

মূলত মুসলমানদের চেতনালোকে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে ওয়াহাবি ও ফরায়জি আন্দোলনের কারণে। এদের প্রগতিবিরোধী পশ্চাৎপদ চিন্তাচেতনার অনুবর্তী হয়ে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে যেমন ইংরেজদের সাহচর্য ত্যাগ করে, অন্যদিকে বর্জন করে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা। বিজ্ঞানধর্মী জীবনচেতনার পরিবর্তে তারা সমর্পিত হয় ধর্মান্ধতায়; অতীত গৌরবের প্রতি তারা অকারণে হয়ে পড়ে মোহাচ্ছন্ন। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত ও পশ্চাৎমুখী। প্রকৃতপক্ষে এই বিপন্ন-বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনাঙ্গনে জাগরণের সূত্রপাত ঘটে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) মধ্য দিয়ে। এ বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকা মুখ্য হলেও হিন্দু সৈনিকরাও তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহে মুসলমানদের পরাভব স্পষ্ট হয়ে উঠলেও একথা সত্য যে,'এই বিদ্রোহ জাতির অন্তর্জগতে ইতিবাচক সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।'[৪] '১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে

---

[১] বিষ্ণু বসু, *বাংলা নাট্যরীতি*, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ৩৭

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭, পৃ. ৪

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৪] আবুল কাসেম ফজলুল হক, আধুনিক যুগে বাঙালির চিন্তাধারা : আমূল পরিবর্তনবাদী প্রবণতা, *আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৩, পৃ. ১৬১

মহারানী ভিক্টোরিয়ার উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে সূচিত হলো আর্থ-উৎপাদন কাঠামো ও সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তিত প্রক্রিয়া।'[১] এ সময় বাঙালি মুসলিম চিন্তানায়ক আবদুল লতিফ খান বাহাদুর (১৮২৮-১৮৯৩) এবং সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) মুসলিম সমাজে শিক্ষাবিস্তার এবং তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন সাধনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। এতদুদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় আবদুল লতিফের 'মোহামেডান লিটারেটি সোসাইটি' (১৮৬৬) এবং সৈয়দ আমির আলীর 'মোহামেডান এসোসিয়েসন' (১৮৭৭)। তবে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের বিকাশের ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সহযোহিতা থাকলেও মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণে ইংরেজ প্রশাসনের তদ্রূপ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিদৃষ্ট হয় না। পাশাপাশি 'হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে নবাগত মুসলমান মধ্যবিত্তের স্থান করে দিতে রাজি হয়নি– যার ফলে তাদের পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইতে নাবতে হয়েছিল।'[২] এভাবে দুই সম্প্রদায়ের বিভেদ-বৈষম্য এবং শাসক ইংরেজদের অসহযোগের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের শেষার্ধে যাত্রা শুরু করে মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

১৮৮৫ সালে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হিন্দু মধ্যবিত্তের অগ্রগতি আরেক ধাপ বৃদ্ধি পায়। এ সংগঠনের মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে সাংগঠনিকভাবেও শক্তিশালী হয় তারা। কিন্তু নব্য প্রতিষ্ঠত কংগ্রেসের রাজনীতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি বাঙালি মুসলমান। তারা এর মধ্যে আবিষ্কার করে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ফাঁক ও ফাঁকি। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালে প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু এবং মুসলিম মধ্যবিত্তের বিরোধ চরমে ওঠে। এ-পর্যায়ে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৬৬-১৯১৫) এবং নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯২৯) নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (১৮৪৮-১৯২৫) হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করেন। পাশাপাশি প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০) এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ জড়িয়ে পড়ে বিপ্লবী আন্দোলনে। এ-পর্যায়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের দোহাই দিয়ে গড়ে ওঠে মুসলিম মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ (১৯০৬)। এর ফলে 'কংগ্রেস চিহ্নিত হল হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং মুসলিম লীগ পরিচিত হল মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগঠন হিসেবে। এরপর থেকে লীগের পতাকাতলে ব্যাপক মুসলিম মধ্যবিত্ত

[১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[২] কামরুদ্দীন আহ্মদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের বিকাশ*, ঢকা, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮২, পৃ. ২৯

সমবেত হতে লাগল। মুসলিম লীগ বঙ্গবিভাজন সমর্থন করে এবং ইংরেজ আশ্রয়ে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়।'[১] কিন্তু সারা বাংলাব্যাপী কঠোর গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলিম-সম্প্রদায় আশাহত হয় এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। বিশেষকরে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে স্যার সলিমুল্লাহ মানসিকভাবে তীব্র আঘাত পান এবং এর কিছুদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিচলিত এই শ্রেণিকে তখন নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখান শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)। বাঙালি মুসলমানদের জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অতঃপর ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যাকে কেন্দ্র করে সমকালীন পূর্ববাংলার মুসলিম জনসমাজে তৈরি হয় একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। বলাবাহুল্য এদেশে মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সুদূরপ্রসারী।

১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। এই সংগঠনের মুখপত্র ছিল 'শিখা'(১৯২৭)। তবে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সাহিত্যচিন্তা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না, কিন্তু সমাজচিন্তা ছিল ষোল আনা।'[২] এ সংগঠনের কর্মীবৃন্দ 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ যাতে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করতে পারে বা কথা বলতে পারে তাই চেয়েছিলেন।'[৩] বাঙালি মুসলমান জ্ঞানালোকে আলোকিত হোক, বুদ্ধির আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত হোক এবং মুক্তচিন্তায় উদ্বোধিত হোক– এমনটিই চেয়েছিলেন শিখাগোষ্ঠী। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁরা হলেন– সৈয়দ আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), কাজী আনোয়ারুল কাদির, কাজী ইমদাদুল হক, কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) প্রমুখ। ঐতিহ্য-অন্ধ, মধ্যযুগীয় জীবনধারায় অভ্যস্ত, মোহভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়কে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত করে তোলাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তাঁরা মূলত ধর্মপ্রচারকদের অনুরূপ উদ্দীপনা, সাহস এবং বিশ্বাস নিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রমে ছিলেন সচেষ্ট। 'নিছক

---

[১] মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৯, পৃ.৬

[২] আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৬৩

[৩] কামরুদ্দীন আহ্মদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

যুক্তিবাদী আন্দোলন হলেও এর নেতারা ঢাকার নবাবের নির্দেশে পরিচালিত মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিগ্রহের হাত থেকে রেহাই পেলেন না।'[১] তৎসত্ত্বেও 'একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজ সেইদিনে মুসলমানদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, এবং তার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে যারা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের সাহিত্যিক অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।'[২] এঁরাই মুসলিম সমাজকে আলোর-পথের দিশা দিয়েছেন, জ্ঞান-বুদ্ধির আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং বিবেকবুদ্ধির অনুশীলনের পথ তৈরি করে দিয়েছেন। এঁদের আন্দোলনের অব্যবহিত ফল হচ্ছে পূর্ববঙ্গীয় ভূখণ্ডে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদী-চেতনার লক্ষণীয় প্রসার ঘটে। 'মার্কসীয় চিন্তাচেতনা ও রুশবিপ্লবের প্রেরণা তৎকালীন বাঙালি তরুণদের একাংশের মনেও সঞ্চারিত হয়।... দেশের কৃষক জনতার মধ্যেও তখন জমিদার-বিরোধী মনোভাব ব্যাপকতর ও তীব্রতর হয় এবং মধ্যশ্রেণীর কোন কোন দল কৃষকদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে এগিয়ে যায়।'[৩] বৃহৎ-বঙ্গের কলকাতায় কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনে মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) এবং কমরেড মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনা আলোড়িত করে পূর্ববাংলার সাধারণ জনতাকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলেও গড়ে ওঠে একটি মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনায় আস্থাশীল একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কম্যুনিস্ট পার্টির পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগঠন হিসেবে ১৯২৯ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি।' ১৯৩৬ সালে এ.কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমিতির এক অধিবেশনে সংগঠনটির নামকরণ করা হয়– 'নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজাপার্টি।' পরবর্তীসময়ে জমিদার শ্রেণি এ-সংগঠন ক্রমাগত ত্যাগ করলেও 'কৃষক শ্রেণির ব্যাপক সমর্থন ছাড়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়– এই উপলব্ধি থেকে ফজলুল হক

[১] কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ (সংশোধিত) : ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭-২৮

[২] আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

[৩] আবুল কাসেম ফজলুর হক, *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

মুসলিম মধ্যবিত্ত অপেক্ষা কৃষকদের উপর বেশি নির্ভর করেন।'[১]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফলে ১৯৩৭ সালে ঘোষিত হয় সাধারণ নির্বাচন। এ-নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত হবার প্রয়াস পায়। 'তখনই *দৈনিক আজাদ* বের হয়, নজরুল ইসলাম, কবি জসিমুদ্দীন, গায়ক আব্বাস উদ্দিন এদের সাফল্যে মুসলমানরা গৌরবান্বিত বোধ করতে থাকে।'[২] কিন্তু মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে ফজলুল হকের 'কৃষক-প্রজা পার্টি' স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করে। এ নির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। ফলত গঠিত হয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। এসময়ে ঋণসালিশি বোর্ড স্থাপন, মহাজনি আইন ও বিভিন্নরকম প্রজাস্বত্ব আইন তৈরি হওয়ায় এবং বিশেষকরে শিক্ষিত মুসলমানদের চাকরিপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের অভাবনীয় অগ্রযাত্রা সাধিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র আলোড়ন তৈরি করে। 'ভারতের ভাইসরয়ও ঘোষণা করলেন এ যুদ্ধে যোগ দেবার কথা। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল যে, যেহেতু ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ না করে ভারত সরকারকে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে সুতরাং কংগ্রেস প্রতিবাদে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহের মন্ত্রীসভাগুলোকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ সাহেব নাজাত দিবস ঘোষণা করলেন।'[৩] অন্যদিকে যুদ্ধকালে সৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), এ.কে. ফজলুল হকের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) এবং গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন (১৯৪২) ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে করে বিচলিত। প্রতিফলে 'উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-সামন্তবাদী প্রভুদের স্বার্থের অনুকূলে বিভক্ত হলো ভারত : বাংলাভাষী ভূখণ্ড বিভক্ত হলো এবং জন্ম নিলো ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান।'[৪] এই বিভক্তির মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলাকে কেন্দ্র করে শুরু হলো নতুন কর্মযজ্ঞ; স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকাঠামোকে অবলম্বন করে জীবনের ভিন্নতর উদ্বোধন।

---

[১] চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ১৪

[২] কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

[৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে ভারত-বিভক্তির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সমবায়ে গড়ে ওঠে ঢাকাকেন্দ্রিক একটি শিক্ষিত ও সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। নতুন জীবনরসের সন্ধানে গ্রামীণ পরিসর থেকেও বিপুল মানুষের আগমন ঘটে নতুন গড়ে-ওঠা এ-নগরজীবনে। এর ফলে ঢাকায় নির্মিত হয় একটি নতুন সমাজ; যার নিম্নপর্যায়ে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণি এবং মধ্যপর্যায়ে শিক্ষক, কারিগর, প্রকৌশলী এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। ক্রমশ নগরজীবনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে পরিবর্তনের আভাস। 'গ্রামজীবন এবং পুরোনো আচরণ ও পোষাক-পরিচ্ছদ অনেকে ছাড়লেও পুরানো রুচি ও মানসিকতা পাকিস্তানী আমলের শেষভাগ পর্যন্ত অনেকেরই মজ্জাগত। অনেকের মধ্যে আবার আধুনিকতার নামে বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণ-প্রবণতা ফ্যাসানে পর্যবসিত। যা কিছু দেশী বা পুরোনো নয়, তাকে আঁকড়ে ধরতে কেউ বা উদ্বাহু। নতুন সুস্থ সবল মূল্যবোধ ও জীবনদৃষ্টি আয়ত্তে অনেকেই ব্যর্থ, কেউ বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পুরোনো অভ্যস্ত জীবনাচরণেই ফিরে যায়। কেউ শূন্যতা ও হাহাকার বোধে হয় দ্বন্দ্ববিক্ষত। নতুন সুস্থ জীবনচেতনা ও মূল্যবোধ এদেরকে আশ্রয় দিতে পারে না অথবা এরা তা গ্রহণে ব্যর্থ। এ-ই আমাদের পরিবর্তমান গ্রামবাসী এবং সৃজ্যমান নাগরিক মধ্যবিত্ত-মানসের বাস্তবতা। আর এসবের জন্য প্রধানত দায়ী আমাদের অতীতের পরাধীন ও ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভিত্তি তথা অসমতা-বৈষম্য-পীড়িত ও অস্বাভাবিক সমাজ-বিকাশের বাস্তবতা।'[১]

একথা সত্য যে, প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সুসংগঠিত ছিল না। 'পাকিস্তানী বৃহৎ বেনিয়া পুঁজি অতিদ্রুত নিয়ন্ত্রণ করলো পূর্ববাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা এবং উৎপাদনযন্ত্র। এবং এ-কার্যে ধর্ম ঐক্যের নামে শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে, তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করলো– এদেশীয় সামন্তশ্রেণী ও সামন্তমূল্যবোধ-লালিত মধ্যবিত্তশ্রেণী।'[২] এ পুঁজিবাদী শক্তি-আশ্রিত মধ্যবিত্তের বিপরীতে এসময় বাংলাদেশে বিকশিত হয় মার্কসীয় চেতনাসমৃদ্ধ একটি প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি; যারা 'তথাকথিত মোল্লা ও পীর, দুর্নীতিপরায়ণ, ষড়যন্ত্রকারী, বক্তৃতাবাগীশ রাজনীতিক আর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ শোষণকারীদের চিরাচরিত

[১] মুহম্মদ ইদরিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ৩৪-৩৫

[২] সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ', *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১

প্রভাব নষ্ট করে দিয়ে গড়তে চায় এক আধুনিক সমাজ।'[১] ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষাবিষয়ক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ঢাকা শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত শ্রেণির এই প্রতিবাদ খুব বলিষ্ঠ না হলেও এর মধ্য দিয়েই সূত্রপাত হয় মধ্যবিত্তের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস। পরবর্তীকালে এ আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে ১৯৫২ সালে। ভাষার প্রশ্নে এসময় পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে। এভাবে ১৯৫২ সালের ভাষাসংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয় পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির দুরভিসন্ধি, এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তশ্রেণি হয়ে ওঠে অধিকার-সচেতন। 'মূলত ভাষা আন্দোলন বাঙালি মধ্যবিত্ত ও অশক্ত পুঁজিবাদী শ্রেণি কর্তৃক পাকিস্তানি শাসকচক্রের শৃঙ্খলামুক্তি-আকাঙ্ক্ষার রক্তিম প্রতীক।'[২] এ আন্দোলনের প্রভাবে বাঙালি ধাবিত হয় সাংস্কৃতিক-বিপ্লবের পথে। কবিতা-সংগীত-নাটক হয়ে ওঠে তাদের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের বাহন। বাঙালি মধ্যবিত্তের এ সংগ্রামী-চেতনা নাট্যরূপ পেয়েছে মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) *কবর* (১৯৫৩) এবং আসকার ইবনে শাইখের (১৯২৫-২০০৯) *দুর্যোগ* (১৯৫৪) একাঙ্কিকায়।

ভারত-বিভাগের অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনেতিক পরিপ্রেক্ষিত হয়ে ওঠে সংকটাপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কারণে ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে শুরু হয় তীব্র খাদ্যসংকট। কিন্তু ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ না করে বরং উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলোতে 'কর্ডন প্রথা'র প্রবর্তন করা হয়। পরিণামে ১৯৫১ সালে দুর্ভিক্ষ চরমে ওঠে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী এবং খাজনার নিপীড়ন– এতদঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে করে তোলে দুর্বিষহ। তৎসঙ্গে বস্ত্র, কেরোসিন, ভোজ্যতেল প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি এবং দুষ্প্রাপ্যতা মধ্যবিত্তের চেতনালোকে নানামুখী প্রশ্নের জন্ম দেয়। ক্রমেই তারা মুসলিম লীগ সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ এবং কৃষক-প্রজা প্রর্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হন এ সংগঠনের সভাপতি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি মধ্যবিত্তের সমর্থনপুষ্ট যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে এবং মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু দু-মাসের মধ্যেই গভর্নরের শাসন জারি করে পতন ঘটানো হয় নব্য

[১] কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ইনসাইড লাইব্রেরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[২] সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ', *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রিসভার। শুধু তাই নয়, গৃহবন্দি করা হয় ফজলুল হককে এবং অসুস্থ অবস্থায় দেশ ছেড়ে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে চলে যেতে হয় সুইজারল্যান্ডে।

৫৪-এর নির্বাচনের পরই যুক্তফ্রন্টের সর্বাধিক শক্তিশালী অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আওয়ামী লীগ। এসময় নানা বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে এতদঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বায়ত্তশাসন-প্রত্যাশী হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৫৬ সালে রচিত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্টভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করলেও স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত থেকে যায়। পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি পুনরায় স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি উত্থাপন করেন এবং এর মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার নবজাগ্রত সচেতন মধ্যশ্রেণি নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে সংঘবদ্ধ হতে থাকে এবং সংগ্রাম ও আন্দোলনকেই অধিকার আদায়ের মাধ্যমরূপে বিবেচনা করে। পঞ্চাশের দশকে রচিত নাটকে তাই লক্ষ করা যায় মধ্যবিত্তের প্রতিবাদের চিত্র। আসকার ইবনে শাইখের নাটকে এরূপ প্রতিবাদের সুর সুস্পষ্ট। তাঁর *আওয়াজ* (১৯৫৩) নাটকে উচ্চারিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট মজুতদার এবং কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনতার ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর। অন্যদিকে *যাত্রী* নাটক শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। শাইখের *দুরন্ত ঢেউ* (১৯৫৩) নাটকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তের অব্যাহত সংগ্রামের চিত্র।

১৯৫৮ সাল থেকে শুরু হয় মধ্যবিত্ত-নিপীড়নের চূড়ান্ত পর্ব। এসময় আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয় মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা। শুধু রাজনীতি নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায়ও পাকিস্তানি সামরিক সরকার প্রয়োগ করে কূটকৌশল ও নিগ্রহনীতি। আদমজি পুরস্কার (১৯৬০), দাউদ পুরস্কারসহ (১৯৬৩) অন্যান্য পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে তারা বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের শৃঙ্খলিত ও অনুগত করবার অপপ্রয়াস চালায়। পাশাপাশি সভা-মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর তারা আরোপ করে সেন্সরশিপ। সামরিক সরকারের সহায়তায় পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পপুঁজি দ্রুত বিকশিত হলেও বাঙালিরা ছিল সম্পদবঞ্চিত। পূর্ববাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানে কলকারখানা গড়ে ওঠে, এবং সেসব কারখানায় সেখানকার যুবকশ্রেণি কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। তদুপরি করাচি, ইসলামাবাদ প্রভৃতি শহরে 'বিদেশী দূতাবাসগুলি নিজেদের কর্মচারীদের বাসস্থান এবং দপ্তরের জন্য বাড়ী ভাড়া নিল

এবং ঐসব দফতরে চাকুরী দিল তাদেরই ভাই-বেরাদারদের অনেককে। ... যে সব সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য মধ্যবিত্ত সমাজ হিন্দু আর শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল পাকিস্তান অর্জনের পর তারা তাই পেয়েছে। তাই স্বাধীনতার স্বাদ তারা উপভোগ করেছে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে।'[১] পক্ষান্তরে পূর্ববাংলায় সৃষ্টি হয়েছে ভয়ানক বেকার-সংকট। আইয়ুব সরকারের আমলে 'সদা বর্ধমান বেকার সমস্যা, শিক্ষালাভের সুযোগের অভাব, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে পূর্ববাংলার উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা, এখানকার লোকদের বেপরোয়া[২] করে তোলে। রাষ্ট্রীয় পরিসরে দুর্নীতি, কুশাসন এবং বেতনস্বল্পতা শহরবাসী শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। মধ্যবিত্ত সরকারি কর্মচারীদের অবস্থা হয়ে ওঠে আরও শোচনীয়। কেননা মুদ্রাস্ফীতির জন্য তারাই সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। সেচের অভাবে কৃষিব্যবস্থাও দাঁড়ায় হুমকির মুখে। কৃষকদের গভীর নলকূপ-স্থাপনের দাবি অগ্রাহ্য করে সামারিক সরকার তখন পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রকৌশলিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করতে তৎপর হয়। নিরুপায় হয়ে ভূমিনির্ভর জনশ্রেণির একটি বৃহৎ অংশ জীবিকার সন্ধানে নগরমুখী হয়। কিন্তু নগরজীবনেও নতুন শ্রম-সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার পথে নিপতিত হয় তারা।

আইউব খানের স্বৈরাচারী স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে বিভাগোত্তরকালের অপরিণত ও দ্বিধাবিচলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমান্বয়ে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। তাদের মধ্যে উপ্ত হতে থাকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বীজ। বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্যের বিবিধ রূপকল্পে বাঙালির এ সংগ্রামী অবয়ব ধীরে-সুস্থে প্রতিবিম্বিত হতে শুরু করে। উপন্যাস এবং ছোটগল্পে যেমন, ঠিক তেমনি নাটকেও অঙ্কিত হতে থাকে বাঙালি মধ্যবিত্তের এ সংগ্রামের পরিচয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* কিংবা শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি*র মতো উপন্যাসই শুধু নয়, এ-পর্যায়ে এমনকিছু রূপক কিংবা প্রতীকধর্মী নাটক রচিত হয়েছে, যেগুলোতে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার মেধাবী পরিস্ফুটন ঘটেছে। সামরিক সরকার আইয়ুব খানের শাসনামলে যখন বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গন ছিল অবরুদ্ধ, ঠিক তখন সিকান্দার আবু জাফর প্রতীকী পরিচর্যায় প্রকাশ করেছেন স্বৈরাচারী প্রশাসনের অত্যাচার-নির্যাতনের চিত্র। সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানি অপশক্তি কীভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের যাপিত জীবন-পরিসরের সুশ্রী-সুন্দর ও শোভন পরিমণ্ডলকে বিপর্যস্ত করেছে, তা নাট্যকার প্রতীকী পরমার্থে

[১] কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ইনসাইড লাইব্রেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-২০৩

উৎকীর্ণ করেছেন তাঁর *মাকড়সা* (১৯৫৯) একাঙ্কিকায়। নাট্যকার আলাউদ্দিন আল আজাদের রূপক নাটক *মরক্কোর যাদুঘরেও* (১৯৫৯) উপস্থাপিত হয়েছে আইয়ুব সরকারের সামরিক শাসনের বিভীষিকাময় পরিবেশ। নাট্যকার সাঈদ আহমদের *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯) নাটকে রূপকের অন্তরালে 'অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এবং একই সঙ্গে সেই শোষণ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।'[১] ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহ এবং তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে এদেশের মুক্তিপ্রিয় মধ্যবিত্তের সংগ্রাম একাকার হয়ে গেছে আসকার ইবনে শাইখের *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫) নাটকে।

নতুন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি ১৯৬১ সালে শাসকগোষ্ঠীর নানা ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে সফলভাবে উদ্‌যাপন করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জন্ম-শতবার্ষিক। ১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং হামুদুর রহমানের বৈরী শিক্ষা কমিশন বাতিলের দাবিতে সচেতন ছাত্র-জনতা নেমে আসে রাজপথে এবং শুরু হয় তীব্র আন্দোলন। সংগামশীল বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করতে এসময় শাসকচক্র আশ্রয় নেয় নানা কূটকৌশলের। ১৯৬৪ সালে মুসলিম লীগের 'কাশ্মীর দিবস' ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিতে তৎপর হয় তারা। কিন্তু দাঙ্গার ভয়াবহতার মধ্যে পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করে এবং শাসকগোষ্ঠীর অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। 'এর ফলে আত্মশক্তি ও সংঘশক্তির প্রতি বাঙালির আস্থাও দৃঢ়তর হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্ভবনা বৃদ্ধি পায় বহু গুণে।'[২]

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে All Pakistan National conference- এ শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয়-দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ছিল ছয়-দফার মূল বক্তব্য। বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং ছাত্রজনতা ছয়-দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নতুন চেতনায় উজ্জীবিত হয়। এ পরিস্থিতিতে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানের জনপ্রিয়তায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামক মিথ্যা মামলায়

---

[১] মোঃ জাকিরুল হক, দুই *বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৭, পৃ. ৫৫

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪

অভিযুক্ত করে। তদুপরি সরকার পূর্ববাংলার জনপ্রিয় *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকা বন্ধ করে দেয় এবং ভারত থেকে গ্রন্থ আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে; পাশাপাশি বেতার-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের ক্ষেত্রে আরোপ করে বিধিনিষেধ। সরকারের রবীন্দ্র-বিরোধিতায় 'পূর্ববাংলার সংস্কৃতি অঙ্গন হয়ে ওঠে উত্তপ্ত'[১]; যার আঁচ রাজনৈতিক অঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। বলাবাহুল্য 'এভাবেই রবীন্দ্রনাথ বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতীক-পুরুষে পরিণত হন।'[২]

ছয়-দফা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে বাঙালি যখন সংগ্রামে-সংক্ষোভে ঐক্যবদ্ধ, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ ঘোষণা করে তাদের এগারো দফা কর্মসূচি। ছয়-দফা এবং এগারো-দফার মিলিত কর্মসূচি সমগ্র বাংলাকে উত্তাল করে তোলে। ১৭ জানুয়ারি সংগ্রামী ছাত্রসমাজ পালন করে 'দাবি দিবস' এবং এদিন তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অগ্রসর হলে পুলিশ লাঠিচার্জ এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ২০ জানুয়ারি ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষকালে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ছাত্রনেতা আসাদ। ১৫ ফেব্রুয়ারি হত্যা করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সামসুজ্জোহা। এ সংবাদ প্রচারিত হলে সান্ধ্য আইন অগ্রাহ্য করে সাধারণ জনতা নেমে পড়ে রাজপথে এবং এ আন্দোলন পরিণত হয় গণ অভ্যুত্থানে। উত্তাল গণ-আন্দোলনে সন্ত্রস্ত সরকার অতঃপর প্রত্যাহার করে নেয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং মুক্তি প্রদান করে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দিকে।

১৯৬৯ সালের ২৪শে মার্চ আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এরফলে নিপীড়িত বাঙালি এক সামরিক শাসন থেকে আরেক সামরিক শাসনের অধীনে শৃঙ্খলিত হয়। জনরোষের মুখে ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের অঙ্গীকার পালনে সক্রিয় হয়। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলে এক প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারায় প্রায় দশ লক্ষ মানুষ। কিন্তু বিপন্ন মানুষের প্রতি সরকারের অবহেলা জনমানসকে করে তোলে আরও বিক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালে (৭ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ

[১] মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদের ৩১৩ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ অর্জন করে ১৬৭টি আসন। কিন্তু ৮৮টি আসন লাভকারী পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্রের কারণে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নেয় কূটকৌশলী ও ষড়যন্ত্রপ্রিয় পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন।

১৯৭০ এর গণতান্ত্রিক বিজয় এদেশের প্রগতিশীল মধ্যবিত্তকে প্রথমে উল্লসিত করলেও শাসকগোষ্ঠীর এরূপ হীন ষড়যন্ত্র তাদের স্বপ্নকে করে চূর্ণ-বিচূর্ণ। সামরিক সরকারের ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন বাঙালির মুক্তির বাণী– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'[১] বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। অবশেষে কুচক্রী পাকিস্তানি সরকার ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কাল রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে এক ভয়াবহ গণহত্যা শুরু করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এসময় নির্বিচারে গুলি চালায় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর, ঐ রাতেই গ্রেপ্তার হন ৭০-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত হামলায় অসহায় নগরবাসী নিরাপত্তার সন্ধানে শহর থেকে পাড়ি জমায় গ্রামে, পাশাপাশি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেয় লক্ষ লক্ষ শরণার্থী। এরই সমান্তরালে পাকিস্তানের বর্বরোচিত হামলা প্রতিহত করতে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিকসহ সকলের অংশগ্রহণের ফলে বাঙালি সফল প্রতিরোধে সক্ষম হয়। তবে 'শিক্ষিত তরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশাবাদী, বাস্তবতা-উৎসারিত, সংগ্রামশীল ও প্রতিবাদী চেতনাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের মৌল প্রেরণাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। আত্মমুখী ও স্বার্থান্ধ মধ্যবিত্তের বর্ণচোরা ভূখণ্ডকে এরা রক্ত ও সংগ্রামের স্পর্শে বিচূর্ণ করে দিয়েছে।'[২] অবশেষে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবনদান, দুলক্ষ

---

[১] '৭ই মার্চ ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ঐ ঐতিহাসিক ঘোষণা বস্তুত বাঙলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণ বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করেছে স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রামে, বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাতৃভূমির শৃংখল মোচনে প্রাণ দিয়েছে অগণিত মুক্তি সংগ্রামী। (দ্রষ্টব্য : রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮১, পৃ. ১৫৫)

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

নারীলক্ষ্মীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি বিজয়ী হয়, অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু প্রত্যাবর্তন করেন তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমি সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে। অতঃপর তাঁরই নির্দেশনায় পরিচালিত হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজ। যুদ্ধের এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য নেতৃত্বের কারণে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর আশঙ্কা থেকে রক্ষা পায় বাংলাদেশ। এই পর্যায়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। ১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিরতা বাংলদেশেও আঘাত হানে। পরিণামে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা এদেশবাসীকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এ সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মধ্যবিত্তের একটি অংশ আশ্রয় নেয় ঘুষ এবং দুর্নীতির। স্বার্থলোভী এ শ্রেণির বিপরীতে চেতনাসমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত আয়-ব্যয়ের তারতম্যে নিক্ষিপ্ত হয় নৈরাশ্যপীড়িত জীবনবিন্দুতে। 'সদ্য-স্বাধীন একটি দেশ পরিচালনার জন্য যে-ধরনের সৎ-শিক্ষিত ও ত্যাগী কর্মী-বাহিনীর প্রয়োজন তা' স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ছিলো অকল্পনীয়। প্রশাসনের উচ্চস্তরে তাঁরাই বহাল থাকেন যাঁরা ইতঃপূর্বে ছিলেন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দোসর। শেখ মুজিব তাই পদে পদে প্রতারিত হন। তাঁর চতুর্দিক বেষ্টন করে থাকে চাটুকারের দল। গ্রিক ট্রাজেডির নায়কের মতো শেখ মুজিব ছাপ-ছাপ অন্ধকার সরিয়ে সন্ধান করেন আলোর ঠিকানা। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ-বিনির্মাণের প্রয়োজনে তিনি চান সোনার মানুষ; আছে মেরুদণ্ডহীন, নপুংসক অথচ পরছিদ্রান্বেষী অসংখ্য মানুষ।'[১] 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের বিপর্যস্ত অবস্থা, নৈরাজ্য, অন্তর্কলহ, হিংসার অবাধ বিচরণ, নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং এর ফলে সমাজমানসে হতাশা ও বিভ্রান্তি'[২] ধরা পড়েছে সেলিম আল দীনের *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৩) নাটকে। সমকালীন অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজের শিকার এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত আদর্শবাদী স্কুলশিক্ষকের জীবনবেদনার নাট্যরূপ আবদুল্লাহ আল মামুনের *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪) নাটক। কালোবাজারী এবং মজুতদারদের দৌরাত্ম্যে চাল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে অতিষ্ঠ মধ্যবিত্ত

[১] মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, 'সরদার জয়েনউদদীনের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা, *সাহিত্য পত্রিকা*, একত্রিংশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৩৯৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৮৫

[২] মোঃ জাকিরুল হক, দুই *বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

জনমানুষের দুর্গতির চিত্র উন্মোচিত হয়েছে একই নাট্যকারের *এখন দুঃসময়* (১৯৭৪) নাটকে।

চলমান অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয় একাত্তরের পরাজিত শক্তির অপতৎপরতা এবং আর্ন্তজাতিক ষড়যন্ত্র। এদিকে নব্যরাষ্ট্রের প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব এবং ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীন কোন্দলের কারণে হুমকির মুখে পড়ে সংসদীয় গণতন্ত্র। ফলত ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠত হয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান অধিষ্ঠিত হন রাষ্ট্রপতি পদে। ১৯৭৫ সালের ৬ জুন 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু 'এক দলীয় শাসন প্রবর্তন, শেখ মুজিবের একক ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। সামরিক বাহিনীর ক্ষোভের অন্য কারণ হিসেবে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়-সংকোচনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'[১] তৎসঙ্গে সমাজতন্ত্রকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করায় এবং সোভিয়েত-সমর্থিত হবার কারণে বঙ্গবন্ধুর ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এসকল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কিছু দিকভ্রষ্ট এবং বিপথগামী সেনাকর্মকর্তার অভ্যুত্থানে সপরিবারে শহিদ হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের পর দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আবির্ভূত হন ষড়যন্ত্রের অন্যতম কুশীলব বিশ্বাসঘাতক খোন্দকার মোশতাক আহমদ। কিন্তু তাঁর শাসনকাল ছিল ক্ষণস্থায়ী। কৌশলে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণে নেন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান; এবং ১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন তিনি। 'রাজনীতির ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ-আশ্রয়ী জনমানসে অত্যন্ত আশার সঞ্চার করে। কেননা, তিনিও ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা।'[২] কিন্তু ক্ষমতা-দখলের পর তিনি অধ্যাদেশ জারি করে সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে বর্জন করেন : সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা; বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। পাশাপাশি ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন তিনি। এভাবে তাঁর শাসনামলে ক্রমেই পুনর্বাসিত হতে শুরু করে

[১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়ে বিস্তৃত হতে থাকে বাঙালির হতাশার পরিধি।

১৯৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের এই হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠেছে সৈয়দ শামসুল হকের *গণনায়কে* (১৯৭৬)। অন্যদিকে দুদর্শাগ্রস্ত শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র এবং তৎকালীন সমাজে বেকারসমস্যার বিরূপ প্রভাব প্রকাশিত হয়েছে আবদুল্লাহ আল মামুনের *চারিদিকে যুদ্ধ* (১৯৭৬) নাটকে। এসময়কালে ক্ষমতাকাঠামোয় উপর্যুপরি পরিবর্তনের বিষয়টিও ইঙ্গিতবহ হয়েছে আবদুল্লাহ আল মামুনের *সেনাপতি* (১৯৭৯) নাটকে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের 'সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে এ নাটকে।'[১] সামরিক শাসকের অনুকূলে পুনর্বাসিত একাত্তরের পরাজিত শক্তির উত্থানের বিবরণ এবং তাদের সক্রিয় হওয়ার কথা উঠে এসেছে সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬) এবং এস এম সোলায়মানের *খানদানি কিসসায়* (১৯৮০)।

১৯৮১ সালের ৩০ মে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তাঁর মৃত্যুর পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে তিনিও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক আইন ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করেন তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। অল্পকালের মধ্যে তিনিও সক্রিয় হন রাজনীতিতে এবং এক্ষেত্রে তিনি মূলত জিয়াউর রহমানের পদাঙ্কই অনুসরণ করেন। তবে সেনা সমর্থন অর্জন করলেও এরশাদ জনসমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হন। কিন্তু সে সময়ে বিরোধী দলগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক-বিরোধ তার শাসনকালকে দীর্ঘায়িত করে তোলে। এরূপ অস্থির পরিস্থিতিতে দেশের অর্থসম্পদ আত্মসাতে উদ্যোগী হয় এরশাদ-প্রশাসন। দেশের অর্থনীতেতে কালো টাকার প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করে এবং 'কালো টাকার প্যাহাড় গড়তে গিয়ে স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষ হয়েছে নিঃস্ব আর মধ্যবিত্ত হয়েছে সংকটবিদ্ধ, ক্ষতবিক্ষত।'[২]

স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক শাসক এরশাদের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তের সীমাহীন ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের *সাতঘাটের কানাকড়ি* (১৯৮৯) নাটকে।

---

[১] রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত), *নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল মামুন*, নালন্দা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৬

[২] মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, পৃ. ১৫৬

মঞ্চনাটকের পাশাপাশি এরশাদ সরকারের দুঃশাসনের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে বিভিন্ন পথনাটকেও। 'একজন রাষ্ট্রপ্রধানের অতিব্যক্তিগত প্রয়োজন, ইচ্ছা ও স্বেচ্ছা, খেয়াল ও খামখেয়ালের কাছে রাষ্ট্র প্রশাসন, জনপ্রশাসন, গণমাধ্যমসহ সেবা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের সময়-শ্রম-সম্পদ কতোটা শোচনীয়, অসহায়ভাবে অপচিত তার বিদ্রূপাত্মক প্রতিবেদন'[১] নাট্যকার মামুনুর রশীদের নাটক *নীলা* (১৯৮৩)। স্বৈরশাসকের হিংস্র শাসনব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে মাসুম রেজার *কাকলাস* (১৯৮৫) নাটকেও। আত্ম-স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য এরশাদ সরকার বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে ভারতের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে নিয়ে আসে। মান্নান হীরার *ইঁদারা* নাটকটি এ দাঙ্গারই শিল্পিত ভাষ্য।

বিভাগোত্তর কাল থেকে আশির দশকের শেষপর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পরিমণ্ডলে বাংলা নাট্যসাহিত্যে আনিস চৌধুরীর বিচরণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে বেড়ে-ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনবৃত্তে বসবাস করে এই শ্রেণিপরিসরে বিদ্যমান বিবিধ অর্জন ও অসঙ্গতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং সেই জীবনসত্য রূপায়ণে তিনি শেষাবধি যত্নবান ছিলেন। তাঁর নাটকে তাই চিরচেনা মধ্যবিত্তশ্রেণির আমূল উপস্থিতি। তাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, অর্জন-বিসর্জন, সংগ্রাম-আপস, জয়-পরাজয়ের বিশ্বস্ত রূপকার তিনি। এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য। বিভাগোত্তর কালপর্বে রচিত *মানচিত্র* (১৯৬৩), *এ্যালবাম* (১৯৬৫), *প্রত্যাশা* (১৯৬৭), *ছায়া-হরিণ* (১৯৬৮), *যখন সুরভী* (১৯৬৯) প্রভৃতি নাটকে যেমন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত*যেখানে সূর্য (১৯৭৪), চেহারা* (১৯৭৯), *তবু অনন্য,নীল-কমল* (১৯৮৬), *তারা ঝরার দিন, বলাকা অনেক দূরে, রজনী* প্রভৃতি নাটকে তিনি মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতাকেই নাট্যরূপ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথার্থই নির্মোহ ও আন্তরিক। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে অপর কোনো নাট্যকার মধ্যবিত্তের জীবনচর্যা অবলম্বনে এতবেশি নাটক রচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

[১] সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভাগোত্তরকালের নাটক

আনিস চৌধুরী প্রধানত নাটক রচনা শুরু করেন বিভাগোত্তরকালেই। এ সময়ে রচিত তাঁর নাটকগুলো হলো : *মানচিত্র* (১৯৬৩), *এ্যালবাম* (১৯৬৫), *প্রত্যাশা* (১৯৬৭), *ছায়া-হরিণ* (১৯৬৮) এবং *যখন সুরভী* (১৯৬৯)। এসকল নাটকের বিষয়বস্তু মূলত গ্রামীণ এবং শাহরিক মধ্যবিত্তের জীবনাচার। সেই সঙ্গে সামাজিক বিবর্তন এবং এ পরির্তনের ফলে মধ্যবিত্তের সীমাহীন অসহায়ত্ব এবং এ থেকে উত্তরণে তাদের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামও ছিল আনিস চৌধুরীর অন্বিষ্ট। আয়তনে তুলনামূলক দীর্ঘ এসব নাটক একদিকে যেমন গভীর জীবনবোধসম্পন্ন, অন্যদিকে শিল্পমানের দিক থেকেও সফল। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আনিস চৌধুরীর জনপ্রিয়তা এ পর্যায়ের নাটকগুলোকে কেন্দ্র করেই। বিভাগোত্তরকালে যখন পূর্ববাংলায় স্বতন্ত্র ধারার যুগোপযোগী নাটক নির্মাণের প্রয়োজন হয়, ঠিক তখনই বাংলা নাটকে আনিস চৌধুরীর আবির্ভাব। তিনি যে তৎকালীন নাট্যকর্মীদের প্রাণের স্পন্দন বহুলাংশেই অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা প্রতীয়মান হয় নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের একটি বক্তব্যে–

> এরকম একটি সময়ে প্রধানত সংস্কৃতি পরিষদের নাট্যসচেতন কর্মীদের নিয়ে ড্রামা সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা যারা প্রথম দিকের সদস্য ছিলাম– আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল এদেশের জীবন ও মানুষকে নিয়ে লেখা এদেশের নাট্যকারের জীবনসম্পৃক্ত নাটক করবো। আমরা সৎ, প্রগতিশীল, অন্ধত্বমোচনকারী অনুশীলন ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ নাটক চাই। আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র* পাওয়া গেল। আমাদের সর্ব আকাঙ্ক্ষা পরিবহনকারী যদিও নয়– তবুও আমাদের ভালো লেগেছে।[১]

[১] মমতাজউদদীন আহমদ, বাংলাদেশের নাটক : ১৯৭৪, [উদ্ধৃত:মোবারক হোসেন (সংকলিত ও সম্পাদিত), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ(১৯৬৩-১৯৭৬)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৫, পৃ. ২০৪]

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র

মানচিত্র [১] (১৯৬৩) আনিস চৌধুরীর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ নাটক। সমকালীন জীবনের একটি জনপ্রিয় সামাজিক নাটক এটি। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যপর্যায়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন-পরিসরে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এক শিক্ষক-পরিবারের দ্বন্দ্ব-সংকটের করুণ কাহিনি বিবৃত হয়েছে এ নাটকে। এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ভারত-বিভাগের পরবর্তীকালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সাধারণ মধ্যবিত্ত জনশ্রেণির স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি। একথা সত্য যে, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও এদেশের জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব হয়নি। সমাজের মুষ্টিমেয় বিত্তবান লোক ছাড়া বাকি সবাই মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করছে। আনিস চৌধুরী *মানচিত্র* নাটকে তুলে ধরেছেন অর্থনৈতিক সমস্যা সংবিত তেমনি এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনালেখ্য।'[২]

মানচিত্র নাটকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যতম প্রতিনিধি মজিদ একজন স্কুল শিক্ষক। আনন্দপুর মডার্ন হাই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক তিনি। এক সময় তিনি শিক্ষকতা করতেন আনন্দময়ী স্কুলে। স্কুল থেকে প্রাপ্ত সামান্য বেতনের মাধ্যমে তাঁকে প্রতিপালন করতে হয় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার। ফলে তাঁর সংসারে বিরাজ করে নিত্য অভাব অনটন। এতৎসত্ত্বেও মজিদ ছিলেন যথেষ্ট আমোদী স্বভাবের। প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যেও তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রসন্ন-চিত্ত এবং সঙ্গপ্রিয়। স্ত্রী মরিয়মের সংলাপে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ মাত্রা–

> সারাদিন তো স্কুলের ফিকির, কী জানি, হবে কোথাও। না তাস পিটতে গেল কে জানে। ইয়ার বন্ধু

---

[১] ১৯৫৬ সালের ৮ এপ্রিল ইস্ট বেঙ্গল কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে করাচির কাটরাক হলে প্রথম মঞ্চায়িত হয় *মানচিত্র*। নির্দেশনায় ছিলেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান খান। একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-উৎসবে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অভিনীত হয় নাটকটি। ১৯৬৩ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলা একাডেমি এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। নাট্যকার গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'ডাক্তার এহসান আলী খোন্দকারের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।" পরবর্তীকালে *মানচিত্র* বাংলাদেশের নাট্যামোদী দর্শকদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

[২] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৩, পৃ. ১২৬

তো আর কম নেই।[১]

স্কুল-কর্তৃপক্ষের দেয়া সীমিত অর্থে পরিবার প্রতিপালন করতে হয় মজিদকে। অর্থনৈতিক অনটন সত্ত্বেও কর্তব্যসচেতন মজিদ; ছাত্রদের প্রতি তাঁর মমতা ও দায়িত্ববোধের কমতি নেই। পরীক্ষার খাতায় ছাত্রদের যে কোনো ভুল তাঁকে করে তোলে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন। নাটকের প্রারম্ভিক সংলাপেই তাঁর চরিত্রের এই ইতিবাচক প্রবণতা পরিস্ফুট–

> না, আগাগোড়া ভুল! কী যে হয়েছে আজকাল ছেলেরা। একটা অক্ষর যদি শুদ্ধ হতো। (প্রথম দৃশ্য)

অন্য একটি সংলাপেও অভিব্যক্ত হয়েছে এরকম প্রতিক্রিয়া :

> পাতায় পাতায়, লাইনে লাইনে ভুল! আর হবে না কেন– সারাটি বছর বই এর সঙ্গে টুঁ সম্পর্কটি আছে? (প্রথম দৃশ্য)

নাটকে মজিদ মাস্টার প্রবল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন একটি চরিত্র। প্রচণ্ড অভাব-অনটনের মধ্যে দিনযাপন করলেও স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে আড়াই মাসের বকেয়া বেতন চাইতে গিয়ে তাঁর বিবেকে বাধে। স্ত্রী মরিয়মের সংলাপে তাঁর এই প্রবৃত্তি সুস্পষ্ট হয় :

> এমন মানুষ দেখিনি বাবা, চুরি না ডাকাতি? পাওনা টাকা, তাও চাইতে লজ্জা ! (প্রথম দৃশ্য)

কিন্তু অকস্মাৎ বিনা কারণে মজিদকে স্কুল থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁর এই বরখাস্তের পশ্চাতে হেডমাস্টার মনসুর এবং সেক্রেটারি ইয়াকুবের ষড়যন্ত্র ছিল। সমাজের এ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের কারণে পথে বসতে হয় আদর্শ শিক্ষক মজিদকে। এ পর্যায়ে হেডমাস্টার তাঁকে লক্ষ করে বলেন :

> আপনাকে আর আমাদের দরকার নেই। ...আপনার মতো অথর্ব অশ্বত্থ গাছ জিইয়ে রেখে কোনো লাভ আছে? শুধু লোকসান। আমি নতুন চারা লাগাব। পুরনো অকর্মণ্য লোক নিয়ে আমার চলবে না। এটা চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেন্সারি নয়– স্কুল বুঝলেন? (চতুর্থ দৃশ্য)

হেডমাস্টারের এই অন্যায্য বক্তব্য ইতিহাসের শিক্ষক মজিদের আত্মসম্মানবোধে ব্যাপক ঘা দেয়। এতৎসত্ত্বেও তাঁর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় মধ্যবিত্তের আপসকামিতা। অকস্মাৎ তাঁর 'কোথায় যাব? ভিক্ষে করব?...আপনি দয়া করুন'– এই জাতীয় কাতর আকুতিতেও হেডমাস্টারের মনোলোকে কোনো সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয় না। ফলত স্বভাব-নির্বিকার মজিদ মাস্টারও হয়ে

[১] বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), *আনিস চৌধুরী : নাটক সংগ্রহ* , প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫। এ অভিসন্দর্ভে নাটকের প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি এ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যান দুঃসাহসিক এবং প্রতিবাদী। হেডমাস্টার তাঁকে বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস প্রদান করলে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন 'এ সহানুভূতিতেও কাজ নেই।' একইসঙ্গে বিদায়-লগ্নে ইয়াকুবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজেকে কলঙ্কিত করতে চাননি তিনি। প্রাসঙ্গিক সংলাপ লক্ষণীয় :

> নায়েব : ওকি মাস্টার উঠছ, হুজুরকে একটা সালাম পর্যন্ত করলে না?
> মজিদ : অন্তত ঐ একটা কাজ না করে যে বিদায় নিতে পারছি, এটাই একমাত্র সান্ত্বনা, নায়েব।... তোমার হুজুরের তোষামুদের অভাব নেই, লিস্টিতে একজন না-হয় বাদই পড়ল। (চতুর্থ দৃশ্য)

জীবনের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষকতার মতো গর্বিত ও পবিত্র পেশার প্রতি এক সময় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন মজিদ। তাই সহকর্মী কলিমের 'আপিল' করবার অনুরোধেও সাড়া দেননি তিনি :

> না কলিম! ঘেন্না ধরে গেছে। আর মাস্টারি করব না– তার চেয়ে মুটেগিরিও ভাল। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মমর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ হন মজিদ। কারণ 'চাকরির বাজার তো আগুন'। তাই আকালের বাজারে তিনি হিসাবরক্ষকের কাজ করতে চান করিম বক্সের মুদির দোকানে। কিন্তু সেখান থেকেও প্রত্যাখ্যাত হন তিনি। করিম বক্স তাঁকে জানিয়ে দেয় :

> মাস্টার লাভ-লোকসানের হিসাব, এতো বড় কঠিন ব্যাপার–যাকে তাকে তো নিতে পারি না। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

এমতাবস্থায় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে মজিদের জীবনযাপন হয়ে হয়ে পড়ে অনিশ্চিত। কূলহীন সংসার-সমুদ্রের তীব্র সংঘাতে প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর জীবনতরী। চরম এই দুর্দিনেও শ্রমকাতর স্ত্রীকে লক্ষ করে তিনি তাঁর অপার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন, এবং নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন তাঁর অক্ষমতার কথা :

> হেঁসেলঘরে বসেই তোমার জীবনটা কাটল, না ? জীবনে সুখ-শান্তি তো কিছুই পেলে না ? আচ্ছা, পারুর মা, তোমার কি কোনো সাধ নেই? (পঞ্চম দৃশ্য)

পুত্র আমিনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন :

> এ সংসারে দুঃখ-কষ্ট তুই কিছু কম পাস্‌নি– কিন্তু তুই তো জানিস ইচ্ছে করে কেউ তোকে কোনোদিন দুঃখ দেয়নি। (পঞ্চম দৃশ্য)

স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করতে না পারার বেদনা, তৎসঙ্গে সামাজিক লাঞ্ছনা এবং মানসিক উৎপীড়নে বিক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে একদিন জীবিকার অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন

মজিদ। দীর্ঘ পাঁচ বছরের ব্যবধানে শহরের পোস্ট অফিসের বারান্দায় তাঁকে আবিষ্কার করে তাঁর পুত্র আমিন। এসময় তাঁর চেহারায় পরিদৃষ্ট হয় ব্যাপক পরিবর্তন; মুখে দাড়ি, চোখে নড়বড়ে চশমা। তাঁর কাজ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের চিঠিপত্র লিখে দেওয়া। পুত্র আমিনও এ-অবস্থায় তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হয় এবং বলে :

> দেখিহে, তোমার কলমটা একটু দিতে পার? (অষ্টম দৃশ্য)

পরিশেষে পিতাকে চিনতে পেরে আমিন অনুতপ্ত চিত্তে বলে :

> এতদিন পর তোমাকে পেয়েছি। তোমার একটু সেবা করতে দেবে না। কেন দেবে না বাবা– আমার শখ মেটাতে চাও না তুমি? না বাবা ! তোমাকে না নিয়ে আমি এক পা নড়ব না। (অষ্টম দৃশ্য)

পুত্রের শত অনুরোধেও সংসারে ফিরে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে অভিমানী মজিদ। কিন্তু আমিন তার স্ত্রী রোকেয়ার অনুরোধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে অবশেষে সম্মত হন তিনি। আমিন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, সে পিতাকে আর কোথাও যেতে দেবে না। কিন্তু আমিনের অনুপস্থিতিতে পুত্রবধূ রোকেয়া জানায়–

> এবার কিন্তু বেশ কটা দিন আপনাকে বেড়িয়ে যেতে হবে। কাজের ক্ষতি হোক, অন্তত তিন-চারটে দিন আপনাকে কাটিয়ে যেতেই হবে। (নবম দৃশ্য)

পুত্রবধূর এই উচ্চারণে মজিদ আত্মসম্বিৎ ফিরে পান। তাই কাউকে কিছু না বলে তিনি নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়েন। যারা তার রক্তমাংসের শরিক, তাদের কাছেও আত্মসম্মান বিকিয়ে দেননি তিনি। স্পষ্টতই নাট্যকার তাঁকে কর্মপরায়ণ বাঙালি মধ্যবিত্তের এক নিরাপস প্রতিনিধিরূপে অঙ্কন করেছেন। জীবনযুদ্ধের তিনি এক সংশপ্তক সৈনিক; পরাজিত হয়েছেন কিন্তু যুদ্ধে ইস্তফা দেননি। 'একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস, প্রচ্ছন্ন বেদনার বোঝাকে সম্বল করে পথবাসী মজিদ মাস্টার পথকেই চিরসাথী করে নিয়েছেন।'[১]

মজিদের পুত্র আমিন স্কুলজীবনে ছিল মেধাবী ছাত্র। কিন্তু দুর্বিষহ দারিদ্র্যের কারণে দুইবার কলেজের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় সে। এক পর্যায়ে বিপর্যস্ত হয় তার শিক্ষাজীবন। কারণ–

> ছ' মাস হয়ে গেল বই কেনা হল না। পড়ালেখা তো আর গাছে ধরে না। (প্রথম দৃশ্য)

---

[১] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র একটি জামা পরিধান করেই আমিনকে অতিবাহিত করতে হয় সপ্তাহের সাতটি দিন। কখনও কখনও অনাহারে থেকেই তাকে যেতে হয় কলেজে। তদুপরি পিতা ব্যতিত পরিবারের অন্য সদস্যদের সহমর্মিতা অর্জনে ব্যর্থ সে একসময় হয়ে পড়ে বিকারগ্রস্ত এবং ক্রমান্বয়ে সে হয়ে ওঠে বেপরোয়া, একরোখা ও জেদি। হৃদয়ের সুকোমলবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে সে বেছে নেয় উগ্রতার পথ। এমনকি তাদের বাড়ির অতিথি কামালের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হয় না সে। কামাল ভ্রমণজনিত ক্লান্তির কারণে তার সঙ্গে 'মোমিন মেমোরিয়াল শিল্ডের ফাইনাল খেলা'য় যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তার আচরণ হয়ে ওঠে অসৌজন্যমূলক। প্রাসঙ্গিক সংলাপ লক্ষণীয় :

> আমিন : যাবে নাকি হে, ভালো ছেলে ?
>
> কামাল : এই এলাম– তায় আবার ট্রেনজার্নি।
>
> আমিন : ভাল, ভাল। তোমরা ননীর পুতুল। তোমাদের কি ওসব সাজে। আচ্ছা, তাহলে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও তুমি। ... পার তো একটু ক্যাস্টর অয়েল খেয়ে নিও বুঝেছ? (তৃতীয় দৃশ্য)

শুধু তাই নয়, বৈষয়িক জীবনে প্রবেশ করে পরিবারের সদস্যদের প্রতি কোনো দায়িত্বপালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে সে। কিন্তু নাটকের শেষ পর্যায়ে তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ব্যাপক রূপান্তর। এ রূপান্তর ইতিবাচক, মানবিক অনুষঙ্গে ঋদ্ধ। হারিয়ে যাওয়া পিতাকে খুঁজে পেয়ে সে যা বলে, তা স্পষ্টত পিতার প্রতি পুত্রের দায়িত্ববোধ থেকে উৎসারিত :

> এবার তুমি হুকুম চালাবে, আমি শুনব, তোমার অবাধ্য ছেলেটিকে যত খুশি শাসন কর। করবে না? (অষ্টম দৃশ্য)

নাটকের অন্যতম চরিত্র মজিদের সহকর্মী কলিম। মডার্ন হাই স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক তিনি। নাটকে তাঁর উপস্থিতি স্বল্প পরিসরে হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পরার্থপরায়ণ কলিম জীবনের মধ্য বয়সে এসেও বিবাহ করেননি। মজিদের সংলাপে প্রতিফলিত হয়েছে কলিমের নিঃসঙ্গ জীবনচিত্র :

> বিয়ে-শাদি করনি বেশ করেছ– স্বর্গসুখ হে, স্বর্গসুখ! একলা মানুষ– কীভাবে সকাল হয়, কীভাবে সন্ধ্যে হয় টেরও পাও না। (প্রথম দৃশ্য)

কলিম জানেন স্কুল-পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকা গৌণ; সেখানে গুরুত্ব পায় 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। তাই মধ্যবিত্তের চিরাচরিত আপসকামিতাকে সম্বল করেই জীবনযাপন করেন কলিম। পরোপকারবৃত্তি তাঁর চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মজিদের দুঃখ-দৈন্যে তিনি ছিলেন নিরন্তর সহায়। মজিদের চাকরিচ্যুতির পর তিনি এ-পরিবারের প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তা তুলনাতীত। মজিদের সংলাপে এ বক্তব্যের প্রমাণ মেলে :

> যখন সবাই ফিরিয়ে দেয়, ব্যর্থতায় বুক ভরে ওঠে– জানি, সেই হতাশা আর গ্লানির ভেতর তুমিই শুধু একমাত্র নিশ্চিত আশ্বাস। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

এ নাটকে অবশ্য কলিম একেবারে নির্বিকার চরিত্র নয়। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকাও লক্ষ করা যায়। আড়াই মাসের বকেয়া বেতন প্রার্থনা করলে হেডমাস্টার মজিদকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করলে কলিম স্পষ্টভাবে বলেন– 'স্টিক তো আমাদেরও হওয়া উচিত।' যার পরিপ্রেক্ষিতে মনসুর তাঁর প্রতি রুষ্টভাব প্রদর্শন করেন; কিন্তু স্কুলের প্রতি তাঁর আগ্রহ আর কর্মস্পৃহার কারণে হেডমাস্টার তাঁকে কেবলই 'ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে' দেয়। প্রিয় সহকর্মী মজিদকে হারিয়ে কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত নৈঃসঙ্গবোধ করেন কলিম। তাই মজিদের চাকরি ফিরিয়ে আনতে তিনি বিষয়টি 'ম্যানেজিং কমিটি'র নিকট উপস্থাপন করতে চান। কিন্তু মজিদের আপত্তির কারণে তাঁর এ সদিচ্ছা পূরণ হয় না। মজিদ শহরে গেলেও নিঃস্ব পরিবারটির প্রতি বজায় ছিল তাঁর সুদৃষ্টি। তদুপরি মরিয়মের অসুস্থতাকালে তিনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

*মানচিত্রে*র অন্যান্য চরিত্রও স্বমহিমায় দীপ্ত। 'বিশেষত নায়েব এবং ইয়াকুব নাট্যকারের উজ্জ্বল সৃষ্টি।'[১] জমিদার ইয়াকুব এ নাটকে এক প্রতাপশালী চরিত্র এবং মডার্ন হাই স্কুলের সেক্রেটারি। সামন্ত ভূস্বামীর ঐতিহ্যলব্ধ প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে বিদ্যমান। তার আচার-আচরণ-উচ্চারণ সবই উচ্চাভিলাষী। সামান্য ক্যাশ বাক্সের গেলাফ তৈরির জন্য সে চায় নামকরা দর্জি :

> ওসব হাট বাজারের দর্জিতে আমার চলবে না। স্যুট-প্যান্ট কাটা দর্জি চাই। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

বিত্তবান ইয়াকুবের বিদ্যাবিস্তার ও শিক্ষানীতির প্রকৃত পন্থা ছিল অজানা। স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে শিক্ষার প্রসার নয়, বরং অর্থের প্রসার ঘটতে চায়।'জনসেবার নামে সে অর্থ-আত্মসাতেই অধিক আগ্রহী।'[২] বিদ্যালয়কে সে পরিণত করতে চায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে। ছাত্রদের নিকট থেকে বেতন-বাবদ প্রাপ্ত অর্থ চলে যায় তার ব্যক্তিগত তহবিলে। তার কারণেই দরিদ্র শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান না। এমনকি বৈধ-বেতন প্রার্থনা করলে

---

[১] সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ২৪৩

[২] বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), *আনিস চৌধুরী : নাটক সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

শিক্ষকদের ওপর অত্যন্ত রুষ্ট হয় সে। মূলত শিক্ষিত শ্রেণির ওপর ইয়াকুবের ছিল অকারণ ভয়; যার পরিপ্রেক্ষিতে সে তাদের প্রতি সর্বদাই ঈর্ষাকাতর। কারণ সে জানে:

> এই চাষাভুষার ছেলেরা দু'কলম পড়ে আজ বাদে কাল চোখ রাঙাতে আসবে, সে আর আমি জানি না– খুব জানি। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

এরূপ মানসিকতা নিয়ে সে তথাকথিত শিক্ষাবিস্তারে প্রয়াসী হয়। ইয়াকুব চরিত্রের মধ্যে অত্যাচারী জমিদারের কুরুচিপূর্ণ মানসিকতাও পরিলক্ষিত হয়। প্রাসঙ্গিক সংলাপ লক্ষণীয় :

> নায়েব : খাজনা চাইতে গেলেই প্রজারা বলে–
>
> ইয়াকুব : প্রজারা কী বলে সে কথা শুনে কাজ নেই। আমি কী বলি সেটা প্রজাদের বলেছ? (দ্বিতীয় দৃশ্য)

এরপরেও সে নিজেকে একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে প্রদর্শন করতে চায়; মডার্ন হাই স্কুলকে গড়ে তুলতে চায় 'আদর্শ আর ঐতিহ্যের দিক থেকে বড়' করে। যদিও এটি তার আন্তরিক প্রত্যাশা নয়, নিছক কপটতা মাত্র।

নায়েব অবক্ষয়জীর্ণ সামন্তসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। প্রতিবাদী প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ে সে আশ্রয় নেয় কূটকৌশলের। মডার্ন হাই স্কুলের শিক্ষকদের অপমান করতেও দ্বিধাবোধ করে না সে। আবার ইয়াকুব যখন আড়াই মাসের বেতনের পরিবর্তে মজিদকে বিশ টাকা প্রদান করে, সেখান থেকেও সে পেতে চায় 'কমিশন' :

> কলিম: উনিশ টাকা?
>
> নায়েব : হ্যাঁ ,উনিশ টাকা। এক টাকা কমিশন, এমনিতে তো এক পাই বকশিশ দেবে না। তাইতো এক টাকা কমিশন। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

ইয়াকুবের আনুকূল্য অর্জনের প্রত্যাশায় নায়েব সর্বদাই আশ্রয় নেয় চাটুকারীবৃত্তির। ইয়াকুবকে সে বলে :

> এই স্কুলের জন্য হুজুরের ত্যাগের সীমা নেই। সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে হুজুর আজ রিক্তহস্ত নিঃস্ব। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

নায়েবের সমকক্ষ চরিত্র হেডমাস্টার মনসুর। স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে তার ব্যবহার ভৃত্য আর প্রভুর মতো। তবে কার্যসিদ্ধির কালে সে নেয় শঠতার আশ্রয়। মজিদকে বরখাস্ত করবার ক্ষেত্রে সে যে অজুহাত তৈরি করে, তা অত্যন্ত ঠুনকো। তার অভিযোগ– মজিদ ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট সময়ে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয় না। সহকর্মীদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করলেও ইয়াকুবের প্রতি তার বিনয়ের অন্ত নেই। জমিদার বাড়িতে তার অনাহুত আবির্ভাব ইয়াকুবকে বিরক্ত করলে সে মিনতির সঙ্গে বলে:

> কী বলছেন স্যার? আপনার নুন-নেমক খাই। মতলব ছাড়া কি আসতে পারি না? ছেলে পড়ানো চাকরি, ফুরসৎ কই? ভাবলাম যাই, একবার স্যারের কাছে দর্শন দিয়ে আসি। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

শুধু উচ্চারণে নয়, আচার-আচরণেও সে যথেষ্ট তোষামোদী। ইয়াকুবকে করায়ত্ত করতে সে বিসর্জন দেয় তার ব্যক্তিত্ব। প্রকাশ্যেই সে বলে 'এক গ্লাস ঠান্ডা শরবৎ দেব স্যার?'

প্রাইমারি বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং বি.এ. পাশ কামাল মডার্ন হাই স্কুলের নবনিযুক্ত শিক্ষক এবং মজিদ মাস্টারের ভাগ্নে। এক পর্যায়ে সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় মজিদের কন্যা রানুর সঙ্গে এবং গড়ে তুলতে চায় ভালোবাসার এক বর্ণালিভুবন। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা কামাল স্বপ্ন দেখে সুখী এবং সোনালি ভবিষ্যতের :

> তোমার কানের ওই দুলজোড়া বদলে দেব। বাসন্তী রঙের শাড়ি কিনে দিয়ে কাছে এনে বসাব। খোঁপায় বকুল ফুলের মালা জড়িয়ে দিয়ে তোমাকে দেখব। আর কেউ না–ছোট্ট একটা সংসার–কেবলই দুজন। (তৃতীয় দৃশ্য)

তিন মাসের মধ্যেই কামাল উপলব্ধি করে ইয়াকুবের অধীনে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রেখে চাকরি করা অসম্ভব। তাই সে মডার্ন হাই স্কুলের শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দেয় এবং নতুন চাকরির প্রত্যাশায় চলে যায় দিনাজপুর। তবে চরিত্রটি নৈরাশ্যবাদী নয়। সে স্বপ্ন দেখে সমাজ পরিবর্তনের, এদেশের প্রতিটি মানুষের 'সামান্য দুমুঠো অন্নের সংস্থানে'র। কামালের চিন্তা-চেতনার মধ্যে মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়:

> ভাবছি এ চরম ব্যর্থতার দিনগুলোই সব নয়। এরপরও দিন আছে। সেদিন– সেদিন শুধু আমি নই রানু, আমার মতো আরও অনেকে আসবে। তাদের সকলের দুর্বার শক্তির কাছে ওদের একদিন পরাজয় মানতে হবে। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

এ সংলাপের মধ্য দিয়ে হতাশা, দুঃখ এবং বঞ্চনায় দলিত মধ্যবিত্তকে আশার আলো দেখিয়েছেন নাট্যকার।'জীবনের প্রতি অপরিসীম দরদ ও মমত্ববোধের কারণেই তিনি তা সম্ভব করেছিলেন।'[১]

'মরিয়ম চরিত্র রূপায়ণে আনিস চৌধুরী সার্থক শিল্পী।'[২] মজিদ মাস্টারের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে পরিবারকে অত্যন্ত মমতায় জড়িয়ে রাখেন তাঁর স্ত্রী মরিয়ম। সংসারের অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও তাঁর রয়েছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। স্বামীর উদাসীনতা, ছেলেমেয়েদের আবদার, অত্যাচার তিনি

---

[১] সৌরভ সিকদার, *আনিস চৌধুরী (জীবনী - গ্রন্থমালা)*, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৪

[২] নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯

অকপটে সহ্য করেন সর্বংসহা ধরণীর মতো। সন্তানদের প্রতিপালন করতে রাতদিন পরিশ্রম করে নিজেকে নিঃশেষিত করেন তিনি। তবে মজিদের চাকরি চলে যাবার পরও পরিবারের প্রতি আমিনের উন্নাসিক আচরণ তাঁকে করে তোলে বিক্ষুব্ধ। এসময় তিনি বিস্মৃত হন মাতা-পুত্রের নাড়ির সম্পর্ক। অবলীলায় তিনি আমিনকে লক্ষ করে বলেন :

> বাড়ি শুদ্ধ না খেয়ে মরবে, তবু ভালো। আমি গলা টিপে এক এক এক করে মেরে ফেলব। তবু ওর মুখ দেখতে দেব না কাউকে ! দূর হ, দূর হ আমার সামনে থেকে। নেমক হারাম– (পঞ্চম দৃশ্য)

এ বক্তব্য উচ্চারণের পরই মূর্ছা যান মরিয়ম। অতঃপর অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। জ্যেষ্ঠাকন্যা রানুর প্রতি তিনি তাই কর্তব্যপালনে উদ্যোগী হন; এবং পরবর্তীকালে তাঁরই ইচ্ছানুক্রমে কামালের সঙ্গে রানুর বিবাহ সম্পাদিত হয়। আবার পুরো পরিবেশ যখন মজিদের প্রতিকূলে, তখন স্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করে আশ্বস্ত করেন মরিয়ম। তবে স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হলে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান তিনি। মুমূর্ষুদশায়ও স্বামী-সন্তানদের জন্য তাঁর উদ্বেগ ছিল সীমাহীন। অবশেষে জীবনযুদ্ধে ধ্বস্তক্লান্ত মরিয়ম প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমিন যে সংলাপটি উচ্চারণ করে, তা প্রকৃতপক্ষে উপস্থাপন করে এ-সংসারের অমানবিক দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি :

> মা, আমি একটা চাকরি পেয়েছি, চাকরি। মা চাকরি–মা–(চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দেয়) ভালোই হলো, এ সংসারে থেকে কী হতো। (সপ্তম দৃশ্য)

নাটকে মরিয়মকে পাওয়া যায় একজন আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ গৃহিণীরূপে।'বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত মধ্যবিত্ত সমাজের মানচিত্রে তিনি এক চিরপরিচিত বদ্বীপ।'[১]

মজিদের দুই কন্যা: রানু এবং পারু। রানু স্বভাবে চঞ্চল হলেও পরিবারের সদস্যদের প্রতি বেশ যত্নবান। ছোটোবোন পারুর অতিরিক্ত তেঁতুল খাওয়া নিয়ে একদিকে সে যেমন তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়, অন্যদিকে আমিনের কলেজ পালানো নিয়ে বোধ করে উদ্বিগ্নতা। আমিনের একের পর এক অযাচিত আবদারে যখন পুরো পরিবার অতিষ্ঠ, তখন রানু নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে :

---

[১] আনিস চৌধুরী, *মানচিত্র* (ড. দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত), কলেজ সংস্করণ, পাঠকবন্ধু লইব্রেরী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৯, পৃ. ২৯

> অত ফুটুনি কিসের ? নিজের যখন মুরোদ হবে তখন ওসব বড় বড় কথা মানায় । (প্রথম দৃশ্য)

তবে প্রকাশ্যে আমিনকে ভর্ৎসনা করলেও রানুর চিত্তলোকে ছিল ভাইয়ের জন্য অপরিসীম মমতা। নাটকের এক পর্যায়ে প্রকাশিত হয় কামালের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার পর্ব। কিন্তু তখনও রানুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় প্রবল আত্মসম্মানবোধ। কামাল তার কানের দুলজোড়ার মিথ্যা-প্রশংসা করলে সে নির্দ্বিধায় বলে :

> না হলে বলে পুরুষজাত ! মিছে কথা বলার ওস্তাদ। দুল না থাকলে শাড়িখানা মানাতো। শাড়ি না হলে খোঁপার ফুল। (তৃতীয় দৃশ্য)

রানুকে নাট্যকার সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন নাটকের সপ্তম দৃশ্যে। অসুস্থ মায়ের সেবা-শুশ্রূষায় সে স্থাপন করেছে নজিরবিহীন দায়িত্ব। এ পর্যায়ে মাতৃসেবার পাশাপাশি সে সুচারুভাবে সম্পাদন করে সাংসারিক দায়িত্ব। শেষ দৃশ্যেও রানুকে পাওয়া যায় 'পাকা গিন্নি'রূপে।

মজিদ মাস্টারের ছোট মেয়ে পারুল পরিবারের সকলের নিকট অত্যধিক স্নেহের। তার মধ্যে পল্লি কিশোরীর সকল লক্ষণই বর্তমান। পারুর তেঁতুল খাওয়া, ইলিশ–ভাজা খাবার প্রত্যাশা, 'পাড়া ঘুরে বেড়ানো,' বড় বোন রানুর সুটকেসে লুকিয়ে রাখা ফটোগ্রাফের সংবাদ অতিথি কামালকে জানানো– সকল কিছুর মধ্যেই রয়েছে সরলতার প্রকাশ। তার শিশুতোষ বুদ্ধি দিয়ে সে মনে করে তাদের পরিবারে বুদ্ধিসম্পন্ন কেউ নেই। কারণ :

> আপা বলে আমার বুদ্ধি নেই, ভাইয়া বলে আপার বুদ্ধি নেই, বাবা বলে ভাইয়ার বুদ্ধি নেই, আর মা বলে বাবার বুদ্ধি নেই। (তৃতীয় দৃশ্য)

তবে পিতার চাকরি হারানোর পর বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হয় পারু। এসময় গৃহকর্মী লালুর অনুপস্থিতিতে সে ঘর-গেরস্থালির কাজে রানুকে সঙ্গ দেয়; মায়ের অসুস্থতার সময় ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও হন্তদন্ত হয়ে দৌঁড়ে যায় করিম ডাক্তারের বাড়ি এবং শুনতে হয় নির্মম-কঠিন বক্তব্য :

> হাসপাতালে নিয়ে যাও না– পয়সা লাগবে না। এলে ভিজিট দেবে কোত্থেকে? পয়সা আছে? (সপ্তম দৃশ্য)

অতঃপর মায়ের মৃত্যুর পর পারুর লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয় কামাল এবং রানু। মজিদ মাস্টারের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে পারুলই শেষ পর্যন্ত পিতার স্বপ্নপূরণ করতে সক্ষম হয়। 'ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ' পেয়ে সে উজ্জ্বল করে শিক্ষক-পিতার সম্মান।

কেবল শেষ দৃশ্যে নাট্যমঞ্চে উপস্থিত হয়েছে আমিনের স্ত্রী রোকেয়া। 'নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহবধূদের আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার উলঙ্গ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রোকেয়া চরিত্রে।'[১] মূলত রোকেয়ার স্বার্থপরতার কারণেই পাঁচ বছর পর পিতা-পুত্রের মধুর মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মজিদ মাস্টারের শেষজীবন অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত করে সে যা করেছে, তা স্বার্থঘনিষ্ঠ এবং মানবিকতা-বর্জিত।

আনিস চৌধুরী এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের চরম ব্যর্থতাকে মানচিত্রিত করেছেন এ নাটকে। দারিদ্র্য-নিপীড়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্মানের সঙ্গে জীবন-যাপন করতে চায়; কিন্তু সমাজ তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না। তাই প্রতি ক্ষেত্রে তারা হয় লাঞ্ছিত এবং বঞ্চিত। শিক্ষা তাদের অহঙ্কার; অলঙ্কার নয়। কেননা তাদের শিক্ষার যথার্থ মূল্য দেয় না বিত্ত-নির্ভর সমাজ। তাই তারা হয়ে পড়ে করুণার পাত্র। মজিদ, কলিম, আমিন কিংবা কামাল মূলত জীবনসত্যের এই ভিত্তিভূমিকে কেন্দ্র করেই নির্মিত। তাদের সংলাপ থেকে শুরু করে মঞ্চ-পরিকল্পনা– সকল ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত চিত্ত ও চিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সমালোচক-অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম ইসলাম যথার্থই বলেছেন :

> আনিস চৌধুরীর '*মানচিত্র*' নাটকে আমাদের বাস্তব মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিফলন খুঁজে পেলাম... সেখানে রয়েছে গ্রাম্য স্কুল শিক্ষকের বেড়ার বাড়ী-ঘর, মঞ্চে আমরা আমাদের পরিচিত সংসার চিত্রগুলো খুঁজে পেলাম, সেই লাউয়ের ডগা, সেই ইলিশ মাছ, আদরের বেড়ালটি, আর মুসলমান সমাজের প্রচলিত পরিচিত মামাতো ভাইবোনের সলজ্জ মধুর প্রণয়দৃশ্য। শুধু তাই নয়, ঐ নাটকে আমরা আমাদের অতি পরিচিত স্কুল মাস্টার, তার রুগ্না স্ত্রী আর স্কুলের সেক্রেটারী, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকেও দেখতে পেলাম। ... এই প্রথম মঞ্চে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, আশা ও হতাশার রূপায়ণ দেখতে পেলাম।[২]

নয়টি দৃশ্যেও বিন্যস্ত *মানচিত্র* নাটকে সংলাপ নির্মাণের ক্ষেত্রে নাট্যকারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। এ নাটকে তিনি চরিত্রানুযায়ী সংলাপ নির্মাণ করেছেন। মজিদ, কলিম, কামাল, আমিন প্রমুখ চরিত্রের সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজি শব্দ। যেমন:

> কলিম : সেক্রেটারী বললে ... 'ইন ডিউ কোর্স' দেব।
>
> মজিদ : ডিউ কোর্স ! ডিউ কোর্স মানে জানে? জানে তো শুধু রেসকোর্স। (প্রথম দৃশ্য)

---

[১] আনিস চৌধুরী, *মানচিত্র (*ড. দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[২] উদ্ধৃত : সৌরভ সিকদার, *আনিস চৌধুরী (জীবনী - গ্রন্থমালা)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

এ-নাটকে মরিয়ম, রানু, পারুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য ব্যবহৃত সংলাপ। যেমন:

মরিয়ম : যাই পোড়ারমুখী– আমার হয়েছে যত জ্বালা । (প্রথম দৃশ্য)

আবার ভৃত্য লালুর সংলাপে যোজিত হয়েছে আঞ্চলিক ভাষার উপাদান :

দ্যাহেন দুইজনে কী শুরু করছে। (তৃতীয় দৃশ্য)

কামাল-রানুর চিত্তজাগতিক সম্পর্ককে প্রাণবন্ত করতে কামালের সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে লৌকিক ছড়া :

তারপর !
তারপর এলো গণৎকার
গণনায় রাজা চমৎকার
টাকা ঝনঝন ঝনৎকার
বাজায়ে সে গেল চলে। (তৃতীয় দৃশ্য)

তদুপরি সংলাপে কখনও কখনও সংযোজিত হয়েছে সূক্ষ্ম রসিকতা–

ইয়াকুব : কাঁচি ঠেকিয়ে সালাম করছ। তুমি তো আচ্ছা বেয়াদব হে।
দর্জি : হুজুর অপরাধ নেবেন না। অধম হাতের চেয়ে আমার কাঁচির জোর অনেক বেশি। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

নাটকের ঘটনাংশকে উন্মোচন করতে নাট্যকার কখনও কখনও আশ্রয় নিয়েছেন প্রতীকী পরিচর্যার। জমিদার ইয়াকুবের অনাচারে বিপর্যস্ত মজিদের মানসিক-অবস্থা উন্মোচন করতে নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন আরেক ভূস্বামীর অত্যাচারে বিপর্যস্ত এক কৃষকের প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে তিনি পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'দুই বিঘা জমি' কবিতার অংশবিশেষ :

পারু : (নেপথ্যে)
বাবু কহিলেন, 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী ভূমির অন্ত নাই।' (পঞ্চম দৃশ্য)

আবার পুত্রবধূ রোকেয়ার কঠিন উচ্চারণে মজিদের মনোজাগতিক অবস্থা চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র কবিতাংশের মাধ্যমে :

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি। (নবম দৃশ্য)

এ কবিতাংশটি নাটকের শেষ দৃশ্যে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের সমাপ্তিও রচিত হয়েছে এই কবিতার মধ্য দিয়ে। এ নাটকে নাট্যকার মজিদ চরিত্রের সংলাপে সংযোজন করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) '*মেবার পতন* (১৯০৮) নাটকের একটি অমর বাণী – 'তোরা মানুষ হ।' তদুপরি উপমা, উৎপেক্ষা, বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন প্রয়োগে নাট্যকার নাটকটিকে করে তুলেছেন শিল্পমণ্ডিত। যেমন:

উপমা

ক) হাড় হাভাতের মতো চাট্টে গিলতে পারলেই হলো। (প্রথম দৃশ্য)

খ) তোর মতো প্যাঁচামুখো হয়ে আমি তো আর বসে থাকতে পারি না। (প্রথম দৃশ্য)

গ) তখন থেকে যে ষাঁড়ের মতো গলা চেঁচিয়ে মরছি– কানে যাচ্ছে না ? (দ্বিতীয় দৃশ্য)

ঘ) ও হ্যাঁ, দেখ গেলাফটা লেপের মতো তুলোভরা থাকবে। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

ঙ) পাল তোলা নৌকার মতো ভেসে যেতে ইচ্ছে করে, সেও এক আনন্দ। (নবম দৃশ্য)

উৎপেক্ষা

ক) ওঃ একেবারে যেন লাটসাহেব। (প্রথম দৃশ্য)

খ) চুলের ছিরি দেখ, যেন বনমানুষ।(পঞ্চম দৃশ্য)

গ) বাপ তো নয়, যেন কেনা চাকর। (পঞ্চম দৃশ্য)

বাগধারা

ক) সব ব্যাপারে নাক গলানো পছন্দ করি না। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

খ) ভাল, ভাল। তোমরা ননীর পুতুল। (তৃতীয় দৃশ্য)

গ) তাহলে নাক ডেকে ঘুমোও তুমি। (তৃতীয় দৃশ্য)

ঘ) আর ভেজা বেড়ালটি সাজতে হবে না। (চতুর্থ দৃশ্য)

ঙ) এটা কি মগের মুল্লুক? (ষষ্ঠ দৃশ্য)

প্রবাদ-প্রবচন

ক) ঘোড়া ডিঙিয়ে কে কোথায় ঘাস খায় সে খবরও আমার জানা। (চতুর্থ দৃশ্য)

খ) খাল কেটে কুমির এনেছি। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

গ) ভাবছেন মনসুর সোজা লোক, ভাজা মাছটি উলটো করে খেতে জানে না। (চতুর্থ দৃশ্য)

একথা সত্য যে, বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে যখন পূর্ববঙ্গে স্বল্পসংখ্যক নাট্যকার ইতিহাস-পুরাণের বহুব্যবহৃত জগতে বিচরণ করছিলেন অথবা পাশ্চাত্য শিল্পসূত্রকে প্রাধান্য দিয়ে নাটক রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন তখন আনিস চৌধুরী সমকালীন মধ্যবিত্তের জীবনপরিসর থেকে নাট্য-উপাদান গ্রহণ করে রচনা করেছেন *মানচিত্র*। নাটক হিসেবে এটি হয়তো একেবারে

সর্বাঙ্গসুন্দর নয়[১], নাট্যকার হয়তো সমাজসত্যের গভীর বিশ্লেষণে মনোযোগী নন, এর ভাষাশৈলীও হয়তো সহজ-সরল,[২]তবু যে সময় ও সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই নাটকটি রচনা করেছেন সেই বিবেচনায় এটি নিঃসন্দেহে তাঁর নিরীক্ষাধর্মী ব্যতিক্রমী প্রয়াস।[৩] আনিস চৌধুরীর *মানচিত্রেই* বাঙালি মধ্যবিত্ত-জীবনের বিশ্বাসযোগ্য চিত্র প্রথম প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে *মানচিত্রের* অবস্থান তাই সুদূরপ্রসারী।

এ্যালবাম

এ্যালবাম[৪] (১৯৬৫) আনিস চৌধুরীর দ্বিতীয় নাটক। এটি মূলত বিত্তবান এবং বিত্তহীনের দুই বিপরীতধর্মী জীবনালেখ্যের নাট্যরূপ। 'অর্থনৈতিক সমস্যার ফলে সৃষ্ট সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রথা এদেশের সমাজব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল– যা নাট্যকারের মনোভূমি স্পর্শ করেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে *এ্যালবাম* নাটকে।'[৫] এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র

---

[১] "*মানচিত্রের* পরিণতি বড় muted রঙে আঁকা। ট্র্যাজেডির প্রবলতা যা অনিবার্য অন্তঃশীল বিরোধ থেকে আসে তা এখানে অনুপস্থিত। ট্রাজেডি এখানে অনিবার্য নয়। ফলত প্রভূত সততা সত্ত্বেও একধরনের ম্লানতা এই নাটকের মঞ্চসাফল্যে বাধ সাধে।" উদ্ধৃত: আলী আনোয়ার, বাংলাদেশের নাটক: সমস্যা ও প্রবণতা, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা* (রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত), মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ.১৭৮

[২] ''*মানচিত্রে* স্কুল শিক্ষকের জীবনের দারিদ্র্য, হতাশা, যন্ত্রণা এবং সমস্যা অংকিত হয়েছে। সমাজ এখানে রূঢ়ভাবে উপস্থিত; তবে নাট্যকার সমাজ-সত্যকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করেননি। সংলাপ সহজ ও সরল।" [উদ্ধৃত: মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪-৪১৫]

[৩] নাট্যকার মামুনুর রশীদ বলেছেন –"*মানচিত্র* বড়ো চমৎকার নাটক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের জীবন্ত চিত্র এটি। তাঁকে আমার মনে হত প্রতিনিধিত্বমূলক লেখক। তাঁর সঙ্গে যতবারই দেখা হয়েছে আমার, বলেছি আরো বেশি করে মঞ্চনাটক লেখেন না কেন? যদি সিরিয়াসলি আরো নাটক লিখতেন, নাট্যকার হিসেবে অগ্রণী হতে পারতেন। নাটক লেখার ব্যাপারে হয়তো আলস্য জন্মে গিয়েছিল কোন কারণে। বেঁচে থাকলে অবসর জীবনে আনিস চৌধুরী হয়তো আরো নাটক লিখতেন। তা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম।" (উদ্ধৃত : *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৫ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৩৫)

[৪] ১৯৫৭ সালের ১৫ নভেম্বর ইস্ট বেঙ্গল কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে করাচির কাটরাক হলে প্রথম মঞ্চায়িত হয় আনিস চৌধুরীর *এ্যালবাম* নাটক। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে বাংলা একাডেমি এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। নাট্যকার গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চৌধুরী কুদরত গণিকে।

[৫] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ইনাম একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষক। S.T.Peterson কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক তিনি। শহরের একটি জীর্ণ মেসে তাঁর বসবাস। বইয়ের রাজ্যে ডুবে দুর্লভ রত্ন আহরণ করেছেন তিনি 'কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব' পর্যন্ত। এমনকি তাঁর টাকা রাখবার উপযুক্ত স্থানও বই। তাই দেশবাসীর গ্রন্থপাঠে অনীহা তাঁকে করে তোলে উদ্বিগ্ন। বন্ধু কলিমকে লক্ষ করে তিনি বলেছেন :

> যা শিক্ষার প্রসার, দশ বছরের আগে কি আর জ্ঞান পিপাসু তস্কর বই খুঁজতে শেলফে আসবে? (প্রথমপর্ব)

শিক্ষক হিসেবে ইনামের মধ্যে কোমলতা এবং কঠোরতা দুইই বিদ্যমান। তাঁর ছাত্র ধনাঢ্য ব্যবসায়ী-পুত্র আনোয়ার পরীক্ষার খাতায় কয়েকটি নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলে তিনি বলেন :

> বই কেতাবের সংগে সম্পর্ক রাখলে আপশোস করতে হতো না। ... আমার কাছে ধর্ণা দিয়ে কিছু হবে না। (পঞ্চম পর্ব)

আনোয়ারের পর তার পিতা মুস্তাফা এ-বিষয়ে অনুরোধ করলে তাও ইনাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়; মুস্তাফা তাঁরই কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জেনেও তাকে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন :

> ঐ এক পেপারে ফেল করলেও আপনার ছেলের গায়ে কেউ আঁচড় দেবে না। কষ্ট করতে শিখুন। (পঞ্চম পর্ব)

তবে বইয়ের জগতে বাস করলেও ইনামের মনোভূমি একেবারে রসহীন নয়। নাটকের প্রারম্ভ থেকেই তাঁর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। অন্যের অর্থে কাইউমের সিগারেট ক্রয় করবার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে ইনাম যে উক্তি করেন, তাতে প্রকটিত হয় তাঁর রসবোধের পরিচয় :

> কাইউম: বলতে চান পয়সা দিয়ে কিনে আমি সিগ্রেট খাই নে।
> ইনাম: হয়তো খাও। কিন্তু সে স্মরণীয় মুহূর্ত চাক্ষুষ দেখার সুযোগ আমার হয়নি। (প্রথম পর্ব)

কাইউমকে নিয়ে রসিকতা করলেও তার প্রতি ইনামের স্নেহ অন্তহীন। নাটকে দেখা যায়, নিজে দুগ্ধ পান না করে তিনি কাইউমকে খেতে বলেন; এমনকি মেস ত্যাগ করবার পূর্ব মুহূর্তে ঘুমন্ত কাইউমের বালিশের নিচে নগদ অর্থ রেখে যেতে চান তিনি। কাইউম সম্পর্কে অন্যত্র তিনি বলেছেন– 'ও আমার আত্মীয়ের চেয়েও বড়।' (দশম পর্ব) আবার একসময়ের বন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

কলিমকে প্রতারক জেনেও তার প্রতি তিনি কোনো দুর্ব্যবহার করেননি; বরং কলিমের মেয়ের জন্য তিনি প্রদর্শন করেছেন অপ্রত্যাশিত মমতা। কলিমকে তিনি বলেছেন :

> নিজে তো ভবঘুরের মত কাটাচ্ছ। মেয়েটার জন্যই যত দুর্ভাবনা। (পঞ্চম পর্ব)

এ্যালবাম নাটকে ইনাম যথার্থই নাট্যকারের জীবনাদর্শের প্রতীক। তিনি হয়ে উঠেছেন নাট্যকারের জীবনাদর্শ ও কর্মের বাহন। নাট্যকারের অনেক বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে ইনামের উচ্চারিত সংলাপের মাধ্যমে। প্রাক্তন ছাত্র মকবুলের মৃত্যুর পর ইনাম তাঁর পুরো সংসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন; যদিও তাঁর নিজের জীবনযাপনও মসৃণ ছিল না। অভাব-অনটনই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। একসময় স্কুলে দুই মাসের বেতন বকেয়া থাকায় কাইউমের পুরোনো-ঘড়ি বিক্রয় করে তাঁকে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে হয়েছিল। নিত্য দুর্দশাগ্রস্ত হয়েও তিনি বিপন্ন মানুষদের প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছেন সহানুভূতির হাত। অভাবের কাছে বিকিয়ে দেননি আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্ববোধ; সমুন্নত রেখেছেন নিজের অবস্থান। কিন্তু চারপাশের জীবনব্যবস্থার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে একসময় তিনিও নিক্ষিপ্ত হন হতাশার গহ্বরে, এবং উচ্চারণ করেন :

> শখ কি আমার হয় না, নিজের একটা ঘরবাড়ি ! ছোট সংসার। ... একদিন ভেবেছিলাম বই-এর রাজ্যে ডুবে থেকে ভুলে থাকব– সব দুঃখ যাতনা। এখন দেখছি সেখান থেকেও চোখ তুলে তাকাতে হয়। এ আমার সহ্য হয় না। (দশম পর্ব)

এক পর্যায়ে ব্যর্থ জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় ইনাম চাকরি ছেড়ে চলে যেতে চান গ্রামে। এমনকি জিনিসপত্র সুটকেসে গুছিয়ে মেস-ত্যাগেও উদ্যত হন তিনি। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁকে প্রবলভাবে বাধা প্রদান করে মকবুলের স্ত্রী রুবী। কেননা রুবী মনে করে, জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যে পৌরুষের কোনো সার্থকতা নেই। নাটকের সমাপ্তিতে নাট্যকার ইনামের যে চরিত্রাঙ্কন করেছেন, তাতে উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর শিক্ষকসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

> ইনাম: বল স্বরে 'অ' স্বরে 'আ'
>
> রতন: 'ছলে আ ছলে আ'। (একাদশ পর্ব)

ইনামের মেস-মেট কাইউম এ নাটকে শিক্ষিত বেকার যুবক। মেসের দরজার কড়া নড়লেই সে সচকিত হয়ে ওঠে; মনে করে এই বুঝি প্রাপ্ত হবে চাকরিপ্রাপ্তির কোনো মধুর বার্তা। কিন্তু শেষাবধি ব্যর্থতাই হয়ে ওঠে তার বিধিলিপি। তার মধ্যে রয়েছে নিজেকে প্রকাশ এবং প্রচার করবার প্রচেষ্টা। ইনামের দৃষ্টিতে কাইউম 'নিতান্তই মধ্যবিত্ত'। নিজের ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি

সুন্দরভাবে বাক্সে সাজিয়ে রাখে সে, কিন্তু ইনামের ব্যবহৃত প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহার করে অবলীলায়। এমনকি ইনামের ছাত্র আনোয়ারের কাছ থেকেও সে পেতে চায় 'সামান্য ক পয়সার টিকিট'। কাইউমের মধ্যবিত্ত-চিত্তের যে স্বরূপ, তা উন্মোচিত হয়েছে ইনামের সংলাপে :

> মধ্যবিত্ত পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস চুরি করলেও, পয়সা চুরি করবে এমন অপবাদ আজও দিতে পারি নে। (প্রথম পর্ব)

নাটকে কাইউম অর্থসঙ্কটে বিচলিত কিন্তু মর্যাদাবোধে অকুণ্ঠিত। ইনামের অর্থের ওপর নির্ভর করে মেসে দিনযাপন করলেও কোনোপ্রকার বিরূপ মন্তব্য শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। তার আত্মসম্মানবোধ বেশ টনটনে। ইনামকে সে বলে :

> আর যদি দুটো পয়সা নিয়েই থাকি, ভাবেন হিসাব রাখিনি? সব Note bookএ লেখা আছে। হুঁ অত ইয়ে ভাববেন না। (প্রথম পর্ব)

নাটকে কখনও কখনও কাইউমকে মিতব্যয়ী চরিত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। নিজে সে হয়তো শুদ্ধাচারী নয় কিন্তু অন্যের অনাচার কিংবা অনিয়মের বিরোধী। দুধে পানি মেশানোর অভিযোগে গৃহকর্মী আবদুলকে সে জরিমানা করে এবং সেইসঙ্গে দেশলাইয়ের কাঠি পর্যন্ত গুনে রাখে। তবে ইনামের দুর্দিনে নিজের পুরাতন ঘড়ি বিক্রি করতেও দ্বিধাবোধ করে না সে। তার চরিত্রের এই বিপ্রতীপতার চিত্র পাওয়া যায় ইনামের স্বীকারোক্তিতে। রুবীর নিকট কাইউম সম্পর্কে ইনাম বলেছেন :

> তোমাকে টাকা দিয়েছি শুনলে ও হয়ত রাগ করবে কিন্তু সে টাকা তোমার কাছ থেকে ফেরত নিয়েছি জানলে আমাকে আস্ত রাখবে না। তাকে তুমি চেন না রতনের মা, ও টাকা বরং তুমি রাখ। (দশম পর্ব)

কলিম এ নাটকে ইনামের বন্ধু। 'দারিদ্র্য, বাটপাড়ি, পিতৃস্নেহ সব কিছুর একত্র সমাবেশ ঘটেছে এ চরিত্রে।'[১] বেকার, নিঃস্ব, নিয়তি-বিশ্বাসী এবং নিরাশ্রয় কলিমের মধ্যে রয়েছে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা :

> মেজ মামা চিঠি দিয়েছিলেন ওখানে গিয়ে উঠতে। ভাবলাম, দূর ছাই! তার চেয়ে ইনামই ভাল। বাড়ির সুখ মেসে নাই বা থাকল একটা satisfaction তো আছে! (প্রথম পর্ব)

---

[১] নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০

কিন্তু মেসে এসেই কলিম নানা অজুহাতে ইনামের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে। নিজের অবস্থা ও অবস্থান গোপন করে নানান চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার আচরণসূত্রে। সে চায় সমাজের উচ্চশ্রেণির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং স্বগোত্রীয়দের অস্বীকার করে নিজেকে ভিন্ন শ্রেণিরূপে উপস্থাপন করতে। নিজেকে সে কখনও 'Rankinদের firm'এর বড়সাহেবের পরিচিত বলে উপস্থাপন করতে চায়; আবার কখনও Philip, Cuningham কিংবা শিবুরাম ঠনঠনিয়াদের অতিঘনিষ্ঠ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়। নাটকে কলিমের সঙ্গে কাইউমের কথোপকথনসূত্রে উদ্ঘাটিত হয়েছে তার চরিত্রের এই বিশেষ মাত্রা :

> কলিম: কানিংহাম। চিনবেন না। International Jute Tradingএর মালিক। ওঁর একবার আসবার কথা আছে কি না আমার খোঁজে।
>
> কাইউম: আপনার দেখছি বেশ বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ। (দ্বিতীয় পর্ব)

ব্যবসায়ী মুস্তাফার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে একপর্যায়ে কলিম প্রতারণার আশ্রয় নেয়। মুস্তাফার কাছ থেকে কয়লার ব্যবসা বাবদ সে পাঁচ হাজার টাকা আত্মসাৎ করতে চায়। শুধু তাই নয়, Bus fair-এর সামান্য পাঁচ আনা পয়সা নিতেও দ্বিধাবোধ করে না সে। এক সময় মুস্তাফার নিকট উন্মোচিত হয় কলিমের প্রকৃত পরিচয়। মুস্তাফা এ অপরাধ থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে চায় একটি শর্তের বিনিময়ে, তা হলো : ইনামের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা। কিন্তু মুস্তাফার সকল প্রকার ভয়- ভীতি উপেক্ষা করে শেষ মুহূর্তে কলিম যা বলে, তাতে উদ্ভাসিত হয় তার মানবিক বিবেচনাবোধের পরিচয়– 'না, না, এ আমি পারব না।' (অষ্টম পর্ব)

জীবনযুদ্ধে কপটচারী হলেও মাতৃহারা একমাত্র কন্যা মীনুর প্রতি তার ছিল অশেষ স্নেহ। নাটকে দেখা যায়, মেয়ের অনাহারের কথা স্মরণ করে কলিম এককাপ চা পর্যন্ত খায় না। আবার কাইউমের কাছ থেকে একটি ভাঙা পুতুল নিয়ে সে মীনুকে উপহার দেয়। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মীনু পুতুলটি মুস্তাফার কন্যা লিলির নিকট বিক্রয় করতে চাইলে সে মীনুর মা হবার বাসনা প্রকাশ করে। কিন্তু লিলির এ প্রস্তাব কৌশলে এড়িয়ে যায় কলিম। তবে নাটকে 'অর্থলোলুপ কলিম হঠাৎ করে লিলির প্রেম প্রত্যাখ্যান কেন করলো সেটাও স্পষ্ট নয়। আর বিত্তশালী পরিবারের আধুনিকা কন্যাই বা কেন বিপত্নীক চাল চুলোহীন কলিমকে প্রেম নিবেদন করতে গেল, সেটাও স্পষ্ট নয়।'[১]

[১] নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০

ব্যবসায়ী মুস্তাফা উঠতি বুর্জোয়া মুস্তাফা এবং স্বার্থান্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। অগাধ অর্থ-বিত্তের মালিক সে। তবে ব্যাংকে তার বিশ্বাস নেই। সারাদিনের অর্জিত অর্থ রাতে সে টিফিন ক্যারিয়ারের মাধ্যমে নিয়ে আসে বাড়িতে। ইনামের সংলাপে উন্মোচিত হয়েছে অশিক্ষিত মুস্তাফার স্বরূপ :

> আপনাকে দেখেও মনে হয় যে, আপনি দু'তিন বছর আগে একশ'র বেশী গুণতে ভুল করে বসতেন। (পঞ্চম পর্ব)

মূলত কালোবাজারির মাধ্যমে মুস্তাফা অর্জন করে প্রচুর অর্থবিত্ত। নাটকের এক পর্যায়ে কলিমের প্রতারণার শিকার হয়ে এবং সন্তানের পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর সুপারিশ নিয়ে সে উপস্থিত হয় ইনামের নিকট; কিন্তু কার্যসিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়ে ইনামের ক্ষতিসাধনের অপচেষ্টা চালায় সে। ইনামের বইপত্রের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেক লুকিয়ে রেখে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায় মুস্তাফা এবং এ কাজে সে নিযুক্ত করতে চায় কলিমকে। কিন্তু কলিম এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে তাকে উত্তেজিত করতে সে উপস্থাপন করে ইনাম-সম্পর্কিত নানা অসত্য তথ্য। এ কাজেও ব্যর্থ হয়ে শেষপর্যন্ত কলিমকে নানা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মুস্তাফা :

> বেশ, যা খুশি আপনার। পরে বলবেন না ইচ্ছে করে আপনার সর্বনাশ করলাম। শুনেছি আপনার একটা বাচ্চামেয়েও আছে। যা দিনকাল, জেল থেকে ফিরে এসে যদি দেখেন, আপনার মেয়েও শুকিয়ে– (সপ্তম পর্ব)

আনোয়ার এ নাটকে ইনামের ছাত্র এবং ব্যবসায়ী মুস্তাফার একমাত্র পুত্র। নাটকের প্রথমে তার উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এসময় সে পিতার আলমারির তালা ভেঙে অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা করে; পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আশ্রয় নেয় কপটবুদ্ধির। শিক্ষক ইনামের রুমমেট কাইউমকে আত্মহত্যার হুমকি প্রদান করে সে বলে :

> আপনারা তো experienced লোক। কোনটা কম কষ্টের বলুন তো। রেললাইন, সায়নাইড, না ফাঁসী? (দ্বিতীয় পর্ব)

ইনামের কাছ থেকে অনৈতিক সহানুভূতি অর্জনে ব্যর্থ হয়ে অর্থদম্ভে উন্মত্ত আনোয়ার তাঁর সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে। এমনকি শিক্ষকের সম্মুখে সিগারেট জ্বালাতেও দ্বিধাবোধ করে না সে। ইনামকে সে বলে :

> কয়েকটা নম্বর বাড়িয়ে দিলেই ভাল করতেন। ... দেখা যাবে, দেখা যাবে। দুদিন পর এ শর্মার কাছেই আসতে হবে। (পঞ্চম পর্ব)

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের ধনীপুত্ররা অর্থের দম্ভে সামান্য বেতনভোগী অধ্যাপকের সঙ্গে কীরূপ অশোভন আচরণ করতে পারে– তারই চিত্র এটি। নাটকের শেষ পর্যায়ে আনোয়ারের গাড়িতে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে ইনামের প্রাক্তন ছাত্র মকবুল। এ মৃত্যুর পর আনোয়ার সন্ধান পায় মনুষ্যত্বের। অপরাধ এবং অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে মকবুলের স্ত্রী রুবীর নিকট। একইসঙ্গে ইনামকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে–

> আপনি আমার ঐ দুটো নম্বর বাড়ালে মনুষ্যত্বের এত বড় শিক্ষাটা আমি কিছুতেই পেতাম না। (ষষ্ঠ পর্ব)

ঘটনার আকস্মিকতায় আনোয়ার হারিয়ে ফেলে তার মানসিক ভারসাম্য। অতঃপর পিতার সিন্দুক থেকে পাঁচ হাজার টাকা চুরি করে সে দিতে চায় মকবুলের স্ত্রীর হাতে এবং বিনিময়ে প্রত্যাশা করে ক্ষমা-ভিক্ষা ।

মুস্তাফার মেয়ে লিলি এ নাটকে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। পার্টি, চ্যারিটি শো– এসকল জায়গায় তার নিত্যবিচরণ। কারণে-অকারণে পিতামাতার সঙ্গে সে লিপ্ত হয় তর্কযুদ্ধে। আবার কখনও বান্ধবী রুবীর নিকট আভিজাত্য প্রকাশে ব্যস্ত থাকে সে। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে রুবী যখন তার সন্তান রতনকে নিয়ে বিচলিত, তখন অবিবেচকের মতো লিলি সেই সন্তানকে রেখে আসতে বলে 'বোর্ডিং' এ। তবে নাটকে লিলি স্পষ্টভাষী চরিত্র। প্রতারক কলিম সম্পর্কে সে–ই প্রথম উচ্চারণ করে সত্য বক্তব্য। মুস্তাফাকে সে জানায় :

> তোমার partner এর তোষামোদ শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। (চতুর্থ পর্ব)

পরবর্তীকালে মাতৃহারা মীনুকে উপলক্ষ করে কলিমের প্রতি সে মনোজাগতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু লিলির অন্তরাশ্রিত এই আবেগ-সংবেদনাকে কটাক্ষ করে কলিম :

> ও রকম ছেলেমেয়ে দেখলে দয়া উথলে ওঠা ওতো তোমাদের ফ্যাশান। ... ঐ দুটো চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলে এত সুন্দর ও বড়লোক দেখায় তোমাকে? (নবম পর্ব)

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লিলি অনুধাবন করে জীবনের পরম সত্য। তাই চিত্তের ঐশ্বর্যের কাছে পরাজিত হয় পরাক্রমশালী বিত্ত। এক দুঃসহ শূন্যতা আচ্ছন্ন করে তার মনোজগত। ফলে দেখা যায়, অগাধ জোতজমি-ঐশ্বর্যের মালিক রায়পুরের বেগম সাহেবার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধকে লিলি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। মাতা নাসিম বানুকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় :

> অর্থ, যশ আর মন এ দুটো কোনোদিন পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে না। অর্থ-যশই মেনে নিলাম। ওটাই যে তোমাদের শিক্ষা। মন আবার কোনো জিনিস! ও তো পুতুলের মতো ঠুনকো– (নবম পর্ব)

রুবী এ-নাটকের একটি নন্দিত চরিত্র। মকবুলের গৃহলক্ষ্মী সে। মকবুলের অভাবী সংসারকে সে পরিচালনা করে নিপুণ দক্ষতায়। স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই তার; বরং তার সংলাপে উদ্ভাসিত হয়েছে অর্থনৈতিক সংকটে তাড়িত একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখী ও সুন্দর দাম্পত্য জীবনের চিত্র :

> রুবী : এদিকে সংসার চলে না। অথচ কি দরকার ছিল এটার বল তো? ঝোঁক চাপল মাথায়, দুশো টাকা দিয়ে এটা নিয়ে এল।
> লিলি : তোরা তা'হলে সুখেই আছিস। (ষষ্ঠ পর্ব)

রুবী সংগ্রামী নারী চরিত্র। সংসারের দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করবার চেয়ে জয় করতেই অধিক আগ্রহী সে। মকবুলের মৃত্যুর পর ক্ষণিকের জন্য ভেঙে পড়লেও সে বজায় রেখেছে তার স্বভাবসিদ্ধ চারিত্রিক দৃঢ়তা। হতাশাগ্রস্ত ইনামের মনে শক্তি জুগিয়েছে সে এবং উচ্চারণ করেছে জীবনের নব তাৎপর্যের কথা :

> এক সংসার থেকে পালিয়ে আর এক সংসার গড়া যায় না। যে দুঃখ, গ্লানির ভয় আপনাকে ঘরছাড়া করছে সে কি অন্য কোথাও নেই? এতদিনের ভালোবাসা, স্নেহ আর প্রীতির যে পরিবেশ, শুধু মাত্র একটি দিনের খেয়ালে তাকে আপনি ছেড়ে চলে যাবেন।... শূন্যতা কি আপনার একার? আমার সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারছেন? আমার কথা একবার ভাবুন। এটি (রতনকে দেখিয়ে) ছাড়া আমার কে আছে বলুন। তবু আমি কি কলসি গলায় বেঁধে ডুবতে গেছি। বলুন চুপ করে আছেন কেন? সুখ, ও শুধু কথার কথা। জীবনের সকল রূঢ়তা, রুক্ষতার ভেতর হেসে খেলে যাওয়ার নামই সুখ। (একাদশ পর্ব)

'*এ্যালবাম* নাটকের কাহিনীতে তিনটি ধারাকে একত্রে গ্রথিত করেছেন নাট্যকার আনিস চৌধুরী। উচ্চবিত্ত মুস্তাফার পরিবার, মধ্যবিত্ত মকবুল-রুবীর সংসার এবং আদর্শবাদী অধ্যাপক ইনাম ও কাইউমের জীবনধারাকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। মূলত অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের চিত্রই *এ্যালবামে* উপস্থাপিত হয়েছে।'[১] এগার পর্বে বিভক্ত *এ্যালবাম* আনিস চৌধুরীর জনপ্রিয় নাটক হলেও এর নাট্যগুণ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কোনো কোনো

[১] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

সমালোচক।[১] তবে সংলাপ নির্মাণের ক্ষেত্রে নাট্যকার প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত-তীক্ষ্ণ।'[২] চরিত্রানুযায়ী সংলাপ নির্মাণে নাট্যকারের দক্ষতা তুলনাতীত। এ নাটকে অবলীলায় ব্যবহৃত হয়েছে কথ্য সংলাপ। যেমন :

ক) কাইউম: অত ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় কেন। যা বলার চট্ পট্ বল। (তৃতীয় পর্ব)

খ) লিলি: দেখে কি করবি ভাই। তোর তো কেনার মুরদ হবে না। (ষষ্ঠ পর্ব)

আবার সংলাপে কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজি বাক্যও :

কলিম: You mean, perpetual slavery, ক্ষেপেছ (প্রথম পর্ব)

কলিম: O.K. Cheer you. Ta–Ta. (সপ্তম পর্ব)

পাশাপাশি সংলাপে যোজিত হয়েছে আরবি-ফারসির ভাষিক উপাদান–

ক) আবদুল: না হুজুর। তওবা তওবা। (দ্বিতীয় পর্ব)

খ) কাইউম: আলবৎ যাব। কটা পয়সার জন্য অমন করলেন। (দ্বিতীয় পর্ব)

কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়েছে প্রবাদ-বচনধর্মী সংলাপ। যেমন :

ক) যত ভদ্র হওয়া যায়, বিপদটাও তত বেশী। (প্রথম পর্ব)

খ) যার জন্য চুরি, সেই বলে চোর। (প্রথম পর্ব)

গ) দুধ দিয়ে সাপ পুষেছি। (তৃতীয় পর্ব)

ঘ) ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে বলল কে। (তৃতীয় পর্ব)

ঙ) ঘুঘু বার বার ধান খায় না। (পঞ্চম পর্ব)

চ) যার যার চরকায় সে তেল দিক আমার জেনে কাজ কি। (অষ্টম পর্ব)

ছ) মায়াময় জগতে মায়া একটু আধটু হবেই। (নবম পর্ব)

---

[১] "আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র*-এ যে জীবনবোধ উপস্থাপিত *এ্যালবাম*– তা অনুপস্থিত। তবে এ-কথা বলা যায় যে, নাট্যকার সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরের উপস্থাপনে মোটা তুলি ব্যবহার করেছেন।...কাহিনী সুগ্রন্থিত নয়। নাটকীয় উৎকণ্ঠা অনুপস্থিত। বস্তুত *এ্যালবাম* আনিস চৌধুরীর একটি দুর্বল সৃষ্টি।" (উদ্ধৃত : সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৪।)
অন্যত্র ড. নীলিমা ইব্রাহীম বলেছেন– "এ্যালবামের চরিত্রগুলি হয়ত সবই বাস্তব কিন্তু নাটকীয় কাহিনীর গ্রন্থিসূত্র অপেক্ষাকৃত শিথিল ও দুর্বল বলে মনে হয়। উপসংহারে একথা বলা যায় যে এ নাটকে নাট্যকার সর্বত্র নৈব্যক্তিকতা রক্ষা করতে করে নিজেকে গোপন রাখতে পারেন নি এবং ইনাম চরিত্র এ কারণেই কিছুটা প্রচারধর্মী হয়ে গেছে।" (উদ্ধৃত: নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০।)

[২] সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

জ) মেয়ে মানুষেরা অনেক কিছু জানে। হৃদয়কে চিনতে তাদের ভুল কখনও হয় না। (একাদশ পর্ব)

মকবুলের সংলাপে গানের ব্যবহার লক্ষণীয়। এ গান একইসঙ্গে লোকধর্মী এবং ইঙ্গিতবহ :

ফিরিব ফিরিব করি,
বুঝি ফেরা হয় না সখী। (ষষ্ঠ পর্ব)

আবার উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বাগধারা প্রভৃতির মাধ্যমে নাট্যকার *এ্যালবামের* শিল্পসৌকর্য বৃদ্ধি করেছেন বহুগুণ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

উপমা :

ক) কথাটা রূপকথার গল্পের মত মনে হয়। (প্রথম পর্ব)

খ) নিজে তো ভবঘুরের মত কাটাচ্ছ। (পঞ্চম পর্ব)

গ) এসব অস্বাভাবিক মহানুভবতা শরৎ–এর শিশির বিন্দুর মত। ও থাকে না। মুছে যায়। (নবম পর্ব)

উৎপেক্ষা:

ক) সেগুলো তাঁর বাক্সে সুন্দর করে থরে থরে সাজানো থাকে। দেখলে মনে হয় যেন একটা stationery shop. (প্রথম পর্ব)

খ) আদর সোহাগের বেলায় তো তুই। যেন রাজকন্যে। (দ্বিতীয় পর্ব)

বাগধারা :

ক) হুঁচড়ে পাকা মেয়ের সাথে কথা বলাই অন্যায়! (চতুর্থ পর্ব)

খ) সে গুড়ে বালি ! (প্রথম পর্ব)

গ) ভাল করলে না। আখেরে পস্তাবে। (দ্বিতীয় পর্ব)

ঘ) বুঝেছি বুড়ো মরুক আর দশ ভূতে মিলে সম্পত্তি লুটুক। (তৃতীয় পর্ব)

উপর্যুক্ত আলোচনাসূত্রে বলা যায়, *এ্যালবাম* নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা অনুষঙ্গ, বিশেষত তাদের জীবনের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা এবং আশাভঙ্গের বেদনা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উপস্থাপন করেছেন আনিস চৌধুরী। নাটকটির শিল্পসফলতা সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা থাকলেও মধ্যবিত্ত জীবনের অনুপুঙ্খ রূপায়ণে *এ্যালবাম* বাংলাদেশের নাটকে একটি কালজয়ী দৃষ্টান্ত হিসেবে নির্দ্বিধায় স্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাশা

মধ্যবিত্তের সীমাহীন অসহায়ত্ব চিত্রিত হয়েছে আনিস চৌধুরীর *প্রত্যাশা* (১৯৬৭) নাটকে। নাটকের প্রধান চরিত্র আলিম একসময় গ্লোব কেমিক্যাল কোম্পানির সেলস অফিসার পদে 'ইন্টারভিউ'তে যাবার প্রাক্কালে একটি ঘড়ি ধার নেয় মেসমেট কবীরের কাছ থেকে। এ পর্যায়ে কবীর অকপটে ঘোষণা করে তার ঘড়ির শ্রেষ্ঠত্ব :

> এ ঘড়ি আর পাবে না। তখুনি কিনেছিলাম চারশো পঁচিশ টাকা দিয়ে, সেন্টার সেকেন্ড, সেভেনটিন জুয়েলের সুইচ ঘড়ি। (প্রথম দৃশ্য)

কিন্তু ঘড়ির কাটা আধা ঘণ্টা 'স্লো' হবার কারণে নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় আলিম। এদিকে পিতার আকস্মিক অসুস্থতায় কবীর চলে যায় গ্রামে, আর আলিমের অসাবধানতায় ঘড়িটি চলে যায় পকেটমারের হাতে। ফলে ঘড়িটি ফেরত দিতে না পেরে আত্মগ্লানিতে ভরে যায় আলিমের মন। এরপর থেকে সে ঘড়িটি কবীরের নিকট হস্তান্তর করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বন্ধু শওকতের নিকট সে প্রকাশ করে তার এই আন্তরিক ইচ্ছার কথা–

> দেখিস যেমন করেই হোক, যতদিনই লাগুক ঘড়ি ওর ফেরত দেবোই। সে জন্য যদি না খেয়ে কাটাতে হয় তবুও– (দ্বিতীয় দৃশ্য)

আলিম তার বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। তাই সংসার-জীবনে স্ত্রী-কন্যার সামান্য সাধ পূরণে অক্ষম হলেও সাত বছর যাবৎ তিল-তিল করে সর্বস্ব বাঁচিয়ে সে ক্রয় করে একটি সেন্টার সেকেন্ড ষোল জুয়েলের সুইস ঘড়ি। কিন্তু আলিমের স্ত্রী রোকেয়া স্বামীর এরূপ উদারতাকে মেনে নেয় না সহজভাবে। আলিমকে সে বলে :

> আত্মত্যাগ, কিসের আত্মত্যাগ? তুমি বাহবা পাবে, সাধুবাদ পাবে, আমাদের কী হবে।... তোমার নিজের আত্মত্যাগের পেছনে আমাদের যে বঞ্চনার ইতিহাস, সেটা ভুলে যেও না। এসব বড় বড় ফাঁকা বুলির কোনো মানে হয় না। (তৃতীয় দৃশ্য)

কিন্তু স্ত্রীর এরূপ কটুবাক্য আলিমের উদ্যমতাকে স্তিমিত করতে পারেনি। অনেক কষ্টে সে খুঁজে বের করে তার পুরাতন বন্ধুর ঠিকানা এবং জানতে পারে কবীর বর্তমানে কোনো সাধারণ ঘড়ি ব্যবসায়ী নয় বরং হোল সেলার্স এবং ইম্পোর্টার; বিউটি ওয়াচ কোম্পানির স্বত্বাধিকারী সে। অবশেষে কবীরের জন্য ক্রয়কৃত ঘড়ি তার সম্মুখে উপস্থাপন করলে সে মনে করে তার নিকট পুরাতন ঘড়ি বিক্রয় করতে এসেছে আলিম। তাই ঘড়ির উপযুক্ত মূল্য 'চারশো পঁচিশ' টাকার পরিবর্তে সে আলিমের হাতে তুলে দেয় তিরিশ টাকা; এবং বলে :

> ওই তোমাকে বলে তিরিশ টাকা দিচ্ছি। নইলে এ ঘড়ির এক কানাকড়িও মূল্য নেই। রাখ, রাখ। ঠকোনি, ঠকোনি, অন্য কেউ হলে দশ টাকা দিয়ে বিদেয় করত। তুমি বন্ধু মানুষ। ... দেখছ তো এ সময় ক্লায়েন্টের ভিড়। এখন তাহলে এসো– হ্যাঁ।আরেকদিন দেখা হবে। (চতুর্থ দৃশ্য)

কবীরের এরূপ আচরণে স্বভাবতই বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে আলিম। সংসারে সে তার প্রকৃত অবস্থান উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কবীরের আচরণে অপমানিত, ব্যথিত ও বিপর্যস্ত হয়ে বন্ধুত্বের সুখকল্পনা থেকে বাস্তবতার ধূসর জগতে প্রবেশ করে সে।

নাটকে শওকতও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। জীবনকে সহজভাবে বিবেচনা করে সে। শওকত অন্যের উপকার করতে চায় কিন্তু তারও রয়েছে সীমাবদ্ধতা :

> সত্যি অমন কষ্ট হবে তোর জানলে, নিজের ঘড়িটাই দিয়ে দিতাম। কিন্তু দুঃখের কথা কি জানিস? আমারও কোনো ঘড়ি নেই। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

নাটকের দৃশ্য বর্ণনায়ও লেখক বারবার অঙ্কন করেছেন মধ্যবিত্তের পরিবার-পরিসর :

> মোটামুটি মধ্যবিত্ত পরিবেশ। দেয়ালঘেঁষে একটা আলনা ও সে সঙ্গে ছোটমতো একটা শোকেস। তাতে মাটির পুতুল ও রকমারি খেলনা রাখা। (তৃতীয় দৃশ্য)

পূর্ববর্তী নাটক *এ্যালবামের* মতো এ নাটকের প্রারম্ভও একটি মেসঘরে :

> মেসঘর। মামুলি আসবাবপত্র।একখানা খাট ও তার গা-ঘেঁষে পড়ার টেবিল ও চেয়ার। টেবিলে বেশ কিছু বইপত্র গাদা করা আর টুকিটাকি জিনিস : যেমন তেলের শিশি, সাবানের কোটা ও আয়না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় শেভ করা শেষ করে ফেলেছে কবীর। অ্যাশট্রেতে একখানা জ্বলন্ত সিগারেট। (প্রথম দৃশ্য)

এ্যালবাম নাটকের প্রারম্ভিক অংশটিও লক্ষণীয় :

> মেসের কামরা। মোটামুটি সাজানো। পাশাপাশি দুখানা খাট ও খানদুয়েক চেয়ার। ইনামের টেবিলে কিছু বইপত্র ও একখানা টাইমপিস। একাধারে বইয়ের তাক। তাতে একগাদা বই। কাইউমের খাটের সঙ্গে ছোটোমতো টেবিল। তাতে চিরুনি, আয়না ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য! এককোণে দড়িতে কিছু কাপড়-চোপড় ঝোলানো। ঘরের একপাশে ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেস। দেয়ালে ক্যালেন্ডার। (প্রথম দৃশ্য)

মধ্যবিত্ত-মনস্তত্ত্বের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে এর বর্ণনাংশেও :

> আলিম এসে ঢোকে।...টেবিলে রাখা খোলা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ায়। তার দ্বিধাগ্রস্ততায় বোঝা যায় প্যাকেটটা কবীরের। (প্রথম দৃশ্য)

এ নাটকের সংলাপের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে নাট্যকারের সূক্ষ রসবোধ :

> আলিম : আচ্ছা ঠিক কী ধরনের প্রশ্ন করতে পারে বলে তোমার ধারণা।

Dhaka University Institutional Repository

কবীর : তা কি আর আগে থেকে বলা যায়। ওই যে বললাম - জেনারেল নলেজ । ধরো জিজ্ঞেস করল কয়লা থেকে কী করে হীরে হয়?

আলিম : সেটা জানলে কী আর চাকরি নিতে যেতাম। তুমিও যেমন। (প্রথম দৃশ্য)

মঞ্চ-নির্দেশনার ক্ষেত্রেও লেখক অসামান্য কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত এরূপ নির্দেশনা অসম্ভব।[১] দুটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

১. দ্বিতীয় দৃশ্যের পর আরো কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে– এ ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য ক্যামেরার সাহায্যে দ্রুত পরিবর্তনশীল তারিখ দেখানো যেতে পারে।

২. দ্বিতীয় দৃশ্যের পর আলিমের বয়স আরো দশ বারো বেড়েছে এটা বোঝানোর জন্য তার মেক-আপের দরকার হতে পারে। সে কারণে তৃতীয় দৃশ্য অবতারণার আগে সে মিনিট পাঁচেক সময় নেবে। সে সুযোগে মেক-আপ নেওয়া চলবে। কবীরের মেক-আপ নিতে অসুবিধা নেই।

---

[১] আনিস চৌধুরী নিজেও একসময় মঞ্চনাটকের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সৈয়দ হক লিখেছেন :

"কলকাতার পার্ক সাকার্সে মুকুলের মাহফিলের উদ্যোগে *সিরাজদ্দৌলা* নাটকে তিনি (আনিস চৌধুরী) সিরাজের ভূমিকায় নামেন, এটা লোহানির মুখে শুনেছি। আর লোহানির তো স্বভাবাই ছিল ঠাট্টা করা। লোহানি বলতেন সেই নাটক যখন চলছে, ঢিল এসে পড়লো আনিসের কপালে, একেবারে নবাবি উষ্ণীষের ওপর। ভাগ্যিস ঢিলটা ছিল কাগজের ! ঢিলটা কি লোহানিই ছুড়েছিলেন? এ কথার উত্তরে লোহানি বলতেন, এত ভালো অভিনয় করেছিল আনিস যে, ঢিল না ছুড়লে থামানো যেত না, তোমরা লেখক আনিসকে আজ না পেয়ে তাহলে পেতে অভিনেতা আনিসকে।" (উদ্ধৃত: *আনিস চৌধুরী : উপন্যাসসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১)

তবে এটিও সত্য যে, মঞ্চনাটকের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বলতে যা বোঝায়, তা সমকালীন অনেক নাট্যকারের মতো আনিস চৌধুরীরও ছিল না। বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেতা এবং নাট্যসমালোচক রামেন্দু মজুমদার লিখেছেন– "আমাদের দেশে বিশেষ করে পাকিস্তানি আমলে নাটকের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা ছিল, বেশিরভাগ নাট্যকারের-ই মঞ্চের সাথে কোনো যোগ ছিল না। নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যচর্চার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আকবরউদ্দীন, আনিস চৌধুরী, আব্দুল হক, আবু যোহা নূর আহমদ, আবুল ফজল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ইব্রাহীম খাঁ, ইব্রাহীম খলিল, ওবায়েদ-উল হক, বন্দে আলী মিয়া, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-ও মতো নাট্যকারদের মঞ্চের সাথে তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। এর ফলে আমাদের দেশে সাহিত্যের এ শাখাটি আশানুরূপ পল্লবিত হয়নি। মঞ্চের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকলে মঞ্চসফল নাটক রচনা করা বেশ কষ্টসাধ্য।" [উদ্ধৃত : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাটক : নাট্যান্দোলন, *বাংলাদেশের সাহিত্যের আলোচনা-পর্যালোচনা ওঅন্যান্য প্রবন্ধ* (প্রণব চৌধুরী সম্পাদিত), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ২৯০]

প্রত্যাশা নাটকে নাট্যকার আনিস চৌধুরী মধ্যবিত্তের সুস্থ মানসিকতাকে পরিস্ফুট করেছেন। আলিম, কবীর কিংবা শওকত– এরা সকলেই ব্যক্তিজীবনে স্বাভাবিকতার চর্চা করেছেন। তাদের জীবনে বিরাটের সাধনা কিংবা মহৎ হবার বাসনা হয়ত সফল হয়নি; হতাশা এবং ব্যর্থতাবোধ তাদের জীবনকেও নিঃসন্দেহে বিষাদময় করে তুলেছিল। কিন্তু এত কিছুর পরও মধ্যবিত্তের গতানুগতিকতার সঙ্গেই তাদের নিরন্তর বসবাস। মূলত আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্তের প্রতিচ্ছবি এটি।

ছায়া-হরিণ

ছায়া-হরিণ (১৯৬৮) আনিস চৌধুরীর একটি ব্যতিক্রমধর্মী নাটক। নাগরিক মধ্যবিত্ত-জীবনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এ নাটকের পূর্বাপর প্রবাহিত হয়েছে রহস্যময়তা। নাটকে হাসিনা-কবীর দম্পতির বাসায় বেড়াতে আসে হাসিনার কনিষ্ঠা ভগিনী ডালিয়া ও তার স্বামী ফারুক। তবে বোনের বাড়ি এসেও অবসর-যাপনের ফুরসত নেই ডালিয়ার। শ্বশুরালয়ের প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য তাকে সম্পন্ন করতে হয় 'একগাদা' কেনাকাটা।' নাটকের এক পর্যায়ে হাসিনার হাতের রুলি জোড়া দেখতে চায় ডালিয়া; কারণ এরই অনুকরণে সে তৈরি করবে আরেক জোড়া রুলি। ডালিয়া কেনাকাটার জন্য বাজারে গেলে হঠাৎ রুলি-জোড়া আর খুঁজে পায় না হাসিনা। কবীরের সন্দেহের বাণ নিক্ষিপ্ত হয় ডালিয়ার প্রতিই। হাসিনার নিকট সে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রতীকী-ব্যঞ্জনায় :

> কবীর : (কাগজ থেকে পড়ে শোনায়) দেখ না চাঁদপুরে ভদ্রবেশী এক চোর সিঁদ কেটে টাকা-পয়সা, অলঙ্কার নিয়ে উধাও।... আজকাল কে যে কী বোঝা যায় না।
>
> হাসিনা : তার মানে, কার কথা বলছ?
>
> কবীর : (চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে) না না কারো কথা বলছি না। (দ্বিতীয় পর্ব)

শুধু তাই নয়, হাসিনাকে ডালিয়ার ভ্যানিটি ব্যাগ তল্লাশির জন্য নির্দেশ দেয় কবীর এবং এক পর্যায়ে নিজেই লিপ্ত হয় এ কাজে। এ ঘটনায় মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে যায় ডালিয়া। কিন্তু তারপরেও স্বাভাবিকভাবেই সে বলে :

> আমার ব্যাগ ধরলেন কেন? বড় খুঁতখুঁতে স্বাভাব তোমার বরটির। কই কিছু বলছ না কেন? (তৃতীয় পর্ব)

কবীর অবশ্য তার সিদ্ধান্তে অনড়। তাই বাড়ির নতুন অতিথি ডালিয়ার স্বামী ফারুককেও প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকে সে। কবীরের এরূপ অসঙ্গত আচরণে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে ফারুক। এই পর্যায়ে তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তার অংশবিশেষ লক্ষণীয় :

কবীর : সোনার ভরি কত দেখলে?
ফারুক : (অতর্কিত প্রশ্নে বিব্রতবোধ করে) সোনার ভরি- কী জানি ?
কবীর : কী জানি মানে। সোনার দোকানে যাওনি।
ফারুক : হ্যাঁ, হ্যাঁ গিয়েছিলাম। ওর কী যেন অর্ডার দেবার ছিল। (তৃতীয় পর্ব)

মধ্যবিত্তের সন্দেহপ্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে উপর্যুক্ত সংলাপে। কবীর হাসিনাকেও বোঝাতে সক্ষম হয় যে, এ ঘটনার জন্য দায়ী তার বোন ডালিয়া। ফলে হাসিনাও একসময় ডালিয়াকে লক্ষ করে বলে– 'ছেলেমানুষি করিস না ডালিয়া। সংসারে মানুষের ইজ্জতটাই সব।' (তৃতীয় পর্ব)

এতসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যেও হাসিনা যেন অনেকটাই নির্বিকার। কবিরের সন্দেহ আর হাসিনার নির্বিকার উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে অতঃপর যা সংঘটিত হয় তা এককথায় বিস্ময়কর, নাটকীয়। নাটকের অন্তিম দৃশ্যে জানা যায়, বালাজোড়া ডালিয়া নেয়নি; বরং 'একটা পুতুলের গলায় সোনার বালাজোড়া' পরিয়ে দিয়ে খেলা করছিল কবীরেরই ছোট্টমেয়ে মিলি। এ-ঘটনার পর কবীর এবং হাসিনার মধ্যে সৃষ্টি হয় মানসিক দূরত্ব। মূলত মধ্যবিত্ত-সুলভ সন্দেহগ্রস্ততা কীভাবে একটি পরিবারের সুখ-শান্তি সমূলে বিনষ্ট করে, তা-ই প্রদর্শিত হয়েছে *ছায়া-হরিণে*। নাটকে দেখা যায়, মিলির কাছ থেকে মূল্যবান বালাজোড়া আবিষ্কারের পর হাসিনা সচকিত হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মানবোধ চাড়া দিয়ে ওঠে, হারিয়ে যাওয়া বালা প্রসঙ্গে স্বামী কবীরেকে সে বলে– 'বালা নয়, এগুলো তোমার সন্দেহ। আমি চলি।' (প্রাগুক্ত)

মধ্যবিত্ত সংসারের টানাপোড়েনের নানা অনাকাঙ্ক্ষিত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ নাটকেও। মধ্যবিত্তের সাধ আছে, কিন্তু রয়েছে সাধ্যের সঙ্কট। তাদের সাধ যদিও সামান্য, তবু তা পূরণ হয় না অর্থনৈতিক কারণে; এভাবেই ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে দেখা দেয় ব্যক্তিত্বের বিপর্যয়। কোনো শখ বাস্তবায়িত করতে তাদের বিসর্জন দিতে হয় আরেকটি শখ। হাসিনা এবং ডালিয়ার সংলাপের কিয়দংশ এ-প্রসঙ্গে বিবেচনাযোগ্য :

ডলিয়া : মেজআপা কানের এই সেটটা কিনলাম।

হাসিনা: হুঁ। ভালোই তো। তোর ওই সোনা ভাঙ্গিয়ে হাতের দুগাছা চুড়ি বানিয়ে নিলেই পারতি। (প্রথম পর্ব)

উচ্চবিত্তের পর্যায়ে নিজেকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণির আজন্ম স্বভাবজাত। এ নাটকে কবীরের মধ্যে রয়েছে মধ্যবিত্তের চিরচেনা এই প্রবৃত্তির প্রকাশ। পুরনো বন্ধু শওকতকে ব্যাংকের ম্যানেজার হিসেবে দেখতে পেয়ে তার মধ্যে জাগ্রত হয় বন্ধুসঙ্গ প্রাপ্তির বাসনা এবং এরপর সে লিপ্ত হয় সম্পর্ক-উন্নয়নের প্রচেষ্টায়। নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে এরকম হীন পন্থায় কবীর অর্জন করতে চায় সামাজিক মর্যাদা এবং যশঃগৌরব :

কবীর : তা তুমিও চলো। বসে কেন।
হাসিনা : (বইটা ভাজ করে হাই তুলে সোজা হয়ে বসে) কই যাব আবার।
কবীর : বাঃ, বললাম না, আজ এতদিন পর শওকতের সঙ্গে দেখা। (চিরুনিটা ব্যবহার না করে, রেখে দিয়ে কাছে এসে বসে) ওই যে, ব্যাংকে চেক ভাঙাতে গিয়েছিলাম। শওকত না-হলে রক্ষে ছিল? আমি কি জানি ব্যাটা হচ্ছে এখন ব্যাংকের ম্যানেজার।
হাসিনা : সেখানেই যাচ্ছ নাকি?
কবীর : হ্যাঁ মানে, এতদিন পরে দেখা। চা খেতে ডাকল নিজ থেকে। (দ্বিতীয় পর্ব)

ছায়াহরিণ নাটকে নাট্যকার আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচন করেছেন এবং একইসঙ্গে বলবার চেষ্টা করেছেন যে, মধ্যবিত্তের এ প্রবণতা মোটেই তার জন্য শুভ নয়; বরং মাত্রাহীন স্বার্থপরতা এবং সন্দেহগ্রস্ততা তার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পথে সৃষ্টি করে দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা। নাটকের শেষে শওকত এবং হাসিনার দাম্পত্যজীবনের যে অশুভ পরিণতি ইঙ্গিতায়িত হয়েছে– তা এ সত্যই ব্যাপকভাবে প্রকটিত করে।

যখন সুরভী

আনিস চৌধুরীর *যখন সুরভী* (১৯৬৯) একটি বেতার নাটক[১]। নাগরিক মধ্যবিত্তের বিকৃত মানসিকতা, জীবন-বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা এবং দাম্পত্য-সম্পর্কের টানাপোড়েন শব্দরূপ পেয়েছে এ-নাটকে। *যখন সুরভীতে* চরিত্র সংখ্যা মাত্র দুইটি : বরকত এবং কেয়া। সম্পর্কে এরা স্বামী-স্ত্রী। কেয়ার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে একরকম অবাধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল বরকত। ফলে নব্য প্রতিষ্ঠিত সাংসারিক জীবন তাকে এখন স্বস্তি দেয় না, বরং দুর্ভাবনায়

[১] আনিস চৌধুরীর রচিত *যখন সুরভী* নাটকের বেতার নাট্যরূপ প্রদান করেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।

নিক্ষেপ করে। এরই প্রতিফলে স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রাত্যহিক ব্যবহার হয়ে ওঠে ক্রমশ রুক্ষ। কেয়াকে লক্ষ করে সে স্পষ্ট বলেছে :

> আগের ছন্নছাড়া জীবনটাই অনেক ভালো ছিল। রাত করে ফিরতাম, দুপুর করে যেতাম, বেলা করে ঘুমোতাম। (পৃ.১৯১)

তাই স্ত্রীর রূপ কিংবা 'দৈহিক আমন্ত্রণ' কোনোটাই 'তার আকাশচারী মনকে বাঁধতে' পারে না। ফলত তাদের মধ্যে সূচিত হয় এক অশান্তিময় দাম্পত্য-জীবন। অল্পদিনের মধ্যেই বরকতের বন্ধুদের অনেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং বিবাহ-পরবর্তীসময়ে তাদের কেউ কেউ 'বউয়ের আঁচল ছেড়ে আর নড়তেই চায় না।' কিন্তু বাসার পরিবেশে বরকতই কেমন যেন খাপছাড়া। দাম্পত্যজীবনের যে মুহূর্তগুলো হতে পারতো সুরভিত, সেগুলোই হয়ে উঠল বিতৃষ্ণাপূর্ণ। দীর্ঘকালের ব্যবধানে হলেও একসময় জীবনবিতৃষ্ণ বরকত আকৃষ্ট হয় পারিবারিক জীবন-পরিসরের প্রতি। অতঃপর অকারণে সে রান্নাঘরে যায়, বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে অতিবাহিত করে অনেকটা সময়; বাইরে দাবা খেলতে যাবার পরিবর্তে ছুটির দিনেও সে ডুবে থাকে সংবাদপত্রে। আগের মতো ভিড়ে দাঁড়িয়ে সিনেমার টিকেট ক্রয় করবার ধৈর্য্যও সে হারিয়ে ফেলে। তাই একসময় স্ত্রী ও সংসার-বিচ্ছিন্ন জীবনকে পরমকাম্য বলে মনে করলেও পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে বরকত প্রত্যাশা করে স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা। একসময় স্ত্রীকে অবহেলা করলেও এ পর্যায়ে স্ত্রীর সঙ্গে চায়ের টেবিলে একত্রে বসে সে উপভোগ করতে চায় রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে কেয়ার মনোদৈহিক জগতেও সূচিত হয়েছে লক্ষণীয় পরিবর্তন। প্রেমতৃষিত অতৃপ্ত বরকত আশাহত চিত্তে তাই কেয়াকে বলে :

> ওই ছবির মতো না হোক, একদিন কি একটু সাজগোজ করে পরিপাটি হয়ে চায়ের টেবিলে বসে, মিষ্টি হেসে বলতে পার না কেয়া, তোমাকে ক'চামচ চিনি দেব? (পৃ.১৮৮)

নাটকে কেয়া বাস্তববাদী নারী। সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর আবেগহীন অতৃপ্ত দাম্পত্যজীবন যাপন করে এখন সে ক্লান্ত। অব্যাহত বঞ্চনা নষ্ট করে দিয়েছে তার জীবনাবেগ, নষ্ট করে দিয়েছে তার শ্রীময় জীবনভাবনা। অথচ সংসার রচনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে তার চোখে ছিল 'বসন্তের স্বপ্ন'; 'মনের অঙ্গনে নীড় বেঁধেছিল অনেক কুসুমিত আকাঙ্ক্ষা।' কিন্তু স্বামীর অব্যাহত বিরূপতার পরিপ্রেক্ষিতে কেয়ার কল্পনার জগৎ ক্রমশ হয়ে যায় সংকুচিত। প্রাসঙ্গিক এলাকা উদ্বৃতিযোগ্য :

> কেয়া : আজ কিন্তু সকাল-সকাল ফিরে এসো।

Dhaka University Institutional Repository

বরকত : কেন হঠাৎ?

কেয়া : এমনি, একটু বাইরে যাব।

বরকত: (হাসি) ও, তাই বলো, আমি ভেবেছিলাম না জানি কী? তা আজ তো পারবো না।

কেয়া : পারবে না কেন?

বরকত : মানে একটু সিনেমায় যাব ঠিক করেছিলাম। পুরনো বন্ধু হঠাৎ ধরে বসল কিনা, তাই।

কেয়া : ও। (পৃ.১৮৯)

এরপর কেয়া সংসার-সীমানায় আস্তে-সুস্থে বরকত-বিচ্ছিন্ন এক পৃথক পরিমণ্ডল তৈরি করে। ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ধীরে ধীরে বিসর্জন দিতে শুরু করে সে। স্বামীর সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া কিংবা কোথাও অলস মুহূর্ত কাটিয়ে আসবার চিন্তা পরিত্যাগ করে সে মনোযোগী হয় প্রাত্যহিক গৃহকর্মে। এরপরও স্বামীর নিকট থেকে সামান্যতম মানবিক ব্যবহার অর্জনে ব্যর্থ হয় সে। কেয়ার কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষারই ইতিবাচক মূল্যায়ন সে করে না। এমনকি নতুন পর্দা তৈরি করে কেয়া যখন তাদের বাসগৃহ সুসজ্জিত করতে চায়, তখনও বরকত স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষার প্রতি প্রদর্শন করে শীতল নিস্পৃহতা :

বরকত : বেশ তো ছিল। হঠাৎ পালটানোর সখ হলো কেন?

কেয়া : (বাস্পাচ্ছন্ন হয়ে) কী বললে?

বরকত : না বললাম, আগেরগুলোই তো চলে যাচ্ছিল।

কেয়া : মনের মতো করে সাজাব। তুমি চাও না?

বরকত: দেয়াশলাইটা কোথায় যে রাখলাম। ...

কেয়া : কেন আজও কি রাত করে ফিরবে নাকি?

বরকত : হ্যাঁ, তা কথায় কথায় এত কৈফিয়ত চাইছ কেন? একটু তাস পিটতে যাব এই যা–

কেয়া : ও (পৃ. ১৮৯-১৯০)

এভাবে কেয়ার জীবনের ছোটো-বড়ো ইচ্ছাকে প্রায়শ অবমূল্যায়ন করেছে বরকত। কখনও নিরুৎসাহিত করে, কখনও ভয় দেখিয়ে তার স্বাধীন জীবনযাপন ব্যাহত করেছে। স্বামীর প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহার্দ্র মমতা, সহানুভূতিশীল আচরণ থেকে বঞ্চিত হতে হতে কেয়ার অনুভূতিশীল সত্তা অনেকটা নিস্তেজ হয়ে আসে। তাই অকস্মাৎ স্বামীর পরিবর্তিত জীবনধারা তার চেতনালোকে কোনো ইতিবাচক বোধ তৈরি করে না। স্বামীর প্রণয়েচ্ছা তাকে আন্দোলিত করে না, বরং অস্বস্তিতে সমর্পিত করে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনপরিসরে অব্যাহত বিরোধ-বিরূপতাও বুঝি কাম্য নয় কেয়ার। সারাজীবন যে সুখময় দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন সে অন্তরলোকে লালন করেছে তারই প্রভাবে সে অবশেষে বরকতের পরিবর্তিত জীবনকে

Dhaka University Institutional Repository

যথাযথভাবে মূল্যায়নে সক্ষম হয়েছে। নাটকের শেষাংশে তাই দেখা যায়, স্বামীর গতানুশোচনা ও নবতর উপলব্ধি কেয়াকে প্রদান করেছে সহজ-সুন্দর ও প্রীতিস্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন :

বরকত: সত্যিই ওই ছবির মতোই তুমি আজও সুন্দর।
কেয়া: তোমার পাশে বলেই সুন্দর। ...
বরকত: কেয়া।
কেয়া: কী ?
বরকত : আবার বোধ হয় জীবন ফিরে পেলাম।
কেয়া: আমারও তাই মনে হয়।
বরকত: উহু !
কেয়া: কী হলো।
বরকত : কিছু না। ভালো লাগছে। (পৃ.১৯৫-১৯৬)

যখন সুরভী নাটকের ভাষা অনুভূতিগীতল, কবিতাময়। সংলাপনির্মাণে নাট্যকার প্রয়োগ করেছেন আলংকারিক শব্দ কিংবা বাক্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মর্তব্য :

১. প্রজাপতির ডানার মতো ভ্রুকুটি কাঁপিয়ে আবেগে উৎসারিত হতো সেই কেয়া আজ কোথায় ? (পৃ. ১৮৫)
২. স্থির আকাশের মতোই কি এর অবস্থান? অবিচল পাহাড়ের মতোই কি এর অটল গাম্ভীর্য ? (পৃ. ১৮৫-১৮৬)
৩. তবু শুধু জ্বলতে থাকে এ চোখ দুটো। শ্বাপদের চোখের মতো। (পৃ. ১৮৬)
৪. এ কেমন শীতের আর্তি, যা আমার মনকে বরফের মতো জমাট শীতলতার অচেতন অনুভূতিতে ডুবিয়ে ফেলেছে। (পৃ. ১৮৮)
৫. বরং কাঠগড়ায় দোষী আসামীর মতো মুখ নিচু করেই থাকল। (পৃ. ১৯০)
৬. সত্যি ওই ছবির মতো তুমি আজও সুন্দর। (পৃ. ১৯৫)
৭. সেই এক যুগ আগেকার ফ্রেমেবাঁধা ছবির মতো একটি মেয়ে, তার মন-সায়র থেকে জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। (পৃ. ১৯৫)

বিভাগোত্তরকালেই শুধু নয়, আনিস চৌধুরীর সমগ্র নাট্যকর্মের মধ্যে *যখন সুরভী* একমাত্র রোমান্টিকতাসমৃদ্ধ নাটক। মধ্যবিত্তের মনোবিকৃতি এ নাটকে উপস্থাপিত হলেও সবচেয়ে বেশি মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রেম। আনিস চৌধুরীর অধিকাংশ নাটকে অভাব-দারিদ্র্য, হতাশা-যন্ত্রণা কিংবা বঞ্চনার চলচ্ছবি প্রদর্শিত হলেও এ-নাটকে সে-চিত্র লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। তাই বলা যায় আনিস চৌধুরীর নাট্যভুবনে *যখন সুরভী* উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা-উত্তরকালের নাটক

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে বিষয় ও শিল্পরূপে সূচিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। এসময় অধিকাংশ নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ অবলম্বনে নাটক নির্মাণে মনোযোগী হন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সঙ্গে ধ্বস্ত-ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত-রক্তাক্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি এসময়ের নাটকে প্রতিবিম্বিত হয় ব্যাপকভাবে। অথচ যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী এই সময়পরিসরে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে দৃষ্টিকটুভাবে অনুপস্থিত আনিস চৌধুরী। এর কারণ, তিনি তখন বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত জীবনযাপন করছিলেন পাকিস্তানের করাচিতে। জীবননাট্যের এই সংশয়াকুল পরিস্থিতিতে নৈরাশ্যে সমর্পিত না হয়ে তিনি বিবিধ প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন ১৯৭৩ সালে। রেডিও পাকিস্তানের করাচি কেন্দ্রে অবস্থানের কারণে ১৯৭০–১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আনিস চৌধুরী বাংলাদেশের নাট্যজগতে ছিলেন অনুপস্থিত। ১৯৭৪ সাল থেকে নতুন উদ্যমে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন তিনি ।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আনিস চৌধুরী মঞ্চের পরিবর্তে বেতার ও টেলিভিশনের জন্য নাটক রচনায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। এসময়ে তাঁর রচিত নাটকগুলো প্রচারমাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আনিস চৌধুরী বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। এ কারণে হয়তো গণমাধ্যমের দিকেই তার মনোযোগ এবং আকর্ষণ ছিল বেশি। এর ফলে বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে তাঁর যে সম্ভাবনা ছিল, তা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রামেন্দু মজুমদার স্পষ্টত বলেছেন–

> তিনজন নাট্যকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল। এরা হচ্ছেন নুরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ ও আনিস চৌধুরী। কিন্তু এঁদের কেউ স্বাধীনতার পর মঞ্চের জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু সৃষ্টি করেননি।[১]

[১] রামেন্দু মজুমদার, স্বাধীনতা-উত্তরকালের নাটক, উদ্ধৃত : মোবারক হোসেন (সংকলিত ও সম্পাদিত), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৭৭-১৯৭৯), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৬

তবে চাকরিজীবনের শেষপর্যায়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে চুক্তিভিত্তিক চাকরির সুবাদে আনিস চৌধুরী যে বিরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার ফলে তিনি হয়ে ওঠেন মঞ্চাভিমুখী। এসময় রেডিও-টেলিভিশনের জগৎ ছেড়ে তিনি পুনরায় যুক্ত হতে চেয়েছেন মঞ্চনাটকের সঙ্গে। কিন্তু মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবতায় অপূর্ণ থেকে যায় তাঁর অন্তিম ইচ্ছা। নাট্যজন আতাউর রহমান এ-প্রসঙ্গে বলেছেন–

> তাঁর সব অভিমানকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সম্প্রতি আমাদের মঞ্চের সাথে যুক্ত হতে শুরু করেছিলেন। আমাদের মঞ্চের বিভিন্ন প্রযোজনা দেখে তিনি খুশি হতেন, অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন এবং কোনো বিষয়ে একমত না হলে তাও যুক্তি দিয়ে, ভদ্র অথচ স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে বলতেন।...আমাদের মঞ্চের জন্য নতুন নাটক লেখার কথাও উনি গভীরভাবে ভাবছিলেন।... সেই সময় আর তাঁর হলো না।[১]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত আনিস চৌধুরীর নাটকগুলোর মধ্যে *যেখানে সূর্য (১৯৭৪), চেহারা* (১৯৭৯), *তবু অনন্য, নীল-কমল* (১৯৮৬), *তারা ঝরার দিন, বলাকা অনেক দূরে, রজনী* অন্যতম। এছাড়া এসময় রচিত হয় তাঁর *যাতায়াত, শেষ সংবাদ, গন্তব্যে যাবো, এবং হাইজ্যাকার* নামক নাটক। লক্ষণীয় যে, নাগরিক মধ্যবিত্তের বিভিন্নমাত্রিক জটিলতা ও পঙ্কযাত্রা এ নাটকগুলোরও বিষয় হয়েছে। কেননা স্বাধীনতা-উত্তরকালেও বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণি উদ্বেগহীন নিশ্চিন্ত সামাজিক অবস্থান নিশ্চিত করতে পারেনি। বরং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়–

> আধাসামন্ত শ্রেণীর ক্ষুদ্রকায় ভূস্বামী, মুৎসুদ্দি ও আমলাতন্ত্রের এমন এক ত্রিমূর্তিরূপ, মহিমায় ও শক্তিতে... ক্রমেই স্ফীতকায়। এদের ভোগবিলাসের মান, বিশেষ করে শেষোক্ত দুই নাগরিক শ্রেণীর, ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। অতিসংকীর্ণ পরিধিতে অতিমাত্রায় ধনসঞ্চয় এবং তার আনুষঙ্গিক কারণের চাপে শহরবৃত্তের প্রধান জনসমাজ মধ্যবিত্তের বৃহদংশ (উচ্চতর স্তরে উন্নীত ভাগ্যবান বাদে) ক্রমেই নিম্নতর শ্রেণীতে (প্রচলিত দ্রব্যমূল্য ও ক্রয়ক্ষমতার বিচারে) অবতরণ করতে বাধ্য হচ্ছে ; নিম্নবিত্ত ঠাঁই নিতে চাইছে বিত্তহীনের স্তরে। আর এই অবস্থার বিচারে বিত্তহীন ও শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্কট সহজেই অনুমেয়।[২]

যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের অভাব-তাড়িত মধ্যবিত্তের জীবনাচার আনিস চৌধুরীর এ পর্যায়ের নাটকের অন্যতম প্রধান বিষয়-উপাদান হলেও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অহংবোধ অভিনব মাত্রা

---

[১] সাময়িকী *দৈনিক সংবাদ* ১৫ নভেম্বর ১৯৯০

[২] আহমদ রফিক, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি, উদ্ধৃত: মোবারক হোসেন (সংকলিত ও সম্পাদিত), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৭৭-১৯৭৯), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

পেয়েছে। তবে বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে নাটক রচিত হলেও স্বাধীনতা-উত্তরকালে আনিস চৌধুরীর নাটকগুলোর আকার-প্রকার ছিল পূর্বের তুলনায় ছোটো। এর কারণ সম্ভবত বেতার-নির্দিষ্ট সময়পরিধির স্বল্পতা। বলাবাহুল্য, এর ফলে নাটকে উপস্থাপিত ঘটনাংশ হয়ে ওঠে দ্রুততা-আক্রান্ত এবং শিল্পমানও হয় ব্যাহত ও বিপর্যস্ত।

যেখানে সূর্য

স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত আনিস চৌধুরীর প্রথম নাটক *যেখানে সূর্য* (১৯৭৪)। এটি এক মধ্যবিত্ত যুবকের জীবনসংগ্রামের কাহিনি। নাটকের প্রধান চরিত্র কবীর একজন সম্ভাবনাবঞ্চিত বেকার যুবক; যে তার মামার আশ্রয়ে লালিত। পরাশ্রয়ী জীবনের যাতনা সে অনুভব করে সর্বক্ষণ। তদপুরি আশানুরূপ কোনো চাকরি অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় সে নিমজ্জিত হয় হতাশায়। নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যে এরূপ চিত্র লক্ষ করা যায় :

> দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে একপাশে মোড়ায় বসে কবীর। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ। কিছুটা উদাস দৃষ্টি।... বোঝা যায় চিন্তাগ্রস্ত। (প্রথম দৃশ্য)

বারবার লক্ষ্য পরিপূরণে ব্যর্থ কবীর এক পর্যায়ে হারিয়ে ফেলে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা। 'কোনো কিছুর প্রতিবাদের সাহস' হয় না তার। ফলত মামা মোবারক এবং মামী নাসিমবানুর সকল প্রকার নিগ্রহ সে সহ্য করে অবলীলায়। চাকরিক্ষেত্রে উপর্যুপরি ব্যর্থতা এবং মামা-মামীর কটুবাক্য একসময় কবীরকে নিক্ষেপ করে বেদনাময় জীবনবিন্দুতে :

> পায়ের ওপর পা তুলে কদিন চলবে শুনি। চাকরি কেউ তো আর সেধে দেয় না। কী হলো ইন্টারভিউয়ের? (প্রাগুক্ত)

এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই কবীরের কাছে; বরং তার হয়ে জবাব দেয় মামাতো বোন রুবী :

> হয় না কারণ চাকরির জন্যে যেরকম তোষামুদি দরকার তা সবাইকে দিয়ে হয় না। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

অবশেষে স্থির হয় কবীর আপাতত মোবারক সাহেবের প্রতিবেশী কাসেমের শিকার-সঙ্গী হবে। কাসেমের উচ্চারিত উক্তিটি লক্ষ্যযোগ্য–

> সাজ-সরঞ্জাম, এটা-সেটা দেখাশুনা করা। কাজ কী আর একটা।...আমার সঙ্গে থাকবে খাবে-দাবে। চিন্তার কী। (প্রাগুক্ত)

এভাবেই মধ্যবিত্ত যুবকের সামাজিক মর্যাদাবোধকে করা হয় গ্লানিবিদ্ধ এবং ক্ষতবিক্ষত। নাটকে কবীরকে সম্পাদন করতে হয় মোবারক সাহেবের বাসাবাড়ির সকল প্রকার কাজ। যেমন : গ্রাম থেকে জমিজমার খাজনা বাবদ টাকা সংগ্রহ করা, লন্ড্রি থেকে কাপড় আনা, সিনেমা হলের টিকিট কাটা, ছোটবোন রীনাকে কলেজে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। অতঃপর একদিন মোবারকের হাতে আসে কবীরের চাকরির চিঠি– বেতন 'একশ দশ টাকা, সর্বসাকুল্যে একশ পঁচিশ। মফস্বলে ট্যুরে গেলে যাতায়াত ভাড়া আলাদা।' (চতুর্থ দৃশ্য) কিন্তু কবীরের এ-চাকরিপ্রাপ্তিকেও সহজ ভাবে মেনে নেয় না মোবারক-নাসিম দম্পত্তি। কারণ–

> এতদিন যাও দুটো কথা শুনতো, এখন বাছাধন হাতের নাগালের বাইরে। (প্রাগুক্ত)

অবশেষে মোবারক সাহেব চাকুরিতে কবীরের নিয়োগপ্রাপ্তির সংবাদটি গোপন রাখেন এবং কৌশলে তাকে পাঠিয়ে দেন 'দেশের বাড়ি'তে। এই পর্যায়ে তার প্রতি মামা-মামির আচরণও অনেকটা পাল্টে যায়। তারা কবীরের প্রতি হয়ে ওঠেন অনেক বেশি সদয়। তাদের এই পরিবর্তিত আচরণ সহজভাবে মেনে নিতে পারে না কবীর। সবকিছু তার কাছে ভীতিকর ও রহস্যময় মনে হয়। অবশেষে একদিন গ্রাম থেকে ফিরে আসবার পর সে এর কার্যকারণ নির্ণয়ে সক্ষম হয়। সে বুঝতে পারে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে কবীরকে চাকরিতে যেতে দেয়নি তারা। অনন্যোপায় কবীর মামা-মামীর প্রস্তাব মেনে নিলেও তার মনে জাগ্রত হয় একটি বাস্তবকঠিন প্রশ্ন – 'তাহলে কি কোনোকালেই চাকরি করে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো না?' (ষষ্ঠ দৃশ্য)

নাটকের সপ্তম দৃশ্যে মোবারক সাহেবের বাড়িতে আবারও আসে প্রতিবেশী কাসেম; সঙ্গে তার পোষা কুকুর টাইগার। কিন্তু কথা না শোনার কারণে টাইগারকে উপর্যুপরি চাবুক মারে কাসেম। এরপর চলে যায় টাইগার। এ দৃশ্যসূত্রে রুবী এবং রীনার যে সংলাপ, তা ইঙ্গিতবহ এবং কবীরের যাপিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ :

> রীনা : দেখলি আপা। চোখের সামনে কী হয়ে গেলো। এতদিনের পোষা কুকুরটা কেমন করে চলে গেল।
>
> রুবী : (একনজর কবীরকে দেখে নেয়। কবীর তখনো পায়চারি করছে) কুকুরের ধৈর্যের সীমা আছে রীনা। কোনো কোনো মানুষের তাও নেই। (সপ্তম দৃশ্য)

নাটকের অষ্টম দৃশ্যে দেখা যায়, মোবারক সাহেবের পোষ-মানা ভাগ্নে কবীরও অবশেষে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। সে নাসিমবানু ও মোবারক সাহেবের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যাত্রা করে আলোকিত জীবনের সন্ধানে। এ যাত্রা আন্দোলিত করে রুবীকেও :

> আগামী দিনের হাতছানি তাকে ডাকছে। ও আলোর মিছিলে যাবে। হয়তো সেখানে যাবার আমন্ত্রণ আমারও একদিন আসবে। নিশ্চয় আসবে। (অষ্টম দৃশ্য)

মোবারক এবং নাসিমবানুর জ্যেষ্ঠা কন্যা রুবী। পড়ালেখা এবং গৃহকর্ম– উভয়ক্ষেত্রে সে সমান পারদর্শী। তবে এসবের উর্ধ্বে তার যে পরিচয় এ নাটকে প্রকটিত হয়েছে তা হলো মানবিকতা। পুরো সংসার যখন কবীরকে শোষণ করতে ব্যস্ত, তখন রুবীই ছিল তার একমাত্র সহায়। চাকরিক্ষেত্রে কবীরের বারবার ব্যর্থতা তাকেও করে তোলে উদ্বিগ্ন। কবীরের অসফলতার কারণ সে চিহ্নিত করে এভাবে :

> তুমি ইন্টারভিউতে যাও–ও কেমন গবেটমার্কা হয়ে। কই একটু সেজেগুজে ধোপদুরস্ত হয়ে যাবে, তা না। মানে, রাগ করো না, পোশাক-আশাকটা একেবারে ফেলনা নয় আজকাল। কী হয় একটা টাই-ফাই লাগিয়ে গেলে।' (প্রথম দৃশ্য)

কবীরকে উজ্জীবিত করতে তার উৎসাহের কমতি নেই। ইন্টারভিউ থেকে নিরাশ হয়ে কবীর তার সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে ফেললে রুবী তা কুড়িয়ে আনে এবং রসিকতার সঙ্গে বলে :

> জানো মুখে যাই বলি, পুরুষ মানুষকে সিগ্রেট খেতে না দেখলে কেমন যেন মানায় না। আনিয়ে দিই? (প্রাগুক্ত)

কবীরকে বিভিন্ন সময় আর্থিক সহযোগিতা দেয় রুবী। আবার তার মা নাসিমবানু কবীরের যোগ্যতা সম্পর্কে কটূক্তি করলে সে প্রতিবাদ করে এবং বলে– 'কোয়ালিফিকেশনের সংজ্ঞা সমাজে অনেক পালটে গেছে মা।' (প্রাগ্রক্ত)

মূলত কবীরের প্রতি ছিল রুবীর চিত্তজাগতিক দুর্বলতা। নাটকে দেখা যায়, রুবী নিজের আঁচল দিয়ে বাতাস করে কবীরকে, দুহাত দিয়ে গভীর আবেগে লাগিয়ে দেয় শার্টের বোতাম। তবে কবীর জানে তাদের এ সম্পর্কের পরিণতি অনিশ্চিত ও অশুভ। কিন্তু এ-ব্যাপারে রুবীর আত্মবিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। প্রাসঙ্গিক সংলাপ উদ্বৃতিযোগ্য :

> কবীর : সময় সবকিছুকেই সয়ে নেয়। তাছাড়া ততদিনে তোমার বিয়ে-থা হয়ে যাবে।
>
> রুবী : কথাটা ইচ্ছে করেই খুব সহজভাবে বললে, তাই না?
>
> কবীর : সহজ করে নেওয়াটাই কি ভালো নয়?
>
> রুবী : সহজভাবে বলা আর সহজ করে নেওয়া কি এক কথা হলো। (প্রাগুক্ত)

নাটকে মোবারক হচ্ছেন কবীরের মামা। তার আচরণে ও কর্মসূত্রে প্রদর্শিত হয়েছে মধ্যবিত্তের স্বার্থঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। চাকরিতে যোগদান না করে কবীর গ্রামে গিয়ে তাঁর জমির খাজনা সংগ্রহ করুক–এটিই চান মোবারক। তার কারণেই একটি ভালো চাকরি পেয়েও তাতে যোগ দিতে

পারেনি কবীর। তবে একসময় ভাগ্নের প্রতি নানা অবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজেও ভোগেন অপরাধবোধে; কিন্তু স্ত্রীর অপকৌশলের কাছে হার মানে তার বিবেকবোধ :

> মোবারক : কী যা-তা বলছ। মুখে যাই বলি, ছেলে অমন নয়। তাছাড়া অবাধ্য হবে কী করে। মুখ ফুটে কথা বলতে শুনেছ কোনদিন। (কী ভেবে) চাকরির কথাটা জানিয়ে দিলেই হতো। খামোকা...
> নাসিম : না না, ওসব ফিন্দি-ফিকির আবার ঢুকিও না মাথায়। যা একজন দেখাশোনার, তাও থাকবে না। চাকরি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

মোবারকের আত্মীয়স্বজনের প্রতি নাসিমবানু বরাবরই প্রদর্শন করে তীব্র বিরূপতা। আত্মীয়তার কোনো উষ্ণতাই তার ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয় না। নাগরিক রুচির অধিকারী হলেও নিজের ব্যক্তিগত জীবন-বৃত্তের বাইরে কোনো কিছুই ভাবতে নারাজ সে। তাই বাড়ির অতিথি কাসেমের নিকট সে অকপটে বলেছে :

> আর একজন তো নয়। এক রাজ্যের মানুষ। দেশের আত্মীয়-স্বজনরা তো লেগেই আছে। আজ এটা, কাল ওটা। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

কবীর এবং রুবীর সম্পর্ককে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি নাসিমবানু। মূলত তার কারণেই কবীরের জীবনে নেমে আসে দুঃখের অমানিশা।

এ নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কাসেম। পশুশিকার কাসেমের শখ। শিকারের মোহে জীবনের মধ্যবয়সে এসেও বিবাহ করবার ফুরসত হয়নি তার। জগতের সকল কিছুই সে জয় করতে চায় 'বন্দুকে'র শক্তিতে। বেকার কবীরকে সে নিযুক্ত করতে চায় তার শিকার-যাত্রার সহযোগী হিসেবে। কিন্তু এ-নিয়ে রুবী তার সঙ্গে অবতীর্ণ হয় বাকযুদ্ধে। বিষয়টিকে স্বাভাবিক করতে মোবারক তার কন্যার অবাধ্যতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে সে বলে–

> আমার বাড়িতে ওসব নেই। বিয়ে করিনি ঠিক, কিন্তু আমার কথার ওপর টুঁ-শব্দ করার কারো সাহস নেই। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

নাগরিক কৃত্রিমতা এবং অহংবোধ কাসেমকে করেছে অমানবিক। তিনি সেই মৃত্তিকা-বিচ্ছিন্ন মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধি যিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন নিজের আভিজাত্য প্রদর্শনে। 'একদিকে নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা– শিক্ষা, সংস্কৃতি ভদ্রতা ও রুচির দেয়াল তৈরি করে কায়িক শ্রমনির্ভর মানুষের থেকে নিজেদের আলাদা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা, অন্যদিকে বিত্তবান শ্রেণীতে যে-কোন উপায়ে অনুপ্রবেশের আকুলতা এদের মজ্জাগত। অভিজাত শ্রেণীর কৃত্রিম আচার-আচরণ, বিশেষত বিদেশীদের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির অনুকরণ-প্রবণতা এ

শ্রেণীর একাংশের মধ্যে প্রকট। বলা যায়, আধুনিকতা ও প্রাচীনত্ব তথা সামন্ত-সংস্কৃতি ও আধুনিক সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে বাংলাদেশের এ সমাজ-মানুষ সবসময় আন্দোলিত।'[১] এ-নাটকে নাগরিক মধ্যবিত্তের সার্থক প্রতিনিধি কাসেম।

কাসেম যথার্থই নির্দয় ও পাষাণ প্রকৃতির চরিত্র। তার পোশা-কুকুর 'টাইগার' তার কথায় সায় না দিলে সে অবলা পশুটিকে চাবুক মেরে প্রহার করে। ড্রাইভার আব্দুল বারবার অনুরোধ করেও তাকে এ-কাজে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়। নাটকে কাসেমের প্রতি উপর্যুপরি ব্যঙ্গবাণ প্রয়োগ করেছে মোবারকের ছোট মেয়ে রীনা। নিজের শিকারনৈপুণ্য নিয়ে কাসেম যখন তৃপ্তিমগ্ন এবং অহমিকায় আচ্ছন্ন, তখন রীনা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তাকে বলে– 'তাহলে জঙ্গলের বাঘ-ভল্লুকদের দুর্দিন আসন্ন বলুন।' (প্রাগুক্ত)

এ কথা নিদ্বির্ধায় বলা যায়, নাটকে কবীরের যে বেদনা-বিপর্যয় তার দায় কেবল তার একার নয়; বরং তাকে ঘিরে নগরমানসের জটিল-কুটিল প্রবণতাই অনেকাংশে দায়ী। স্বার্থপর নাগরিক জীবনপরিসরে সরলপ্রাণ মানুষরা কীভাবে প্রতারিত হয় তা কবীরের অবস্থাসূত্রে এ-নাটকে শিল্পরূপ অর্জন করেছে। অবশ্য শেষাবধিসমস্ত প্রতিকূল-পারিপার্শ্বিকতা মোকাবেলা করে কবীর তার মধ্যবিত্তসুলভ দোদুল্যচিত্ততা জয় করে নিয়েছে এবং অগ্রসর হয়েছে নবজীবনের সন্ধানে।

চেহারা

চেহারা[২] (১৯৭৯) আনিস চৌধুরীর একটি জীবনঘনিষ্ঠ নাটক। এর কাহিনি ও চরিত্র বাস্তবজীবন থেকেই গৃহীত; 'কোনো চরিত্রই দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নয়। সচরাচর যাদের দেখি, যাদের সঙ্গে কথা বলি তেমনি সব চরিত্র।'[৩] নাগরিক মধ্যবিত্তের বিচিত্র

---

[১] মুহম্মদ ইদরিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যেমধ্যবিত্ত শ্রেণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[২] *চেহারা* নাটকটি ৩ জুলাই, ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রথম অভিনীত হয় । তখন এ নাটকে অভিনয় করেন আবুল হায়াত, আফজাল হোসেন, রাইসুল ইসলাম আসাদ, দেলয়ার হোসেন দিলু, আলি ইমাম, সুবর্ণা মুস্তাফাপ্রমুখ বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী। নাটকটি প্রযোজনা করেন আতিকুল হক চৌধুরী। পরবর্তীকালে মঞ্চোপযোগী করবার জন্য নাটকের স্থানবিশেষে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৭৯ সালে মুক্তধারা নাটকটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।

[৩] আনিস চৌধুরী, *চেহারা*, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৯, পৃ. ৭৪

অসঙ্গতি প্রতিফলিত হয়েছে এ নাটকে। বিশেষত গ্রামীণ জীবনপরিসর থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত শ্রেণি শাহরিক পরিমণ্ডলের নিষ্প্রাণ-আবহে কীভাবে নিঃশেষিত হয়, তারও সফল রূপায়ণ রয়েছে এখানে।

চেহারা নাটকে নাগরিক উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি ইফতেখার। একটি কনসালটেন্সি ফার্মের স্বত্বাধিকারী তিনি। কাজের চাপে শুধু অফিস নয়, বাড়িতেও তাঁকে শ্রম দিতে হয় যথেষ্ট। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ তাঁর কাছে সর্বোচ্চ। তাই তিনি একপর্যায়ে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী শওকতকে বলেছেন :

> এক পার্সেন্ট এদিক সেদিক হলে বিজনেস হবে কি দিয়ে। (আবার ফাইল দেখে) এ ফিগার 'কোট' করতে বলল কে। না তোমাকে দিয়ে হবে না। (প্রথম দৃশ্য)

কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর হলেও ইফতেখারের রয়েছে একটি কোমল মন। সাহিত্য-প্রিয় ইফতেখার কবিতা লিখতেন একসময়। আশ্রিত-আনুর প্রতি যথেষ্ট সহৃদয় তিনি। চৌর্যবৃত্তির অভিযোগে হেডক্লার্ককে প্রথমে বরখাস্ত করলেও তার পরিবারের দুর্দশার কথা চিন্তা করে তিনি তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করেন। নাগরিক জীবন-পরিসরে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করলেও চরিত্রটি অনেকটাই মৃত্তিকাকাতর। তাই আধুনিক নাগরিক সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি আসক্তি থাকলেও তিনি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন প্রকৃতি ও নিসর্গবেষ্টিত গ্রামীণ জীবন ও জনপদের প্রতি। শাহরিক জীবন যে বড়োবেশি কৃত্রিম ও স্বার্থঘনিষ্ঠ তা তিনি আরও প্রবলভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তাঁর অসুস্থদশায়। এ-সময়ে তাঁর মনে হয়, তাঁর জন্যে ব্যয় করার মতো সময় কারও অবশিষ্ট নেই। স্ত্রী সকিনাকে লক্ষ করে তাই তিনি বলেন–

> যারা আমার অফিসে আসত, বাড়িতে ধাওয়া করত ... কারও ছুটি নেই? আমার যে এত অফুরন্ত ছুটি। (পঞ্চদশ দৃশ্য)

চেহারা নাটকের অন্যতম চরিত্র চর কাসিমপুর গ্রামের হাজিপাড়ার অধিবাসী বাদশা মিয়ার পুত্র আনওয়ার আহমদ ওরফে আনু মিয়া। গ্রামবাংলার সহজ, সরল ও প্রাণবন্ত তারুণ্যের প্রতিনিধি আনওয়ার। তার মেধা আছে কিন্তু অর্থ নেই। 'লেখকের বক্তব্য' অংশে নাট্যকার বলেছেন :

> আনওয়ার বিবর্তনশীল চরিত্র। প্রথমে বিস্ময়াভিভূত এবং বিব্রত। ক্রমান্বয়ে আত্মবিশ্বাস লাভে সমর্থ। চরিত্রে আক্রমণাত্মক মনোভাব তুলে ধরা অবাঞ্ছনীয়।[১]

[১] আনিস চৌধুরী, *চেহারা*, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

বিগত বন্যায় সর্বস্ব হারিয়ে অসচ্ছল গ্রামীণ নিম্ন-মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি বাদশা মিয়া যখন রিক্ত-প্রায়; তখন আনুর পড়ালেখার খরচ যোগাতে ব্যর্থ হয়ে সে সন্তানকে পাঠিয়ে দেয় ইফতেখারের কাছে। এ-পর্যায়ে মাত্র একটি শার্ট পরিধান করে তাকে যাপন করতে হয় দিনের পর দিন। কঠিন জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে অব্যাহত রাখতে হয় নিয়মিত জ্ঞানসাধনা। পড়ালেখার পাশাপাশি গ্রামের বাড়িতে আর্থিক সহযোগিতাদানের জন্যে গৃহশিক্ষকতাও করতে হয় তাকে। কিন্তু ইফতেখারের পরিবারের আনুকূল্য অর্জনে ব্যর্থ হয় আনু। ফলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় আনু। ইফতেখারের সংসারে আনুর অমানবিক জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করে এ বাড়ির অতিথি সাহানা আনুকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে– 'ওই বাড়ির লোকেরা আপনাকে মানুষ মনে করে না।' কিন্তু এতদ্বিষয়ে আনুর ছিল না কোনো অভিযোগ-অনুযোগ। সে নির্দ্বিধায় বলে :

> কেউ চাপায় নি। চাকর-বাকরদের রাতদিন ফুট-ফরমাশ খাটতেই হয়। আমিই বলে কয়ে নিলাম। ... তাছাড়া বুঝলেন না, খাই দাই থাকি যখন, একটু করলামই। তাতে নিজেরও তৃপ্তি। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

নাটকে ইফতেখারের পুত্র তারেক দাগী আসামী। হঠাৎ 'বড়লোক' হওয়ার নেশায় সে জড়িয়ে পড়ে অন্ধকার জগতে। কিন্তু মাঝপথে এসে দেখে–

> তরী ভেড়ানোর উপায় নেই। চাইলেও ফিরতে দেবে না ওরা। (অষ্টম দৃশ্য)

তাই নিজের ঘরেও তার আশ্রয় নেই; ঘুরে বেড়ায় ভীরু পলাতকের মতো। রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে সে। অবশেষে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত তারেক অনুধাবন করে জীবন-সম্পর্কিত নব তাৎপর্য:

> ধনসম্পদ, বৈভব, প্রতিপত্তি কোন কিছুই নয়। আমি এসব থেকে মুক্তি চাই। বাবার স্নেহ চাই, মায়ের আদর চাই। বোনের ভালবাসা চাই। আস্তানা নয়, ঘর চাই। (নবম দৃশ্য)

নাটকের এক ভয়ঙ্কর চরিত্র চান্দু শেখ। কোয়েলের সংলাপে চান্দুর যে পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে, তা হলো :

> চান্দু শেখ তো নিছকই একটি ব্যক্তি নয়। একটি বিশেষ সমাজের প্রতিভূ। সে সমাজ থেকে আমরা মুক্তি না পেলে কেবলই এক বাঁধন থেকে অন্য বাঁধনে শুধু জড়িয়ে পড়ব। (নবম দৃশ্য)

নিষ্ঠুরতার মূর্ত প্রতীক 'গুণ্ডাসর্দার' চান্দু। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে 'আড়ালে আবডালে' সে হত্যা করে নিরীহ মানুষকে। তারই হাতে খুন হয় কোয়েলের পিতা। তার দুষ্কর্মের অন্যতম সহযোগী তারেকও নানাভাবে তার হাতে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

একসময় অনুশোচনাদগ্ধ তারেক অপরাধজগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলে চান্দু তাকে হত্যার হুমকি প্রদান করে। অবশেষে একদিন ব্যবসায়িক বিরোধের সূত্র ধরে চান্দু গুলিবিদ্ধ হয় এবং তার আস্তানায় পুলিশ হানা দেয়। পুলিশের হাতে বন্দি চান্দুকে লক্ষ করে তার আশ্রিতা কোয়েল এসময় বলে :

> জ্বলতে দাও। তোমার ভেতরে আগুন ছিল ওস্তাদ। যে আগুন আলো দিতে পারত। কিন্তু তুমি তো নিজের আগুনে নিজে জ্বললে। জ্বালালে সবাইকে। তুমি পারলে না জঞ্জাল পুড়িয়ে ছাই করে দিতে। পারলে না সে আগুনে নিজে খাঁটি হতে, আমাদের খাঁটি করতে। বড্ড হাসি পায় ওস্তাদ। ভাগ্যের কী প্রহসন। (দশম দৃশ্য)

শওকত ইফতেখারের একান্ত সহকারী। ইংরেজি সহিত্যে স্নাতক পর্যায়ে 'হাই সেকেন্ড ক্লাশ নম্বর' পেয়েও সে অর্জন করতে পারেনি কোনো সম্মানজনক সামাজিক অবস্থান; যদিও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী 'এডুকেশন লাইন' ছিল তার জন্য উপযুক্ত। নিজেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে সামান্য চাকরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাকে। মধ্যবিত্তের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নভঙ্গের করুণ পরিণতি চিত্রিত হয়েছে শওকত চরিত্রে।

নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে ইফতেখারের স্ত্রী সকিনা বানু অন্যতম। তার মধ্যে নেই কোনো সৌজন্যবোধ। বাড়ির অতিথি আনুর সঙ্গে তার ব্যবহার রুক্ষ ও অমার্জিত। আনুকে লক্ষ করে উচ্চারিত প্রথম সংলাপেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আনুর প্রতি সকিনার বিরূপতা :

> তখনই বলেছিলাম, জানা নেই, শোনা নেই, সাতকুলে নাম শুনিনি, এসব আপদ বাড়িতে এনো না, কার কথা কে শোনে। ...পাশ করে চাকরি করবে? কেন দেশে কাজ জোটাতে পারলে না? (দ্বিতীয় দৃশ্য)

রাতে আলো জ্বালানোর খরচ বাঁচানোর জন্য সকিনা বিকেলের মধ্যেই আনুকে কলেজের 'হোম-ওয়ার্ক' সমাপ্ত করতে বলে এবং আনুকে কেউ দেখে ফেললে তাদের আভিজাত্যবোধ ক্ষুণ্ন হতে পারে, এজন্য তাকে ড্রয়িং রুমে আসতে পর্যন্ত বারণ করে সে। গ্রাম থেকে আসা প্রত্যেকটি চিঠি আনুকে দেবার পূর্বে সে পড়ে নেয়– তাদের পরিবার সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ রয়েছে কী না জানবার জন্য। তবে চরিত্রটি সম্পর্কে নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন–

> ভিলেন চরিত্র নয়। মা ও স্ত্রী হিসেবে নিজের পরিবারের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন। বক্তব্য স্বভাবতই কড়া। সুস্পষ্ট। কিন্তু আক্রমণাত্মক নয়।[১]

[১] আনিস চৌধুরী, *চেহারা*, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪

ইফতেখার-সকিনাবানুর কন্যা বেবী নবম শ্রেণির ছাত্রী। নাটকে প্রথমে তাকে দেখা যায়, খানিকটা অহংকারী হিসেবে। আনুকে লক্ষ করে সে বলে– 'তোমরা গরীব, না?... এ্যাই ওদিকে সরে বস।' (দ্বিতীয় দৃশ্য) এ-নাটকে বেবী একইসঙ্গে ঈর্ষাপ্রবণ ও আমুদে। নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে পড়ে গিয়ে কিংবা প্লেট ভেঙে ফেলে সে মায়ের কাছে আনুকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করে। তবে এতোকিছুর পরও আনুর প্রতি তার হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে গোপন দুর্বলতা। সকিনা আনুকে বাথরুমের কল খোলা রাখবার অভিযোগে অভিযুক্ত করলে বেবী উত্থাপন করে কল্পিত জ্বিন-পরী প্রসঙ্গ। আনুর খবর নিতে কখনও কখনও সে যায় আনুর ছাত্রী রীতাদের বাসায় এবং আনুকে সেখানে পড়াতে যেতে নিষেধ করে। আনুর অপর ছাত্রী পারভীন সমন্ধে বেবী অভিমানের সুরে বলে :

> তুমি পারভীনদের ওখানে যাবে না। যদি যাও আমি ওই মেয়েটার চুল ছিঁড়ে ফেলব।' (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

নাটকের শেষ পর্যায়ে অবশ্য জানা যায়, বেবী ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত এবং চিকিৎসার জন্য তাকে পাঠানো হয় কানাডার ভ্যাঙ্কুভার হাসপাতালে। চরিত্রটির প্রতি নাট্যকারের সমবেদনা ছিল পূর্ণমাত্রায়। *চেহারা*র উৎসর্গপত্র থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়– 'এ নাটকের মুখ্য চরিত্র বেবী নামের মেয়েদের, যে যেখানেই থাকুক।'

এ-নাটকের একটি অন্যতম চরিত্র শওকতের বোন সাহানা। জরিপ বিভাগে চাকরি করতেন তার স্বামী। বিবাহের পরদিনই সন্দ্বীপে যাবার পথে এক লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হন তিনি। নাটকের এক পর্যায়ে আনুর সঙ্গে সাহানার স্থাপিত হয় মনোময় সম্পর্ক। প্রাসঙ্গিক সংলাপ স্মরণীয় :

> সাহানা : (দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হয়) আসবেন না?
> আনওয়ার: (ফিসফিস গলায়) আসব।
> সাহানা: একটু দাঁড়ান।
> আনওয়ার: (এগিয়ে এসে) কিছু বলবেন?
> সাহানা: (মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকায়, তারপর সলজ্জ মাথা নিচু করে ফেলে) না, এমনি। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

এ নাটকে এক অসাধারণ এবং ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র কোয়েল। সে 'বাস্তববাদী। বিশ্লেষণধর্মী। অকারণে উত্তেজিত নয়।'[১] চান্দু শেখের আশ্রয়ে লালিত, পালিত ও বর্ধিত হলেও একসময়

[১] আনিস চৌধুরী, *চেহারা*, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪

সে জানতে পারে চান্দু শেখ তার পিতার হত্যাকারী। অতঃপর সে হয়ে ওঠে চরম বিদ্রোহী। চান্দুর গলায় পিতার ব্যবহৃত স্বর্ণের চেন প্রত্যক্ষ করে সে তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে; শুধু তাই নয়, চান্দু শেখকে সে ঝোলাতে চায় ফাঁসির দড়িতে।

আনিস চৌধুরীর *চেহারা* কেবল বিষয় বিবেচনায় নয়, প্রকরণশৈলীতেও স্বকীয়। তাঁর 'নাটকে নেই কোনো গর্ভ-বিভাজন কিংবা গর্ভাংক বিন্যাস। কতগুলো দৃশ্যের বিন্যাসে তিনি সাজিয়ে তোলেন তাঁর নাটকের অবয়ব। এই বিন্যাসরীতি, সন্দেহ নেই আধুনিক নাটকের লক্ষণ।'[১] এ নাটকের মঞ্চ-পরিকল্পনা থেকে শুরু করে দৃশ্য পরিবর্তন– সকলক্ষেত্রেই রয়েছে আধুনিকতার প্রকাশ। পঞ্চদশ দৃশ্যে বিন্যস্ত *চেহারা* নাটকের সংলাপসৃজনে রক্ষিত হয়েছে শৈল্পিক ভারসাম্য। নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে এ নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে প্রমিত ভাষারীতি–

> বেবী: নিচের ঘরে কে?...
> আনওয়ার: আমি
> বেবী: 'আমি', 'আমি', কে। আমি কারও নাম হয় না কি?
> আনওয়ার: আমি চরকাসিমপুর থেকে এসেছি।
> বেবী: সেটা কোথায় ?
> আনওয়ার: ঈশ্বরদী থেকে ট্রেনে গেলে–
> বেবী: ট্রেনে গেলে ! ট্রেনে যাচ্ছে কে তোমাদের ওখানে। তোমাকে জানি না শুনি না। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

অন্যদিকে গ্রামজীবনাশ্রিত চরিত্রের সঠিক রূপায়ণে নাট্যকার সরাসরি নির্দেশনা প্রদান করেছেন– 'কাসেমের উচ্চারণে accent গ্রাম্য থাকবে।' (পঞ্চম দৃশ্য) নাটকে আনওয়ার এবং গৃহকর্মী কাসেমের কথোপকথন লক্ষণীয়–

> কাসেম: আপনারে ডাকতাছেন।
> আনওয়ার: কে?
> কাসেম: আমাগো অফিসের 'আসিসটেন' (অ্যাসিসট্যান্ট অর্থে)।...
> আনওয়ার: (কাসেমকে) আচ্ছা তুমি যাও, আমি আসছি।
> কাসেম: কওন লাগবো না। আমি বসাইয়া রাখছি। (পঞ্চম দৃশ্য)

[১] বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), *আনিস চৌধুরী : নাটক সংগ্রহ* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

তবে শুধু কাসেমের সংলাপে নয়, পারিবারিক পরিমণ্ডলে কিংবা পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সকিনা, তালুকদার প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপেও নাট্যকার ব্যবহার করেছেন লোকজ শব্দ । যেমন :

ক) তালুকদার: আরে বাপু তোমাকে নয়। তুমি অত দাপাদাপি করছ কেন। (প্রথম দৃশ্য)

খ) সকিনা: যাও কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করো না তো। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

চরিত্রপাত্রের সংলাপে কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়েছে পুরাণ-অনৃষঙ্গযুক্ত শব্দ–

না বলোনি। যুধিষ্ঠির। লোকজন বেছে বেছে তোমার পিছনে লাগে কিনা। (তৃতীয় দৃশ্য)

আবার উপমা-বাগধারা-প্রবাদও এ-নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে নিপুণভাবে ।

উপমা : ক) কী, কিছু বলছ না কেন, গবেটের মতো দাঁড়িয়ে। (প্রথম দৃশ্য)

খ) ঘুরে বেড়ায় ভীরু পলাতকের মতো। (অষ্টম দৃশ্য)

গ) যেন আমিই পড়ে রইলাম স্থির নিশ্চল জগদ্দল পাথরের মত। (অষ্টম দৃশ্য)

ঘ) নিজের বাড়িতে ঢুকেছি চোরের মতো গা ঢাকা দিয়ে। (নবম দৃশ্য)

ঙ) মানুষের ইচ্ছে আর আকাঙ্ক্ষারাও এমনি করে ঝরে যায়। শুকনো পাতার মত। (পঞ্চদশ দৃশ্য)

বাগধারা : ঘোড়ার ডিমে'র আত্মীয়। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

প্রবাদ : নিজের চরকায় তেল দাও। (পঞ্চম দৃশ্য)

এ-নাটকের সংলাপের মধ্যে কখনও কখনও প্রকটিত হয়েছে দার্শনিকতা। যেমন :

সময়ের সঙ্গে মানুষের বড্ড মিল। মানুষের মতো সেও এক সময় ফুরিয়ে যায়। (দশম দৃশ্য)

সামাজিক জীবনের বিবিধ অসঙ্গতি এবং ব্যক্তিহৃদয়ের ক্ষরণবিগলন *চেহারা* নাটকে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত আনিস চৌধুরীর অন্য নাটকগুলোর মধ্যে খুব একটা লক্ষ করা যায় না। তৎকালে মঞ্চ এবং টেলিভিশন– উভয় মাধ্যমেই নাটকটি অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। সবদিক বিবেচনায়, *চেহারা* নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের নাটকে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তবু অনন্য

তবু *অনন্য* আনিস চৌধুরীর জনপ্রিয় টিভি নাটক। একজন মধ্যবিত্ত নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এখানে। পূর্ববর্তী নাটকগুলোর মতো এ-নাটকের প্রারম্ভেও রয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবার-পরিসরের বর্ণনা :

> মাঝারি আকারের কামরা। যেখানে বসা এবং খাবার ব্যবস্থা দুইই। খাবার টেবিল ছোট। চারজনের বসার উপযুক্ত।... জিনিসপত্রের কোনো বাহুল্য নেই। যাও আছে তা অতি মামুলি, সচারাচর মধ্যবিত্ত বাড়িতে যে রকম দৃষ্টিগোচর হয়।

নাটকের প্রধান চরিত্র রাশিদা এক সংগ্রামশীল নারী-ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্বামী মাসুদ লন্ডনে গিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করে ক্যাথী নামের এক বিদেশিনীকে। তাদের একমাত্র মেয়ে রীতা এ-সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে তীব্র ক্ষোভে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ ভেঙে ফেলে ঘরে ঝোলানো পিতার বাঁধানো ছবি। কিন্তু সতেরো বছর দাম্পত্য-জীবন যাপনের পর তার প্রতি স্বামীর এ বিরূপতায়ও রাশিদা পরাস্ত হয় না। তার ঠোঁটে শোভা পায় 'ক্ষীণ অথচ কঠিন হাসি।' প্রচণ্ড আশাবাদী রাশিদা বিশ্বাস করেন 'হয় জেত, না-হয় শেষ হয়ে যাও'। জীবনকে তিনি আবেগ দিয়ে বিচার করেন না; বরং বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান সামনের দিকে :

> ভাবছ এতবড় খবর শুনে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলাম না।... ওসবের এখন সময় নেই। রাতে যদি সময় হয় চেষ্টা করে দেখব। কান্না পেলে কানব। ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়ব। (প্রথম দৃশ্য)

স্পষ্টত আকস্মিক বিপদপাতেও রাশিদা হারিয়ে ফেলেননি তার ধৈর্য ও বিবেকবোধ। মায়ের অসহায়তার কথা ভেবে রীতা যখন তার মাকে তার মামা-বাড়ি গিয়ে ওঠার প্রস্তাব দেয় তখন তিনি তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ–

> দুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। তাছাড়া তোর নানুও তো বাবুভাইয়ের বাসাতেই থাকেন। এরপরও আমরা দুজন গিয়ে উঠলে... ওদের দিকটাও তো ভাবতে হবে। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

এ পর্যায়ে অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে সংসার পরিচালনা করতে হয় তাঁকে। কখনও পাশের বাড়ির পাঠানো লুচি, কখনও টোস্ট বিস্কুট আর পানি সহযোগে শেষ হয় তাদের নাস্তাপর্ব। ধীরে ধীরে ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থও নিঃশেষ হয়ে যায় তাদের। মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রাশিদা তাই কাল্পনিক সুখ-স্বপ্নের কথা বলেন; স্বপ্ন দেখেন লটারি জয়ের। প্রাসঙ্গিক সংলাপ লক্ষণীয় :

Dhaka University Institutional Repository

রীতা : আর যদি স্কুলে যেতে না পারি। যদি মাইনে না দেওয়া হয়।

রাশিদা : আর যদি লটারি জিতে যাই। লাখ টাকা পেয়ে যাই। যদি খুব বড়লোক হয়ে যাই। (প্রথম দৃশ্য)

মূলত সন্তানের অতি তুচ্ছ বিষয়ও রাশিদার মনোযোগ এড়িয়ে যায় না। নাটকে দেখা য়ায়, স্কুলে যাওয়ার আগে তিনি মেয়ের ভেজা চুল মুছে দেন, মাথা আঁচড়ে লাগিয়ে দেন ক্লিপ। মায়ের কাছে রীতারও আবদারের শেষ নেই :

রীতা : টোস্ট বিস্কুট খাব না।

রাশিদা : এটা খাব না, ওটা খাব না। কী খাবে বললেই হয়। (প্রাগুক্ত)

দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে শুরু হয় রাশিদার কঠিন জীবন-সংগ্রাম। এ-পর্যায়ে তিনি চাকরিপ্রাপ্তির জন্য অফিস-পাড়ায় হন্যে হয়ে ঘোরেন; কিন্তু প্রায় সর্বত্রই তাঁকে দেখতে হয় 'নো ভ্যাকান্সি', নো ইন্টারভিউ প্লিজ'। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শিক্ষক ড. খানের সহায়তায় একসময়ের ফার্মেসি বিভাগের ছাত্রী রাশিদা যোগ দেয় একটি ঔষধ কোম্পানির অ্যাসিস্টেন্ট সুপারভাইজার পদে। কিন্তু সেখানেও জুড়ে দেয়া হয় একটি কঠিন শর্ত– 'প্রমোশনের কোনো চান্স নেই অন্তত আগামী এক বছর।' বেতন স্বল্পতার কারণে দুপুরের 'লাঞ্চ' পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে না তাঁর। এখানেই শেষ নয়, জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশে তাঁকে কফি তৈরি করতে হয় এবং কফির স্বাদ পছন্দ না হওয়ায় বাইরের অতিথির সম্মুখে অপমানিতও হতে হয়। অবশ্য এরূপ পরিস্থিতি দৃঢ়ভাবেই মোকাবেলা করে রাশিদা। ম্যানেজারকে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন :

আমার সময় নেই। নিজে বানিয়ে নিন স্যার। কফি বানানোর জন্য এ অফিসে আমার চাকরি হয়নি। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

তিন বছর পর রাশিদার পদোন্নতি হয় সুপারভাইজার হিসেবে। এরপর জেনারেল ম্যানেজারের অসততার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন তিনি। প্রতিফলে তাঁকে নানা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে প্রতিপক্ষরা। হুমকির মাত্রা চরমে পৌঁছালে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সকল প্রকার অনুরোধকে অগ্রাহ্য করে চাকরিতে ইস্তফা দেন রাশিদা। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে এর কারণ উল্লেখ করে তিনি জানান :

ওসব নিয়ে পরোয়া ছিল না। কিন্তু মেয়েটার কথা বলে যখন ভয় দেখায়, গুম করে ফেলার কথা বলে, ভয় পাই। পারি না। মেয়ের জন্যেই নিরুপায়। (একাদশ দৃশ্য)

রাশিদার প্রতিবাদী চেতনা তার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারেককে আকৃষ্ট করলেও নির্ঝঞ্ঝাট স্বচ্ছল জীবনের প্রলোভনে পশ্চাৎগামী হয় সে। কিন্তু এ মন্ত্র ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ফ্যাশান শোর টিকিট-বিক্রেতা লুসিকে :

> লুসি: আপনাকে দেখে আমার সাহস হলো। ভরসা পেলাম।...
> রাশিদা: হঠাৎ এক একটি মুহূর্ত আসে। তখন মন বিদ্রোহ করে। শেকল ভাঙতে চাই। হবার যখন আপনা থেকেই হবে। (অষ্টম দৃশ্য)

এদিকে ক্যাথির সঙ্গে 'বনিবনা' না হওয়ায় লন্ডন থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে মাসুদ। রাশিদার সঙ্গে সে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে চায়। কিন্তু নিজের অবস্থানে অটল ও অবিচল থাকে রাশিদা। রীতা পিতার প্রতি ক্ষুব্ধ থাকলেও ঘনঘন রেস্তোরাঁ আর শপিংয়ে যাবার মোহে ভুলে যায় অতীতের যাবতীয় বেদনা। তৎসঙ্গে মায়ের প্রতি সে উত্থাপন করে তীব্র অভিযোগ :

> এতগুলো বছর ক্রমাগত কষ্ট করেছ মা। কিন্তু এটাকে জীবন কাটানো বলে না। শীতে কেঁপেছি, আধপেটা থেকেছি। অন্যের সামনে মাথা নিচু করে চলেছি। জানো না মা, কতদিন বালিশে মাথা গুঁজে কেঁদেছি। (ষোড়শ দৃশ্য)

রীতা চায় পিতা-মাতার পুনর্মিলন। কিন্তু এ-মিলনে বাধা হানে রাশিদার প্রবল আত্মসম্মানবোধ। অতঃপর মাসুদের পরামর্শে রীতা চলে যায় কলেজ হোস্টেলে এবং রাশিদা আশ্রয় নেন লুসির কাছে। এরপর টিউশনির মাধ্যমে দিনযাপনের পথ বেছে নেন রাশিদা। নাটকের শেষ দৃশ্যে রীতার সঙ্গে রাশিদার দেখা হয় রাজপথে; যখন রীতা মাসুদের সঙ্গে বিলাসবহুল গাড়িতে এবং রাশিদা ঘর্মাক্ত অবস্থায় বিচরণ করে ফুটপাতে। এসময় কন্যার শত অনুরোধ সত্ত্বেও সুখী জীবনের আহবান ফিরিয়ে দেন রাশিদা, বরণ করে নেন বন্ধনহীন নিঃসঙ্গতা :

> রীতা: এসো মা বসো।
> রাশিদা: (ওরা যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই দেখিয়ে দেয়) তোদের রাস্তা এদিকে।... আর আমার ওদিকে। (সপ্তদশ দৃশ্য)

'পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের যে অবজ্ঞা আর দুরবস্থার শিকার হতে হয় এ তারই এক প্রতিবাদ যেন। নাট্যকার আনিস চৌধুরী এখানে আপস করেননি। জীবনের নির্মম সত্যের মধ্য

দিয়ে নারী স্বাধীনতার সপক্ষে প্রতিবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছেন দর্শকদেরকে। এখানেই একজন বড় নাট্যকারের পরিচয়।'[১]

রাশিদার একমাত্র মেয়ে রীতা অত্যন্ত অভিমানী। স্কুলের উদ্দেশ্যে তৈরি হলেও পিতার দ্বিতীয় বিবাহের কথা জানতে পেরে সে স্কুলে যেতে চায় না। নবম দৃশ্যেও দেখা যায়, পিতার দেশে আসবার সংবাদ রোকেয়ার মাধ্যমে জানতে পেরে সে বলেছে– 'এতদিন কোথায় ছিল বাবাগিরি।' অবশেষে রোকেয়ার অনুরোধ এবং মায়ের সম্মতিতে সে সাক্ষাত করতে যায় বাবার সঙ্গে। দীর্ঘদিন পর কন্যার মুখদর্শন করে আবেগে বিহবল হয়ে মাসুদ কন্যার মাথায় হাত রাখলে রীতা সরিয়ে দেয় পিতার হাত। এতে তীব্র মানসিক আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে মাসুদ। এ ঘটনার ফলে রীতার মধ্যে জাগ্রত হয় পিতৃপ্রেম। মাকে সে বলে :

> তা যাবে না কেন। কিন্তু মা মানুষ একবার অন্যায় করে। দুবার। বারবারই কি করে। আমি তো খারাপ কিছু দেখি না। (ষোড়শ দৃশ্য)

রোকেয়া এ-নাটকে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। তার মধ্যস্থতায় মাসুদের সঙ্গে রাশিদার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়; আবার রীতার সঙ্গে মাসুদের পুনর্মিলনও সংঘটিত হয় তার মধ্য দিয়ে।

খুব স্বল্প পরিসরে নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হয় লুসি ইব্রাহিম। পড়ালেখা করতে শহরে আসলেও পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে স্তব্ধ হয় তার শিক্ষাজীবন। এরপর থেকে পুরো সংসারের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে। টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সামান্য কমিশনপ্রাপ্তির জন্য সে ঘুরে বেড়ায় এক অফিস থেকে অন্য অফিসে। কিন্তু 'এ লাইনে বড় কম্পিটিশন। ব্যবসা ভালো চলছে দেখলে আরেকজন এসে বাগড়া' দেয়। নাটকে ফ্যাশান শোর টিকিট বিক্রি করতে সে আসে একটি ঔষধ কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের কাছে; কিন্তু ম্যানেজার তাকে যে ইঙ্গিত দেয়, তা নিঃসন্দেহে কুরুচিপূর্ণ :

> আপনি বরং এক কাজ করুন। কাল চেম্বারের লাঞ্চ আছে। আড়াইটার দিকে হোটেলে চলে আসুন। লোকজনের সঙ্গে আলাপও হবে। তারপর না হয় কোথাও বসে কফি-টফি অথবা সন্ধ্যাটা যদি ফ্রি থাকে– (ষষ্ঠ দৃশ্য)

ম্যানেজারের লালসাতপ্ত এ-ইঙ্গিতের সরাসরি প্রতিবাদ করেনি লুসি। কিন্তু পরবর্তীসময়ে রাশিদার স্পষ্ট ভাষণ তাকে সচেতন করে তোলে।

---

[১] সৌরভ সিকদার,*জীবনী গ্রন্থমালা : আনিস চৌধুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

তবু *অনন্য* নাটকে রাশিদার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তারেক। অতি সাধারণ, সুস্থির ও শান্ত প্রকৃতির সে। অফিসে কিংবা অফিসের বাইরে রাশিদাকে সর্বপ্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয় তারেক। একসঙ্গে টিফিন খায়, স্টাফ বাসে রাশিদাকে না পেয়ে খোঁজ করে, আবার অফিস শেষে কখনও কখনও বাড়ি পৌঁছে দেয়। তারেকের নিজের সংলাপে পরিস্ফুট হয়েছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য– 'আমার আত্মবিশ্বাস নেই। নিজের কাছেই নিজে হেরে যাই।' (চতুর্থ দৃশ্য) নাটকে দেখা যায়, পরিচয়ের পর থেকেই রাশিদা প্রসঙ্গে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে তারেক। রাশিদা প্রথমদিকে এ-নিবেদন আগ্রাহ্য করলেও এক পর্যায়ে তাঁর মধ্যেও তৈরি হয় ঈষৎ দুর্বলতা। কিন্তু এ-পরিস্থিতিতে তারেকের মধ্যে দেখা যায় নির্বিকার নিস্পৃহতা। তার এ প্রবণতাকে কটাক্ষ করে রাশিদা বলেছেন :

> ...ধরতেই ছেড়ে দিলেন। ভয় পেলেন বোধ হয়। ভালোই করেছেন। (সপ্তম দৃশ্য)

আবার রাশিদা যখন জেনারেল ম্যানেজারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী তখনও 'ছেলেমেয়ে, বউ-সংসারের' মোহে সে থাকে নিরুত্তাপ। রাশিদার অনেক অনুরোধও তাকে উজ্জীবিত করতে পারে না; বরং রাশিদাকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপস করতে বলে সে। মূলত এটি তারেকের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য। কেননা 'মধ্যবিত্তের প্রধান অবলম্বন বুদ্ধি ও বিদ্যা অর্জনে বা সংরক্ষণে তাদেরকে শ্রেণীগতভাবে বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় না। এদেশে এ শ্রেণীর ভূমিকা প্রধানত সুবিধাবাদী। শক্তির পক্ষে অবস্থান গ্রহণই সাধারণভাবে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পরিস্থিতি অনুযায়ী এদেরকে প্রগতি অথবা প্রতিক্রিয়ার পক্ষে অবস্থান নিতে দেখা যায়। এরা সুযোগসন্ধানীও। বিত্তবানের জীবনমান ও জৌলুস এদেরকে নিরন্তর প্রলুব্ধ করে। অনেকেই উচ্চভিলাষের শিকার হয়ে বিত্তবান-শ্রেণীতে উত্তরণ-প্রয়াসে লিপ্ত, কেউ কেউ এ প্রয়াসে বিবেক-মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অনেকে আবার আশানুরূপ বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জন করতে না পেরে ব্যর্থতা ও হতাশাবোধে আক্রান্ত। সাধারণভাবে এদেরকে মূলশূন্য পরনির্ভর বা পরামুখাপেক্ষী শ্রেণী আখ্যায়িত করা অসঙ্গত নয়।'[১] তারেকের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। নাটকের এক পর্যায়ে তার এ-চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিরূপণে সক্ষম হন রাশিদা এবং বলেন:

> আপনিও আরেকজন। অন্তত আমার চোখে। কাল যাকে চিনতাম সে নয়। কিন্তু তাই বলে কি নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হয় না? চলুন। (দশম দৃশ্য)

[১] মুহম্মদ ইদইরস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

তবু *অনন্যের* খলচরিত্র জেনারেল ম্যানেজার। মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ রয়েছে যাদের শিক্ষা আছে কিন্তু সততা নেই। তারা সর্বক্ষণ চালিত হয় আর্থিক প্রলোভনে। ম্যানেজার এ শ্রেণিরই প্রতিনিধি। তবু *অনন্য* নাটকে তার অসততার চিত্র সুস্পষ্ট। রাশিদার সংলাপ লক্ষণীয় :

> ইনভেন্টরি লিস্ট করতে গিয়ে ধরা পড়ল স্যার। খাতাপত্রের সঙ্গে স্টক মিলছে না। যেমন দেখুন (নিজের কাগজ বার বার করে) চার নং আইটেম টেট্রাসাইক্লিন খাতাপত্রে পাঁচ হাজার কেজি– স্টকে পাওয়া যাচ্ছে তিন হাজার কেজি । অথচ পার্টিকে পুরো পেমেন্ট করা হয়েছে। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

রাশিদার নিকট সকল বিষয় পরিষ্কার হলে ম্যানেজার তার চরিত্রকে কলুষিত করতে উত্থাপন করে তারেক-প্রসঙ্গ। এতে ব্যর্থ হয়ে রাশিদাকে তার অতীত-জীবন নিয়ে বিষোদগার করে সে। তবে জেনারেল ম্যানেজারের কোনো পরিকল্পনাই শেষপর্যন্ত রাশিদাকে তার সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সমাজপরিসরে নারীরা যে চিন্তাচেতনায় পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অনেকটাই প্রাগ্রসর তা এ-নাটকে স্পষ্ট। অবশ্য এ-পর্যায়েও নারীদের অগ্রগতিতে ছিল প্রচুর প্রতিবন্ধকতা। উচ্চশিক্ষা অর্জন করলেও একদিকে সে যেমন যোগ্যতা অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত কর্ম অর্জনে ব্যর্থ হতো, অন্যদিকে কর্মসংস্থান অর্জিত হলেও কর্মস্থলে তাকে মুখোমুখি হতে হতো বিচিত্র প্রতিবন্ধকতার; তদুপরি সমাজপরিসরে ছিল অমানবিক বিপত্তি। পুরুষের ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছার ওপর নির্মিত হতো নারীর সংসার-স্তম্ভ। আনিস চৌধুরী তবু *অনন্য* নাটকে এরূপ সামাজিক সংকীর্ণতা ও অপদশা থেকে নারীর মুক্তি কামনা করেছেন, একইসঙ্গে প্রত্যাশা করেছেন নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ।

নীলকমল

স্বাধীনতা উত্তরকালে নাগরিক মধ্যবিত্তের যাপিত জীবন-পরিসর অনেক নাট্যকারেরই শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু 'আনিস চৌধুরীতে নাগরিকতার পদপাত আরো বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্বিরোধ দীর্ণতা ও ট্রাজেডি তার অন্বিষ্ট।'[১] *নীলকমলের* (১৯৮৬) পটভূমি একটি নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার, যে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যই

[১] আলী আনোয়ার, 'বাংলাদেশের নাটক: সমস্যা ও প্রবণতা', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা* (রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত। নাটকে দেখা যায়, রোকেয়া তার স্বামী জাফর, সন্তান রীনা ও বাবলু, দেবর ডাঃ নিসার এবং বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ননদ দুলারিকে নিয়ে সুখে কালাতিক্রম করছে। সংসারের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি রোকেয়ার রয়েছে সমান মমতা। দেবর-ননদকে সে সন্তানসম স্নেহ করে এবং তাদের সুযোগ সুবিধা নিয়েই অনেক বেশি চিন্তিত থাকে। একটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

> রোকেয়া: কিছু পুডিং বানিয়েছিলাম। দেখ তো কেমন হলো। কিছু তো খাস না। এদিকে আয়। হাঁ কর।
>
> দুলারি: (নকল রাগের ভঙ্গিতে) দিলে তো সব নষ্ট করে।
>
> রোকেয়া: (নিজের আঁচল দিয়ে মুছে দেয়। আবার গ্লাসের পানি ঢেলে আঁচল ভিজিয়ে মুছে দেয়) যা যা। কিছু হয়নি। (পৃ.৩৫৪)

এমতাবস্থায় এ-পরিবারে অতিথি হয়ে আসে সস্ত্রীক ধনুমামা; যিনি রোকেয়ার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। অবশ্য এটি তার প্রথম আগমন নয়; এর পূর্বেও সে এখানে অতিবাহিত করেছে আড়াইমাস। কিন্তু এ-যাত্রায় পূর্বের কক্ষ বরাদ্দ না থাকায় অত্যন্ত মনঃকষ্টে ভোগে সে; এবং সর্বপ্রথম রোকেয়াকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে চায়। কিন্তু রোকেয়া স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না তার এ ধরনের বক্তব্যে। প্রাসঙ্গিক সংলাপ উদ্বৃতিযোগ্য :

> মামা: যার নিজের ভাই, তার ভাই। যার নিজের বোন, তার বোন। তোর ছেলেমেয়েদের স্বার্থ দেখতে হবে না।
>
> রোকেয়া: মামা আপনি বেড়াতে এসেছেন খুশি হয়েছি। আমি এ সংসারে বৌ হওয়া অবধি ওদের দেখে আসছি। এরকম করে বললে আমি কষ্ট পাই। (পৃ.৩৬১)

'কথায় কথায় লোকের পেছনে লাগা' এবং 'সব ব্যাপারে অযথা সন্দেহ' ধনুমামার স্বভাব। এ-সংসারে পদার্পণের শুরুতেই বাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে অধিক চিন্তাগ্রস্ত হয় সে এবং চাবিওয়ালা ডেকে নিয়ে সে বানিয়ে নেয় দেরাজের চাবি। প্রথমেই তার সন্দেহের বাণ বর্ষিত হয় ডাঃ নিসারের প্রতি। তার সম্পর্কে রোকেয়াকে বোঝাতে অক্ষম হয়ে ধনুমামা অতঃপর জাফরকে তার অনৈতিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত করে; এবং গাড়ি বিক্রয়কে কেন্দ্র করে জাফরের সঙ্গে নিসারের বিরোধ সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয় সে–

> মামা: তোমার তো গাড়ি ছিল। ... বিক্রি করে পেলে কত?
>
> জাফর: গাড়ির কন্ডিশন তো খুব একটা ভালো ছিল না। সাড়ে সাঁইত্রিশ। প্রথমে তো পঁয়ত্রিশ বলেছিল। নিসারই ঠিক করল।...
>
> মামা : কম পেয়েছ। নির্ঘাত ঠকিয়েছে। কম করে হলেও ষাট হাজার পাওয়া উচিত ছিল। (পৃ.৩৬২- ৩৬৩)

জাফর অনায়াসেই বিশ্বাস করে নিসারের প্রতি আরোপিত অভিযোগ এবং এ প্রসঙ্গে কৈফিয়ত তলব করে ছোটো ভাই নিসারের কাছে। এতে কোনোরকম উত্তেজিত না হয়ে শান্তচিত্তে নিসার জবাব দেয় :

> যদি জোরগলায় বলি অন্যায় সন্দেহ করছ, লাভ নেই। সততার কাজ ওভাবে বোঝানো যায় না। চাপাবাজি করে, টেবিল চাপড়ে কোনোভাবেই না। (পৃ. ৩৭৫)

এ-ঘটনায় মর্মাহত হয়ে গৃহত্যাগ করে নিসার। অন্যদিকে রোকেয়ার কানের দুল হারানোকে কেন্দ্র করে দুলারিও চলে যায় হোস্টেলে; যদিও তার কাছে ছিল আরেক ভাই নিসারের বড় ফ্ল্যাটে উঠবার সুযোগ। কিন্তু নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার মনে জাগ্রত হয় নতুন আশঙ্কা– 'এক ভাইয়ের সঙ্গে থাকা গেল না। অন্য ভাইয়ের সঙ্গে পারব তার কী ভরসা।' (পৃ.৩৮২) তাই 'একটু নিরাপত্তা, সামান্য আশ্রয় আর কিছু স্নেহ-মমতার' প্রত্যাশী দুলারি ভাইদের সান্নিধ্য বর্জন করে সহপাঠী কামালের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের আশ্রয় নিশ্চিত করতে চায়। যাবার প্রক্কালে রোকেয়া তার হীরের দুলজোড়া উপহার দিতে চাইলে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন দুলারি উত্তর দেয় :

> তোমার মিথ্যা সন্দেহ আমার কানে দুলবে চিরকাল– ভালো লাগবে? ... মানুষ অনেক সময় না দিয়েও ভালবাসে। আর না পেয়েও খুশি হয়। (পৃ.২৮৩)

পরবর্তীকালে জানা যায়, জাফরের সঙ্গে নিসার প্রতরণা করেনি এবং রোকেয়ার দুলও হারিয়ে যায়নি, বরং হারিয়ে যায় তাদের 'বিশ্বাস, চেতনা, মমত্ববোধ'। গাড়ির ক্রেতা কাসেম আলী অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জাফরকে যা বলে, তাতে প্রকাশিত হয় প্রকৃত সত্য :

> আপনার একলোক সেদিন এসে জিজ্ঞেস করে গেল কত টাকা দিয়েছি। ওয়েল, কত দিয়েছি সেটা আমি অন্য পার্টিকে বলতে বাধ্য নই।... বিশ্বাস করুন শুধু ডক্টর নিসারের কথায় থার্টি এইট থাউজেন্ড দিয়েছি।... ওই লক্কর মার্কা গাড়ির জন্যে অন্য কেউ হলে পনেরো হাজারও দিত না। (পৃ. ৩৮০)

নাটকের শেষপর্যায়ে দেখা যায়, জাফর এবং রোকেয়া অনুধাবন করতে পারে ধনুমামার কপটতা ও চাতুর্য্য। শুধু তাই নয়, ধনুমামার সঙ্গে সে নিজেদের চরিত্রগত কোনো প্রভেদও অনুভব করে না। জাফর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইলে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় :

> ওসব কথা ছাড়। নিসারই কি আশা করেছিল তুমি অতটা নীচে নামবে। দুলারি কি ভেবেছিল আমি তার কাছে কৈফিয়ত চাইব। মামার আর আমাদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। (পৃ.৩৮১)

Dhaka University Institutional Repository

এ-পর্যায়ে ধনুমামাকে লক্ষ করে রোকেয়া বলে :

> এখন বাড়িতে ভালো আর মন্দ বলে কোনোটাই নেই মামা। যেমন ছিলাম যদি তেমন থাকতে পারতাম।... মামা একটা উপকার করবেন। ওই চাবিগুলো দয়া করে নিয়ে যাবেন।... আমরা একটু খোলামেলা থাকতে চাই। আগে ওই চাবিগুলো ছিল না। আমরা ছিলাম। অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছি। (পৃ.৩৮৫-৩৮৬)

নীল কমল নাটকটি বিষয়গত দিক থেকে শুধু নয়, শৈল্পিক দিক থেকেও গুরুত্ববহ। সংলাপ বয়নে নাট্যকার এখানে অধিকতর সার্থক। বিশেষত ডাক্তার মাহবুবুল আলমের চেম্বারে ধনুমামা-জাফর-একজন অপেক্ষমান রোগীর সঙ্গী এবং ডাক্তারের সহকারীর সংলাপ নাটকের পরিবেশকে করে তুলেছে রহস্যব্যঞ্জিত এবং বক্তব্যকে প্রদান করেছে বহুমাত্রিকতা :

> সঙ্গী : এখন কী রকম মনে করেন।
>
> মামা : এসব সিরিয়াস ব্যাপার।
>
> সঙ্গী : কিছু একটা করুন কাইন্ডলি।
>
> মামা : তুমি আমাকে যখন বলছ, কিছু একটা না করে ছাড়ব না।
>
> সঙ্গী : এরকম কোনোদিন হয়নি।
>
> সহকারী : হয়নি বলে যে হবে না তা তো বলা যায় না।
>
> জাফর : আমি ভাবতেও পারি না।
>
> সহকারী : আমরা পুরো ইনভেস্টিগেশন করব। (পৃ.৩৬৬)

এখানে সঙ্গীর সংলাপে জাফরের উৎকণ্ঠা এবং সহকারীর সংলাপে প্রতিফলিত হয়েছে ধনুমামার বক্তব্য। আবার জাফর যখন নিসার সম্পর্কে যুক্তিহীন উদ্ভট ভাবনায় তড়িত, তখন তার মেয়ে রীনা উত্থাপন করে অকেজো ক্যালকুলেটর প্রসঙ্গ, যা রীতিমতো প্রতীকী– 'হলো না। বোধ হয় ব্যাটারি নেই। আগাগোড়া হিসাবেই ভুল।' (পৃ.৩৭৩)

এ নাটকে প্রায়শ প্রযুক্ত হয়েছে লোকজ শব্দ। যেমন :

> ক) বেবিট্যাক্সি : করুম কী। ত্যাল নাই। অদ্দুর যাব না। (পৃ.৩৬২)
>
> খ) পান্নাঃ তেনারা পরে খাইব। (পৃ. ৩৭৩)

তবে সংলাপের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নাটক *ছায়াহরিণে*র প্রভাব লক্ষ করা যায়। *নীল-কমলে*র জাফরের সংলাপ এবং *ছায়াহরিণে*র হাসিনার সংলাপের রয়েছে যথেষ্ট সাযুজ্য। লক্ষণীয় যে, এরা উভয়েই অন্যের প্ররোচনায় তাদের কাছের মানুষদের অকারণে সন্দেহ করেছে। *নীল-কমলে* জাফর তার ভাই নিসারকে বলেছে – 'দুটো-চারটি পয়সা জীবনে বড় নয়। সততা বড়। বড় অনেস্টি।' (পৃ.৩৭৪) অন্যদিকে *ছায়াহরিণে* হাসিনা তার বোন ডালিয়াকে উদ্দেশ

করে উচ্চারণ করে প্রায় একই বক্তব্য– 'ছেলেমানুষি করিস না ডালিয়া। সংসারে মানুষের ইজ্জতটাই সব।' (তৃতীয় পর্ব)

পরিশেষে বলা যায়, *নীল-কমল* নাটকে আনিস চৌধুরী নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে নাট্যরূপ প্রদান করেছেন। পাশাপাশি সন্দেহগ্রস্ততা এবং তৃতীয় পক্ষের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ একটি সুখী, সমৃদ্ধ পরিবারকে কীভাবে সংকটময় করে তোলে– তাও প্রতিপাদন করেছেন তিনি।

তারা ঝরার দিন

মধ্যবিত্ত পরিবারের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, হতাশা ও ব্যর্থতা শব্দরূপ পেয়েছে *তারা ঝরার দিনে*। এ নাটকে এমন একটি পরিবারের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যার অধিকাংশ সদস্য নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, আপন আপন ভবিতব্য নিয়ে ভাবিত। মধ্যবিত্ত এ পরিবারের গৃহপরিসরের বর্ণনা নাটকে প্রদত্ত হয়েছে এভাবে :

> মামুলি সাজানো ঘর।... দরজার পাশেই পাতা বিছানা। বিছানার তলায় জুতো, স্যান্ডেল। বিছানার মাথার দিকে টেবিল। তাতে নানা ধরনের জিনিস যেমন বইপত্র, আয়না, ক্রিমের কৌটা, তেলের শিশি, আয়না, প্রসাধন সামগ্রী, ফ্ল্যাক্স, গ্লাস এবং শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্প। জিনিসপত্র ইতস্তত ছড়ানো। (পৃ.৩৮৯)

নাটকে দেখা যায়, একই পরিবারভুক্ত চার ভাইবোন : শওকত, শহীদ, মিনু ও রুবি। মিনু ব্যতিত সকলেই কর্মজীবী এবং খেয়ে না খেয়ে সঞ্চয়পিয়াসী। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়িতে শুরু হয় কর্মব্যস্ততা। অফিস-যাত্রার তাড়ায় অস্থির থাকে সবাই। অফিস নেই শুধু মিনুর। ছোট বোন রুবিকে সে বলে :

> ভালই আছিস তোরা যে যার চাকরি নিয়ে। মাসের শেষে মাইনে। কপাল শুধু আমারই ফাটল না। (পৃ.৩৯১)

মিনু বিধবা নারী। অনেক সাধ করে আনোয়ারের সঙ্গে পারিবারিকভাবে বিবাহ সম্পন্ন হলেও 'সংসারের মুখ দেখা' হয়নি তার। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন আনোয়ার। তারপর থেকেই মিনুর আশ্রয় ভাইদের সংসারে। এখানে তার একমাত্র কাজ সংসার-পরিচর্যা। ভাই-বোনদের প্রতি মিনুর স্নেহ-ভালোবাসা অন্তহীন। তাদেরকে নিয়েই সে অর্জন করতে চায় জীবনের আস্বাদ। তৎসত্ত্বেও মিনুকে সহ্য করতে হয় 'ঘরসুদ্ধ লোকের বকুনি'; কখনও

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালেন্ডার দিয়ে ঢেকে ফেলা হয় তার মুক্তিযোদ্ধা-স্বামীর ছবি, কখনওবা ছোট বোনের নিকট থেকে শুনতে হয় কটুবক্তব্য। কখনও কখনও পরোক্ষে মিনুকে উদ্দেশ করে অকারণে বর্ষিত হয় বিদ্বেষবাণ :

> ক্রিমের কৌটা খালি।... পয়সা দিয়ে আনি কি বাড়িসুদ্ধ লোকের জন্য? সাতভূতের কারবার। সুফিয়াই ভালো। দিব্যি হোস্টেলের কোয়ার্টারে থাকে। নিজের ঘর। নিজের জিনিসপত্র। কোনো ঝামেলা নেই। (পৃ.৩৯৩)

ছোট ভাই শহীদের আচরণও মিনুর প্রতি অমানবিক। মিনুর তৈরি চা তার কাছে বারোয়ারি চা বলেই মনে হয়। তাই সকাল হলেই সে চলে যায় রেস্তোরাঁয়। আবার সারা মাসের সঞ্চয় মিনুর নিকট গচ্ছিত রাখলেও তাকেই সে সন্দেহ করে। অবশ্য এক পর্যায়ে শহীদের এ-আচরণের জোর-প্রতিবাদও করে মিনু–

> কী হয়েছে তোমার বলো তো? বাড়িসুদ্ধ লোককে সন্দেহ। এতোই যখন দুর্ভাবনা, নিজের কাছে রাখলেই পার। আমি পারব না। (পৃ.৩৯৪)

নাটকে মিনু অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। ভাইদের অনুগ্রহে দিনযাপন করতে সে নারাজ। স্বামীর 'প্রভিডেন্ট ফান্ডে'র টাকা থেকে সে নিজেও বহন করে পারিবারিক ব্যয়ের সামান্য অংশ। পরিবারের অন্য সদস্যরা যখন সকল কিছু অর্থের মানদণ্ডে বিচার করে, তখন মিনুর কাছে বড়ো হয়ে ওঠে হৃদয়ের আবেদন।

পরিবারে মা আর রুবিই মিনুর সকল সুখ-দুঃখের সঙ্গী। মায়ের কাছেও মিনু ছাড়া অন্য সন্তানরা 'ধরাছোঁয়া'র বাইরে। মায়ের সঙ্গে সে তার মিল খুঁজে পায় এভাবে– 'তুমি একা। একা আমিও, তাই বোধহয় আমরা এতো একাত্ম।' (পৃ. ৩৯৮) মিনুর ভবিষ্যৎ নিয়ে মায়েরও চিন্তার শেষ নেই। কিন্তু মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মিনু যা বলেছে, তা সত্যিকারের একজন দেশাত্মবোধী মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর বক্তব্য– 'তোমার মেয়ে একা নয়। মুক্তিযুদ্ধে আরো অনেক মেয়ের স্বামী প্রাণ হারিয়েছে মা।' (পৃ.৩৯৮)

আনিস চৌধুরীর নাটকে মিনুই প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চরিত্র। স্বাধীনতা অর্জনের পর এদেশীয়দের মধ্যে অনেকেই বিস্মৃত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যাঁরা অকাতরে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরাই একসময় তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে; স্বদেশবাসীর অবহেলা আর অশ্রদ্ধাই হয়ে ওঠে তাদের নিয়তি। *তারা ঝরার দিনে* নাটকে দৃশ্যবদ্ধ হয়েছে এরকম একটি পরিণতি-চিত্র :

> মিনু: আমার স্বামী মারা গেল হানাদার বাহিনীর হাতে। তোমরা দুদিন শোক করলে। বললে স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে হয় মানুষকে।
>
> শওকত : সেজন্য আমরা আনোয়ারকে শ্রদ্ধা করি।
>
> মিনু: (ছবির কাছে গিয়ে, ফ্রেমের ওপর চটুল চিত্র তারপর ক্যালেন্ডারখানা দেখিয়ে) করো না। ভীষণ শ্রদ্ধা করো।
>
> শহীদ: (ক্যালেন্ডারখানা সরিয়ে দিয়ে) এটা কেউ না দেখেশুনে রেখেছে বোধ হয়। আমার মনে হয় এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে – (পৃ.৪১৩)

এতকিছুর পরও ভাইদের প্রতি মিনু যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। সবধরনের অবহেলা অপমানকে তুচ্ছজ্ঞান করে সে তাদের প্রতি জেগে ওঠে প্রবল মমতায়। তাই বাড়ি ছাড়বার প্রাক্কালেও তার শুভকামনা ছিল স্বার্থান্ধ ভাইদের প্রতি :

> আর যাই হই অতটা অমানুষ এখনো হইনি। নিশ্চয়ই চাই তোমরা বড় হও, উন্নতি করো। তবু যদি কখনো বিপদে পড়ো, নিঃস্ব কপর্দকশূন্য হও, এসো– আমরা আছি। (পৃ .৪১৫)

মিনুর ছোটবোন রুবি। সকল কাজে সে বোনের ওপর নির্ভরশীল। বোনের সঙ্গে তার অম্ল-মধুর সম্পর্ক। অফিস যাবার সময় একদিকে সে যেমন মিনুর কানের দুল ব্যবহার করে, অন্যদিকে ক্রিমের কৌটা খালি দেখে বোনের ওপর ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তবে বাহ্যিক আচরণ যেমনই হোক, মিনুর প্রতি তার ভালোবাসা অফুরন্ত। সংসারে ভাইদের অবহেলা এবং উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে রুবি হয় চাকরি জোগাড় করে নেয়। কিন্তু সেখানেও তৈরি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত বিরূপতা। অফিসে আধাঘণ্টা বিলম্ব হবার কারণে ম্যানেজারের নিকট তাকে শুনতে হয় কড়া-ভাষণ। আবার কালেক্টরের 'বিল' আদায়ে ব্যর্থতার দায়ও বহন করতে হয় তাকে। অবশ্য রুবিকে এভাবে বিচলিত করবার মূলে ছিল ম্যানেজারের অন্যরকম উদ্দেশ্য–

> খান না, এই তো? নিন। বিষ দিচ্ছি না। এটা খেয়ে চটপট চলে যান মি. তালুকদারের ওখানে। বলাই আছে। একটু বুঝিয়ে বলবেন এই আর কি। আমার মনে হয় একটু পারস্যু করলে– (পৃ.৪০০)

এই তালুকদারের চরিত্রবৈশিষ্ট্যও চিত্রিত হয়েছে বিলক্লার্কের সংলাপে–

> আর সত্যি কথা বলতে, তালুকদারের কাছে যাচ্ছেন তো ? মেয়েদের দেখলে নাকি এমনিতেই একটু উথলে ওঠেন। যা কানে আসে তাই বলছি। কিছু আবার মাইন্ড করবেন না। (পৃ.৪০১)

এরূপ তথ্য অবগত হয়ে রুবি প্রথমে এ-কাজে অপারগতা প্রকাশ করলেও সমস্যাদীর্ণ পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার প্রশ্নে আপস করতে বাধ্য হয় এবং পরিণামে তাকে সহ্য করতে

Dhaka University Institutional Repository

হয় অনাকাঙ্ক্ষিত অপমান, যা নারীত্বের জন্য চরম বেদনাদায়ক। মিনুর সঙ্গে রুবির কথোপকথনসূত্রে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় :

> রুবি: গেলাম টেলিফোন করে তালুকদারের অফিসে। সেখানে বসেই সেরে ফেললাম দুপুরের লাঞ্চ। তারপর, তারপর শুনি–
>
> মিনু: হ্যাঁ বল শুনছি।
>
> রুবি: তারপর? তারপর ওর গাড়িতে চড়ে মস্তবড় এক হোটেলে। লিফটে উঠে সোজা ওর কামরায়। (দুষ্টুমির ভঙ্গিতে) তারপর একটু মিষ্টি হাসি হেসে বললাম, স্যার আমাদের বিলটা।
>
> মিনু: (অস্বস্তি বোধ করে। বিছানা থেকে উঠে পড়ে মাথায় খোঁপা ঠিক করতে করতে) আবার হোটেল, হোটেল কেন?
>
> রুবি: বা রে, বলল যে ওর চেক বই হোটেলের কামরায়। (পৃ.৪০৫)

'আজ এ হোটেলে, কাল ও হোটেলে' থাকবার কারণে নিজের ভবিষ্যৎ একসময় তার কাছে অনিশ্চিত মনে হয়। তাই এ-জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রুবি গ্রহণ করে কঠোর সিদ্ধান্ত– চাকরি ছেড়ে মায়ের সঙ্গে সে নিজেও চলে যাবে গ্রামে। রুবির এ-সিদ্ধান্তে বাধা প্রদান করে মিনু ও তার মা এবং বলে–

> দেখছ না মা, দুটো পয়সার লোভে মানুষ কী হয়ে যাচ্ছে। তারপরও তুমি চাও আমি চাকরি করে উচ্ছন্নে যাই। (পৃ.৪১৪)

এ-চাকরিই রুবির সঙ্গে তার মায়ের দূরত্ব সৃষ্টি করে। একসময় মাকে সে বিকেলবেলা চুল আঁচড়ে দিত, চাকরিপ্রাপ্তির পর এ সুযোগ তার আর হয়ে ওঠে না। তবে মায়ের বাড়তি চাহিদা সে-ই পূরণ করেছে চাকরির মাধ্যমে। মায়ের চশমা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উপার্জনক্ষম ভাইয়েরা অক্ষমতা ব্যক্ত করলেও রুবি তা নিয়ে আসে বিনাবাক্যব্যয়ে।

এত দুঃখকষ্টের পরও একরকম সুখেই কালাতিক্রম করছিল মিনুরা। কিন্তু অকস্মাৎ শওকত আর শহীদের উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন বিনষ্ট করে এ-পরিবারের সকল সুখ-শান্তি। অধিক উপার্জনের প্রত্যাশায় এক অচেনা 'পার্টনারে'র সঙ্গে তারা গড়ে তুলতে চায় 'প্রোগ্রেসিভ ইন্ডাস্ট্রিজ' নামের একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এজন্য উভয়ের সঞ্চিত তহবিলে টান পড়ে এবং অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই মিনুর কাছে তারা দাবি করে বাড়িওয়ালার নিকট রক্ষিত অগ্রিম ভাড়া-বাবদ পাঁচ হাজার টাকা। শুধু তাই নয়, ভাড়া বাড়ি ছেড়ে মিনু এবং মাকে গ্রামে চলে যাবার পরামর্শ দেয় তারা; পাশাপাশি ছোটবোন রুবিকে তারা রাখতে চায় হোস্টেলে। এভাবে লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে মধ্যবিত্তসুলভ বিত্তপরিসর ভেঙে ওপরে ওঠবার প্রয়াস তাদের মানবিক মূল্যবোধকে করে তোলে বিপর্যস্ত। এ-পর্যায়ে মিনু বলেছে–

Dhaka University Institutional Repository

> দাম, দাম, টাকা, টাকা করো না তো। কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এ জীবন কি শুধু কিছু পয়সার সমষ্টি। প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ-মমতা বলে কিছু নেই ? কী হয়ে যাচ্ছ তোমরা ? (পৃ.৪০৯)

মিনুর কোনো যুক্তিই স্বীকার করতে নারাজ তার ভাইয়েরা। ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের নেশায় তারা অস্বীকার করতে চায় বর্তমানকে। কিন্তু এতকিছুর পরও বাস্তবায়িত হয় না মধ্যবিত্তের লালিত স্বপ্ন। কষ্টার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করে পলায়ন করে তাদের ব্যবসায়িক সঙ্গী। এ-পর্যায়ে শহীদের কণ্ঠে প্রতিফলিত হয় মধ্যবিত্ত-চিত্তের হতাশার সুর :

> আমার কথা ভাব। তোমরা জানো না 'মাইজার' বলে আমার দুর্নাম। আমি টিফিন করিনি। পুওর ফান্ডে চাঁদা দিইনি। কোনো পিকনিক-সিনেমায় যাইনি। পাই পাই করে জমানো টাকা। (পৃ.৪১৯)

মধ্যবিত্তের এরূপ পরাজিত-পরিণাম আনিস চৌধুরীর নাটকে যথার্থই সুলভ। এ-নাটকের পরিসমাপ্তিও আশাজাগানিয়া নয়, বরং নিরাশার অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত –

> মা: বাতি জ্বালা। সন্ধে হয়ে এলো।
> রুবি: (সুইট টিপল) জ্বলছে না। বাতি ফিউজ হয়নি তো।
> মিনু: কই পাশের বাড়িতে তো জ্বলছে।
> রুবি: গত মাসের ইলেকট্রিসিটির বিল দেওয়া হয়নি। বোধ হয় কেটে দিয়েছে।
> শওকত: তাই হবে। (পৃ.৪২২)

রুবির সহকর্মী রীতা এ-নাটকে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। তৎকালীন নারীসমাজের শোচনীয় চিত্র নাট্যকার অধিকতর বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন এ-চরিত্রের মাধ্যমে । রুবির মতো রীতারও কাজ 'বিল কালেকশন'। তার অবস্থানটি তারই উচ্চারিত বক্তব্য-ভাষ্যে এরকম– 'চুনোপুঁটিদের জন্য আমি। আর রাঘব বোয়ালদের জন্যে' রুবি। তাই রীতার দৃষ্টিতে তাদের অফিসের ম্যানেজার আর 'ফিল্মওয়ালা'দের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। ফলত, চাকরি ছেড়ে সে যেতে চায় ফিল্মে। তবে রীতার ফিল্ম-ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশের গল্পটিও সুখের নয় :

> রুবি: ফিল্মে চান্স পেলে কেমন করে-
> রীতা : ওমা পেলাম কই। বলেছে দেবে।...
> রুবি : তারপর?
> রীতা : তারপর আর কী। মানে আমি গেলেই দেখ কেমন, একটু ইয়ে করে।
> রুবি : ইয়ে মানে?
> রীতা : মানে, এই আর কী। কী বলছিলাম যেন।...
> রুবি : ওরা বুঝি ফিল্ম বানায়?

রীত: না, বানায়নি। বানাবে বলেছে। আর প্রথমে তো হিরোইনের চান্স দিতে পারে না। একটা সাইড রোল দেবে বলেছে। (পৃ.৪০২-৪০৩)

'ঘাড়ের ওপর তিন-তিনটে বোন, ছোট দুভাইয়ের' কথা বিবেচনা করে রীতাও 'ফিল্মওয়ালা'দের অনৈতিক-বাসনাকে স্বীকার করে নেয় নির্দ্বিধায়।

পূর্ববর্তী *নীল-কমল* নাটকের মতো *তারা ঝরার দিনে*ও নেই কোনো পর্ব বা অঙ্ক বিভাজন এবং প্রতীক-সৃজনেও নাট্যকার *নীল-কমলে*র মতোই সার্থক। হোটেলের কামরায় রুবির অপমান এবং পত্রিকার পাতায় নানা দুর্ঘটনা ও অসংগতির চিত্র একাকার হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে নাটকে :

মিনু : এসব চাকরি করায় নাকি তোকে দিয়ে আজকাল।

রুবি ; খারাপ কী দেখলি। দরকার হলে আবার যেতে হবে।... (কাগজখানা চোখ বুলিয়ে) লেবাননে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, চাপাঘাটায় ট্রেন লাইনচ্যুত– এই, এই দেখ বিশ্বসুন্দরী মিস ব্রাজিল, কেমন থেবড়ো মুখ না রে– কী যে ওদের রুচি, বুঝি না বাপু। (পৃ.৪০৫)

প্রতীকী-পরিচর্যার পাশাপাশি নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার :

ক) নাটকের চমৎকার সংলাপের মতো। (পৃ.৪০৩)

খ) কখন হালকা মেঘের মতো তা সরে গেল। (পৃ. ৪০৪)

উৎপ্রেক্ষা:

ক) ওরা যেন আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। (পৃ.৩৯৭)

খ) তবু মনে হয় কতদিন। যেন এক যুগ। (পৃ.৩৯৮)

গ) মা মেয়ে যেন কতকালের সঙ্গী। (পৃ. ৩৯৮)

প্রবাদ : আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কী কাজ। (পৃ.৪০১)

বাগধারা:

ক) দশভূতের পাল্লায় পড়লে হয়তো চা খাওয়াটাই হবে না। (পৃ.৪০৭)

খ) আমরা কী নাচের পুতুল। যখন যেমন খুশি নাচাবে। (পৃ.৪২০)

এ-নাটকের সংলাপে অবলীলায় ব্যবহৃত হয়েছে বাংলার নানা লৌকিক অনুষঙ্গ। যেমন–

ক) আমি কেন, বাকিরা কি সব বানের জলে ভেসে এলো নাকি। (পৃ.৩৯৬)

খ) খুব তো ঢোঁ ঢোঁ করে ঘুরে বেড়াস। (পৃ.৪০৮)

সততা আর আদর্শনিষ্ঠাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিত্তবৈভবের উত্তাল স্রোতে গা ভাসানোর নাম জীবন নয়। কিন্তু মধ্যবিত্তের একটি শ্রেণি এরূপ হীন পন্থায় অর্জন করতে চায় বৈষয়িক

সমৃদ্ধি। এভাবে শেকড়কে অস্বীকার করে নাগরিক ভোগবিলাসে মত্ত থাকবার তীব্র বাসনা মধ্যবিত্ত জীবনকে কীরূপ বিপর্যস্ত ও সংকটময় করতে পারে, তারই বিশ্বস্ত ভাষ্য *তারা ঝরার দিন*।

বলাকা অনেক দূরে

ক্রসিংয়ের জন্য ট্রেন যথাসময়ে না পৌঁছায় নিশাপুরের হোটেল প্যারাডাইসের শেষ কামরাটিও হারায় রিয়াজ-কেয়া দম্পতি। একটানা ছয় ঘণ্টা ট্রেন-ভ্রমণ, অন্যদিকে অনিশ্চিত রাত্রি যাপনের চিন্তা এসময় তাদের করে তোলে উদ্ভ্রান্ত-দিশেহারা। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের একমাত্র শিশু-সন্তান টুনির নানা আবদার পূরণের বিড়ম্বনা। পার্শ্ববর্তী হোটেল পামভিউতেও কোনো কক্ষ বরাদ্দ পেতে ব্যর্থ হয় তারা। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে হোটেলের এক কর্মচারী তাদের পরামর্শ দেয় চারশো পাঁচ বি– নম্বর স্যুটের বাসিন্দা সাবেরের সঙ্গে স্যুট 'শেয়ারের' জন্যে। এ-সংবাদ তৎক্ষণাৎ সচকিত করে তোলে কেয়াকে– 'পুরো একটা স্যুটে একা। কোনো মানে হয়; আমরা জায়গা পাচ্ছি না।' (পৃ.৪৩৩)

নাটকের একপর্যায়ে হোটেলের কর্মচারী রিয়াজ-কেয়া দম্পতির পক্ষ নিয়ে সাবেরকে রুম-শেয়ারের জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু এ প্রস্তাবে কোনোভাবেই সম্মতি প্রদান করে না সে। এরূপ আচরণে মর্মাহত হয়ে রিয়াজ তার মনোভাব ব্যক্ত করে এভাবে–

> ব্যাটা ছোটলোক। তা না হলে একটা রাতের জন্য– আর বাবা তাও তো বিনে পয়সায় থাকছিলাম না। (পৃ.৪৩৬)

অবশ্য কিছুক্ষণ পর সবাইকে অবাক দিয়ে করে সাবের যে প্রস্তাব প্রদান করে, তা রীতিমত অপ্রত্যাশিত :

> সাবের: আপনারা যান। সব ঠিক করা আছে। এই যে চাবি–
> রিয়াজ: তার মানে, আপনি?
> সাবের: আমি কোনোরকম লাউঞ্জে বসে– (পৃ.৪৩৭)

ইতোমধ্যে রিয়াজ জানতে পারে নিশাপুরের আবহাওয়া সঙ্কটজনক। সাত নম্বর সতর্ক-সংকেত দেখানো হয়েছে সেখানে। একটানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নেমেছে এবং অধিকাংশ রাস্তা হয়ে উঠেছে চলাচল অনুপযোগী। বেতার-তরঙ্গেও শোনা যাচ্ছে বিপজ্জনক বাণী :

> প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা আরো বাড়তে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের মূল কেন্দ্রে বাতাসের গতি ঘণ্টায় সত্বর থেকে আশি মাইল। সব সমুদ্রবন্দরকে মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। মহাবিপদে প্রস্তুতি নেবার জন্য উপকূলবর্তী লোকদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। (পৃ.৪৫১)

এমতাবস্থায় রিয়াজ বাইরে বের হয় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এই অবকাশে সাবের কেয়াকে অনুরোধ করে– সে মারা গেলে তার মৃত্যুর খবর জানাতে হবে এমন দুজনকে, যাদের একজন তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠাতে চেয়েছিল এবং অপরজন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এসময় কেয়ার কাছে উন্মোচিত হয়– সাবেরের সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে এমন এক নারী– যে তার কাছে ভালোবাসা প্রত্যাশা করে অথচ চূড়ান্তভাবে গ্রহণে করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। এ রহস্যময়ী নারীর কারণেই বিপ্রতীপ অনুভবে আন্দোলিত হয় সাবের এবং জাগ্রত হয় ইতিবাচক জীবনোপলব্ধিতে। কারণ সাবেরকে সে বলেছে :

> বুকে ধারণ করতে পারছ। চোখের তারায় ঠাঁই দিচ্ছ। মৌসুমি হাওয়ায় পদধ্বনি শুনছ– আর কি! দূরে আছি বলেই কাছে টানতে পারছ। আমাকে ঘরের পোষমানা শেকলটা না ই বা পরালে। (পৃ. ৪৫৪-৪৫৫)

অতঃপর ঘটনামঞ্চে রিয়াজের আবির্ভাব ঘটে। কেয়াকে নিয়ে সে এই দুর্যোগপূর্ণ স্থান পরিত্যাগ করতে চায় তারই বন্ধু মঞ্জুরের গাড়িতে চড়ে। এজন্য রিয়াজ নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করতে চায় তাদের গৃহকর্মী আম্বিয়া ও আপৎকালের ত্রাতা সাবেরকে। পক্ষান্তরে রিয়াজ-কেয়ার বিপদের কথা বিবেচনা করে সাবের অস্বীকার করে নিজেকে রক্ষা করবার সুযোগ। এতদ্বিষয়ে তার যুক্তি:

> পাগল, আমি একলা যাবো কেন। ব্যাপারটা চিন্তা করুন– আপনারা রয়ে গেলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে আর আমি কেটে পড়লাম– এটা হয় নাকি? (পৃ.৪৫৬)

এমতাবস্থায় সাবের এবং আম্বিয়া নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে রিয়াজ কেয়াকে সঙ্গে করে হোটেল ত্যাগ করতে চায় গোপনে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রবলভাবে আপত্তি তোলে কেয়া। দুঃসময়ের সঙ্গীদের ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতো সে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু কেয়ার এরূপ মানবিক সিদ্ধান্তের অশালীন ব্যাখ্যা দাঁড় করায় রিয়াজ :

> রিয়াজ: চেঁচিও না। যা সত্যি তাই বলছি। আসলে বলো ভদ্রলোককে ছেড়ে যেতে পারো না। কষ্ট হয়।
>
> কেয়া: ছেড়ে যেতে চাই না। পারি না বলিনি। কষ্ট তো হয়ই।
>
> রিয়াজ: সে কথাই বলছিলাম।

> কেয়া: যা খুশি ভাবো, কিছু এসে যায় না। ইয়েস আই কেয়ার ফর হিম। আই কেয়ার ফর হার। অন্তত এই বোধটুকু এখনো হারিয়ে যায়নি । (আম্বিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।) (পৃ. ৪৫৯)

এরপর মঞ্জুর গাড়ি নিয়ে হোটেলে আসে ঠিকই, কিন্তু কেয়া তার সিদ্ধান্তে থাকে অটল। এমনকি মঞ্জুর এবং তার স্ত্রী বীথির অনুরোধও কেয়াকে তার অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অবশেষে মঞ্জুর তাকে আশ্বাস দেয়– তাদের পৌঁছে দিয়ে সে আবার গাড়ি নিয়ে হোটেলে আসবে, সেই সঙ্গে সাবের এবং আম্বিয়াকে উদ্ধারেরও পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করে সে। মঞ্জুরের প্রতিশ্রুতিতে কেয়া গাড়িতে উঠলেও তার চিন্তাজগৎ জুড়ে থাকে ঘুমন্ত দুটি মানুষ : সাবের এবং আম্বিয়া। এ পর্যায়ে রিয়াজ তাকে হোটেলকক্ষ থেকে স্বর্ণের গয়নাগুলো আনবার কথা বললে সে নির্বিকারচিত্তে জানায় :

> সেখানেই থাক। সোনার চেয়ে অনেক দামি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; ওদের রেখে যেতে পারলে ওই সামান্য গয়নার জন্যে– (পৃ.৪৬০-৪৬১)

তারপর সত্যিই মাঝরাতে নিশাপুরে আঘাত হানে ভয়ংকর সাইক্লোন। সাবেরের কামরা থেকে জিনিসপত্র গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। সাবের এবং আম্বিয়া উপলব্ধি করতে পারে, তারা ছাড়া হোটেলে 'আর একটা মানুষও নাই।' প্রচণ্ড ঝড়ে উড়ে যায় সাবেরের সমস্ত জীবনের লেখা। হঠাৎ জানালার একটি কপাট এবং একটি ফার্নিচার এসে পড়ে তার ওপর; এবং সে-মুহূর্তেই অচেতন হয়ে পড়ে সাবের। একইরকম আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অন্ধত্ব বরণ করতে হয় আম্বিয়াকে। ঝড়ের পর জানা যায়, হাজারখানেক লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে এ প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোনে। নাটকের শেষাংশে দেখা যায়, হাসপাতালে সাবেরের মৃতদেহ শনাক্ত করে রিয়াজ এবং এই দুর্ঘটনা থেকে রিয়াজ এবং কেয়ার রক্ষা পাওয়াকে ডাক্তার অভিহিত করেন 'পরম সৌভাগ্য' হিসেবে। কিন্তু কেয়ার কাছে এর তাৎপর্য অন্যরকম :

> সৌভাগ্য! কী জানি। অনেকের জন্যে বেঁচে থাকাটাই মৃত্যু। আবার অনেকের জন্যে মৃত্যুটাই বেঁচে যাওয়া। (পৃ.৪৭২)

এ নাটকে এক অদ্ভুত চরিত্র সাবের। 'লম্বামতো লোক গলায় মাফলার, মাথায় ক্যানভাসের টুপি, কাঁধে হ্যাভারস্যাক, পায়ে বুটজুতো।' (পৃ.৪৩৫) শুধু বেশভূষায় নয়, আচার-আচরণেও সে ব্যতিক্রমধর্মী। কখনও রাতে আলো জ্বেলে বসে থাকে, কখনও ডায়েরি লেখে, কখনও বেহালা বাজায় আবার কখনওবা রেডিও শুনে রাত অতিক্রম করে সাবের। দেড় মাস যাবৎ হোটেল প্যারাডাইসে থেকে সে যাপন করছে নিভৃতচারীর জীবন। সারাদিন বাইরে সময়

অতিবাহিত করে রাতে হোটেলে ফেরে সে। কেয়ার সঙ্গে সাবেরের সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে তার নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তিত্ব :

> জানেন, গত দশদিন কারো সঙ্গে এতটুকু কথা হয়নি।... আমি নিজে গিয়ে গায়ে পড়ে আলাপ করিনি। আমার সঙ্গেও আর কেউ আলাপ করতে আসবে না। সুপুরুষ নই। খ্যাতিমান লেখক বা ফিল্মস্টার নই। (পৃ.৪৩৮)

আবার সাবেরের সঙ্গে রিয়াজ হোটেলকক্ষের ভাড়া 'শেয়ার' করতে চাইলে সে যা বলে, তাতে প্রতিপন্ন হয় তার বিধ্বস্ত চিত্তজাগতিক পরিস্থিতি :

> শেয়ার করবেন, কী শেয়ার করবেন। হোটেলের ভাড়া ? সবটুকু শেয়ার করুন না। আমার যন্ত্রণা আমার দুঃখ-কষ্ট, আমার এগুলো শেয়ার করবে কে। (পৃ. ৪৩৯)

মূলত সমগ্র জীবন উদ্বাস্তুর মতো কেটেছে সাবেরের। 'কখনো আত্মীয়, কখনো অনাত্মীয়, কখনো স্যাঁতস্যাঁতে বিছানা, আবার কখনো তক্তপোষে'র মধ্যে কেটেছে তার জীবন। তাই সাজানো গোছানো পরিবেশ তার নিকট হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর। দেশলাই খুঁজতে গিয়ে কেয়া তার টেবিলটা গুছিয়ে রাখলে সে প্রতিবাদ করে বলে – 'আপনি গুছিয়ে দেবেন রোজ? চাদর পালটে দেবেন। ঝুল ঝেড়ে দেবেন?' (পৃ.৪৪৫) তার এরূপ আচরণের মধ্য দিয়ে কেয়া অল্পক্ষণেই অনুধাবণ করতে পারে সাবেরের পুরো জীবন বেদনাভারে বিপর্যস্ত। কেয়ার এ ধারণা আরও প্রতিষ্ঠিত হয় সাবেরের ডায়েরি পাঠ-সূত্রে। ডায়েরির কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য :

> জীবনে চলার পথে সবাই আমরা ধাবমান কালের সহযাত্রী। সেই যাত্রায় কত মানুষ কত চেনা-অচেনা মুখের ভিড়।... কেউ আত্মীয়। কেউ আত্মীয় না হলেও তারা আত্মীয়। আবার হয়তো কেউ পরম উপেক্ষায় নিষ্ঠুর। (পৃ.৪৪৭)

লোকজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ সাবের তাই সামান্য প্রশান্তির মোহে আশ্রয় নেয় হোটেল প্যারাডাইসের অভিজাত স্যুটে। তেইশ বছরের জমানো সঞ্চয়, তেইশ দিনেই প্রায় নিঃশেষ হবার উপক্রম হলেও তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না কোনো সচেতনতাবোধ। আবার ঝড়ের তাণ্ডবে মৃত্যুকে সন্নিকটে জেনেও সে আম্বিয়াকে জানায়– 'আজ আমার জন্মদিন ছিল।' এরপর সাবের কেক কাটে, আম্বিয়ার অনুরোধে বেহালা বাজায়। বাইরে বাতাসের গর্জন বৃদ্ধি পেলে সাবের অবচেতন-মনে নিজেকে উদ্দেশ করে যা বলে, তাতে উদ্ভাসিত হয় তার বীরত্বব্যঞ্জক জীবনাখ্যান; জানা যায় সে একইসঙ্গে ভাষাসৈনিক এবং মুক্তিযোদ্ধা–

> এতো কাতর কেন? মৃত্যুভয়? হঠাৎ জীবন ফুরিয়ে যেতে পারে সেজন্য উৎকণ্ঠা ? কিন্তু তেমন যদি কিছু ঘটেই সেজন্যে অনুশোচনার কী আছে?... বায়ান্ন সালে কত কেউ মরল, তুমি মরলে না।

> একাত্তরে মরলে না। দুবারই বেঁচেছিলে। অন্তত তোমার ডায়েরিতে তাই লিখেছ। এবার চাওনি। অথচ–। (পৃ. ৪৬৫)

এভাবে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার চিত্র বিধৃত হয়েছে আনিস চৌধুরীর নাটকে; যদিও এ প্রকাশ খুব বলিষ্ঠ নয়।

আনিস চৌধুরীর *বলাকা অনেক দূরে* নাটকটি আলঙ্কারিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ নির্মিত হয়েছে এ নাটকে। কেয়া, রিয়াজ কিংবা আম্বিয়ার সংলাপ তাদের শ্রেণিগত পরিচয়টিকেই স্পষ্ট করে। কেয়ার সংলাপে পাওয়া যায় তার মননশীলতার পরিচয় :

> আশ্চর্য, কোনোদিন তো বলেননি। কী নাম আপনার সেই চমৎকার মানুষটির?... আড়ালে আবডালে না রেখে সেই মানুষটাকে ঘরে তুললেই তো পারেন। (পৃ.৪৫৪)

অন্যদিকে গৃহকর্মীর আম্বিয়ার সংলাপ এ রকম :

> আফা গো, আমি জিন্দেগীতে সাগর দেহি নাই। এইবার দেহাইবেন না? ... মা গো, আসমানের কী হাল দেখছেন। (পৃ.৪৪৩)

পাশাপাশি লোকপ্রচলিত বুলি, বাগধারা এবং উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের সফল ব্যবহার হয়েছে এখানে। যেমন :

> রিয়াজ: কেমন ডাট মেরে হনহন করে চলে গেল। (পৃ.৪৩৬)
> সাবের: দু'পয়সার মানুষ নয় আবার ফুটুনি কতো। (পৃ.৪৩৮)

বাগধারা– সব ব্যাপারে তোমার নাক গলানোর কী দরকার। (পৃ.৪৪২)

উৎপ্রেক্ষা– আমরা সবাই যেন হুজুগের একঝাঁক পাখি। এক ডালে থেকে নিয়ত অন্য ডালে। (পৃ.৪৪৭)

বলাকা অনেক দূরে নাটকে ব্যবহৃত ভাষা কখনও কখনও সংকেতধর্মী। যেমন, উদ্ধারকারী গাড়ির আসন-স্বল্পতার কারণে সাবের এবং আম্বিয়া আড়াল হলে কেয়াকে সঙ্গে করে রিয়াজ হোটেল ত্যাগে উদ্যত হয়। এ বিষয়টিকে রিয়াজের ভাবনালোকের আশ্রয়ে সংকেতায়িত করে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার– 'রাজা আর রানী। বাকি সব ধরাশায়ী।' (পৃ.৪৫৭)

আনিস চৌধুরীর রেডিওতে সুদীর্ঘ সময় কাজের প্রভাব পড়েছে নাটকেও। রেডিও-মাধ্যমের নানা অনুষ্ঠান এবং ঘূর্ণিঝড় চলাকালে রেডিও থেকে প্রচারিত নানা সতর্ক-বার্তা বারবার ঘোষিত হয়েছে নাটকে। যেমন :

> শুনলেন সংবাদ পর্যালোচনা। এখন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে গ্রামীণ প্রভাব সম্পর্কে বলছেন ডক্টর মাজহারুল ইসলাম। (পৃ.৪৪৮)

কিংবা–

> ...বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে মিশরীয় পক্ষ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। ওয়াশিংটনের ওয়াকিবহাল মহলের বরাত দিয়ে এএফপি জানাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
>
> খবর শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো আবার পড়ছি। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় হারিকেনের তীব্রতা নিয়ে আজ রাতে কোনো এক সময় উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানতে পারে। কায়রোতে মিশর-ইসরায়েল আলোচনায় নতুন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। (পৃ.৪৫২)

পরিশেষে বলা যায়, *বলাকা অনেক দূরে* নাটকে সাবেরের মাধ্যমে নাট্যকার স্বার্থবাদী মধ্যবিত্তের বিপরীতে প্রগতিশীল চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্তের পরিচয় উন্মোচন করেছেন। যদিও সাবের চরিত্রটি একরৈখিক এবং অতি-নাটকীয়, তারপরও আপাদমস্তক ত্যাগী মধ্যবিত্তের এরূপ চেহারা আনিস চৌধুরীর লেখনিতে অর্জন করেছে ভিন্ন মাত্রা।

রজনী

দৈনিক দেশবাণী কার্যালয়ের প্রাত্যহিক কর্ম-পরিসর অবলম্বনে রচিত হয় আনিস চৌধুরীর *রজনী* নাটক। লক্ষণীয় যে, নাট্যকার নিজেও প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে। ফলত এটি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। লেখকের কর্মজীবনলব্ধ এ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে *রজনী* নাটকে। প্রথম দৃশ্যে নাটকের পরিবেশ-বর্ণনায় এর প্রমাণও সুস্পষ্ট :

> মাঝামঝি জায়গা লম্বামতো টেবিল জুড়ে কার্যরত কিছু সাব-এডিটর। শিফট্ ইনচার্জ মাঝখানে। তার সামনে টেলিপ্রিন্টার থেকে ছেঁড়া মেসেজ গাদা করা।... দুটো টেলিফোন ঘনঘন বাজতে থাকে। কখনো কখনো ফোন টেপার শব্দ। লম্বা টেবিল সংলগ্ন ছোট্ট একটা টেবিলে টাইপরাইটার। যে কেউ সেখানে গিয়ে টাইপ করতে পারে। কামরার এক কোণে রাখা টেলিপ্রিন্টার। খবর আসা শুরু হলে একটানা শব্দ। (প্রথম দৃশ্য)

Dhaka University Institutional Repository

এ-পত্রিকার নির্ভীক সাংবাদিক কবির[১]। পেশাগত কারণে পরিবারের প্রতি খানিকটা উদাসীন তিনি। এমনকি অসুস্থ মেয়ের জন্য ঔষধ আনবার ফুরসতটুকুও নেই তাঁর। এ কারণে নিকটাত্মীয়দের কাছে খুব একটা 'পপুলার' নন তিনি। সাংবাদিকতা কবিরের পেশা নয়, নেশাও। তাই ভালো কোনো চাকরি গ্রহণের সুযোগ থাকলেও সাংবাদিকতাকে বিসর্জন দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর বাড়ির অতিথি কলিম যথার্থই বলেছেন :

> এই তোমাদের সাংবাদিকতা। সব সময়ই ছোটাই। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ব্যস্ততার তুফান তোলে। সে পরিমাণে দেয় না। তবু তোমরা ছাড়তে পার না। (পঞ্চম দৃশ্য)

কবিরের জীবনযাপন 'স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত পরিবেশে' হলেও মধ্যবিত্ত-সুলভ স্বার্থপরতার অভিযোগ তার চরিত্রে দাগ কাটেনি; বরং তাঁর মধ্যে মানুষের প্রতি কল্যাণবোধ, মমত্ববোধ এবং বৃহত্তর স্বার্থের আদর্শই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারাগঞ্জ-চান্দিনা মহাসড়কে ব্রিজ ভেঙে যাত্রীবাহী একটি বাস চলন্ত ট্রেনের ওপর পড়লে প্রাণ হারায় পঁচাশি জন যাত্রী– এই দুর্ঘটনার রহস্যোদ্‌ঘাটন করতে প্রয়াসী হন কবির। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ব্রিজটির প্রকৌশলী, ঠিকাদার, আর্কিটেক্ট, শ্রমিক সকলের সঙ্গেই মতবিনিময় করেন। অবশেষে দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তা হলো :

> প্রাথমিক কোনো শর্তই পূরণ হয়নি। মাটি পরীক্ষা হয়নি। সয়েল টেষ্টের নামে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে ওটার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। সিমেন্টের কোয়ালিটি খারাপ ছিল।

---

[১] আনিস চৌধুরীর নাটকে চরিত্রগুলোর নামের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই। যেমন : কবির নামটিই ব্যবহৃত হয়েছে চারটি নাটকে (*প্রত্যাশা*, *ছায়াহরিণ*, *যেখানে সূর্য*, *রজনী*), শওকত স্থান পেয়েছে চারটি নাট্যকর্মে (*প্রত্যাশা*, *চেহারা*, *তারা ঝরার দিন*, *রজনী*), কলিম নামটি এসেছে তিনটি নটকে (*মানচিত্র*, *এ্যালবাম*, *রজনী*)। এছাড়া একাধিক নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে ইফতেখার *(চেহারা*, *রজনী*), শহীদ (*তারা ঝরার দিন*, *রজনী*) এবং আব্দুল (*এ্যালবাম*, *যেখানে সূর্য*)। নারী-চরিত্রের নাম-নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রোকেয়া নামটি এসেছে চারটি নাটকে (*মানচিত্র*, *প্রত্যাশা*, *তবু অনন্য*, *নীল কমল*), রুবী তিনটি নাটকে (*এ্যালবাম*, *যেখানে সূর্য*, *তারা ঝরার দিন*) এবং রীতা নামটিও উল্লেখিত হয়েছে তিনটি নাটকে (*চেহারা*, *তবু অনন্য*, *তারা ঝরার দিন*)। চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রে নাট্যকারের দ্বিধাগ্রস্ততার প্রমাণ মেলে তাঁর কন্যা লুভা নাহিদ চৌধুরীর বক্তব্যে–

"গভীর রাতে শুনেছি আমার মা-কে ডেকে বলছেন, তাড়াতাড়ি একটা নাম বলো তো। বেবী ছাড়া কিছু মনে পড়ছে না...। অথবা অ্যাই, হাস্‌নাহেনা ছাড়া কোন ফুল নেই নাকি?" (উদ্ধৃত– *আনিস চৌধুরী : গল্প সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২)

> আর্কিটেক্ট রাজি হয়নি। জোর করে কাজ করানো হয়েছে। ব্রিজ তৈরি হবার পরও ইঞ্জিনিয়ার তিন-তিনবার সিরিয়াস ক্র্যাকের কথা বলে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। সে রিপোর্টও গায়েব। (তৃতীয় দৃশ্য)

তবে সংবাদটি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পূর্বেই কবিরকে সম্মুখীন হতে হয় নানা জটিলতার। স্বয়ং পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক সিরাজ সংবাদটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আপত্তি করে। সম্পাদককে সে বলে :

> স্যার, মিছিমিছি এতবড়ো রিস্ক নেওয়া কি ঠিক হবে! আমার তো মনে হয় এ পর্যায়ে ঘাঁটিঘাঁটি করেই কী লাভ। লোকগুলো তো আর ফিরে আসবে না। সেন্টিমেন্টাল হয়ে লাভ নেই। (তৃতীয় দৃশ্য)

কিন্তু সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে কবির দৃঢ়-চিত্তে ঘোষণা করেছেন :

> সেটা মনে হয়েছিল দৈব-দুর্যোগ, সেটা কিছু নরপিশাচের ঘৃণিত চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়– অন্তত এটুকু তো সবাই জানবে। (প্রাগুক্ত)

মাহবুব *দৈনিক দেশবাণী* পত্রিকার সম্পাদক। বিলতলি নদীবক্ষে স্টিমার ডুবিতে প্রাণ হারায় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এতদ্বিষয়ক কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না তার মধ্যে। সিরাজের সঙ্গে কথোপকথনসূত্রে উন্মোচিত হয়েছে মাহবুব-চরিত্রের অন্তর্গত পরিচয় :

> যখন আমি বাড়িতে থাকি আমি দয়ালু এক পিতা এবং ভীরু এক স্বামী। অথচ এ চেয়ারে যখন বসি আমি হৃদয়হীন সম্রাট। সেখানে ভাবাবেগের কোনো স্থান নেই। (প্রাগুক্ত)

পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রিজ দুঘটনা সম্পর্কিত সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন মাহবুব এবং এক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের বাধা তিনি অতিক্রম করতে চান নিঃশঙ্কচিত্তে। কবিরকে লক্ষ করে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন :

> আজ যখন সুযোগ এসেছে ভয় করলে চলবে কেন ? তোমার পুরো রিপোর্টই ছাপাব। একটা অক্ষরও বাদ যাবে না। (প্রাগুক্ত)

সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে পত্রিকার বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের মতামতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না মাহবুব; বরং 'নীতিমালার প্রশ্নে, কাগজের পলিসি'র প্রশ্নে সম্পাদক হিসেবে তাঁর নিজস্ব মতকেই তিনি চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচনা করেন। সহকর্মীদের প্রতিও তিনি অন্তরিক ও সমব্যথী। তবে কবিরের রিপোর্টটি পত্রিকায় প্রকাশের পর তাঁকেও মুখোমুখি হতে হয় নানা প্রতিবন্ধকতার। টেলিফোনে একের পর এক হুমকি প্রদান করা হয় তাঁকে। কিন্তু এতে তাঁর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না কোনো ভাবান্তর, বরং এটিকে 'এক ধরনের চ্যালেঞ্জ' হিসেবেই গ্রহণ

করেন তিনি। তাই বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের চেয়ারম্যান মনসুর সংবাদটি প্রকাশে বিরোধিতা করলে তিনি নির্ভীকচিত্তে ঘোষণা করেন :

> এডিটর হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং পুরো দায়িত্ব নিয়েই আমি রিপোর্ট ছাপিয়েছি। (সপ্তম দৃশ্য)

অতঃপর মনসুর পত্রিকাটির মালিকানার বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি বলেন :

> কাগজ আপনার নয়। কাগজের ব্যবসা আপনার। কাগজ আমাদের। (সপ্তম দৃশ্য)

এরপরও যখন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ বিষয়টিকে জটিল করবার চেষ্টা করে, তখন আত্মসম্মানী মাহবুব পত্রিকা থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর এ পদত্যাগের পর *দৈনিক দেশবাণী* পত্রিকা অচল হয়ে পড়ে। এমনকি পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টিও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অবশেষে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস তাঁকে কর্মস্থলে পুনরায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। দায়িত্ব-সচেতন মাহবুব এ-পর্যায়ে তাদের অনুরোধ রক্ষা করেন ঠিকই; কিন্তু ব্রিজ কেলেঙ্কারির সংবাদটি প্রকাশের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো আপস করেননি তিনি। প্রাসঙ্গিক সংলাপ লক্ষণীয় :

> মাহবুব: কবিরের রিপোর্টের কথা বলতে চেয়েছিলাম। ওটা আশা করি ছাপা হবে?
> মনসুর: নিশ্চয় হবে। সম্পাদক হিসেবে আপনি যদি মনে করেন পত্রিকার কল্যাণের স্বার্থে যাওয়া দরকার অবশ্যই যাবে। বলুন, আর কোনো শর্ত? আমি আগে থেকেই আন্ডারটেকিং দিচ্ছি।
> মাহবুব: তার দরকার হবে না। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। তবু বলছি আমার লক্ষ্য একটাই ছিল এবং চিরদিন থাকবে।
> মনসুর: কী?
> মাহবুব: যাদের কথা বলব বলে প্রচার করে এসেছি এতদিন, তাদের কথা বলতে গেলে ভবিষ্যতে আর কোনো শর্তের দরকার হবে না। (অষ্টম দৃশ্য)

এ-নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে শহীদ, মুনীর, হেমায়েত, নাজির অন্যতম। শহীদ পত্রিকার শিফট্-ইন্-চার্জ। কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে হয় তাকে। গভীর রাতে তার কাছে আসে নানা টেলিফোন। শান্তচিত্তে সেগুলো সামাল দেন তিনি। সহকর্মীদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল হলেও দায়িত্বের প্রয়োজনে শহীদ আপোসহীন :

> শহীদ: আরে ভাই তোমাকে দিয়ে তো কিছু হবে না। হাত চালিয়ে কাজ করো।
> রব: চেষ্টা করছি স্যার।

> শহীদ: চেষ্টায় হবে না। আর তোমার ওই স্যার স্যার রাখ তো। ওই স্যার স্যার করতে যতো সময় ততক্ষণে আরো দশলাইন লেখা হয়ে যায়। (প্রথম দৃশ্য)

আবার কবিরের রিপোর্ট নিয়ে মনসুর যখন সম্পাদককে প্রশ্নজালে জর্জরিত করেছে, তখন শহীদ দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছে:

> অর্থলোভী কিছু নরঘাতকের মুখোশ খুলে ধরেছি– এতে আপনার খুশি হওয়া উচিত ছিল। (সপ্তম দৃশ্য)

মধ্যবিত্তের সুস্থ প্রতিবাদী-চেতনার কথা এভাবেই পরিবেশিত হয়েছে *রজনীতে* ।

শহীদের মতো মুনীরও নিষ্ঠাবান সাংবাদিক। পত্রিকার পেজ সেট-আপের সময় স্ত্রীর কঠিন অসুস্থতার টেলিগ্রামও তাঁকে দায়িত্বচ্যুত করতে পারেনি; বরং সহকর্মী সাহানা তাকে বাড়ি যেতে বললে প্রত্যুত্তরে তিনি জানিয়েছেন :

> আমি এখুনি চলে গেলে আপনার পেজ মেক-আপ পড়ে থাকবে। অথচ গেলেই স্টেশনে গাড়ি তৈরি পাব না। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

নাজির পত্রিকার শিক্ষানবিশ সাব-এডিটর। সাংবাদিকতায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত নাজির বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে প্রবেশ করে এ পেশায়। চাকরির এক পর্যায়ে অপারেশন থিয়েটারে মৃত্যুবরণ করে তার বড়ো ভাই। কিন্তু এ মৃত্যুসংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করতে না পেরে সম্পাদককে সে জানায় তার ক্ষোভের কথা :

> নাজির: তাই বলে নিজের ভাইয়ের খবরটাও দিতে পারবো না। ...
> মাহবুব: নাজির। আমরা এমন কেউ নই যে, পত্রিকায় আমাদের জন্ম-মৃত্যুর খবর ছাপিয়ে মানুষকে শোনাতে হবে। (চতুর্থ দৃশ্য)

অবশেষে নাজির অনুধাবন করে সাংবাদিকতার মূলতত্ত্ব– অর্থাৎ 'ব্যক্তিগত মান-অভিমান সুখ-দুঃখের ফিরিস্তি ছাপাবার জন্য পত্রিকা নয়।' (প্রাগুক্ত)

জীবনটাকে সহজভাবে বিশ্লেষণ করেন সাব এডিটর হেমায়েত। নাজির সাংবাদিকতার শুরুর দিকে যখন 'হেডলাইন' তৈরি নিয়ে বিচলিত, তখন তিনিই প্রদান করেন সহজ সমাধান। নাটকের শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, চরিত্রটি রীতিমতো প্রতিবাদী। বোর্ডের চেয়ারম্যান মনসুর তার পরিচালিত নানা 'ইন্ডাস্ট্রি'র সঙ্গে *দৈনিক দেশবাণী* পত্রিকার তুলনা করলে তিনি বলেন :

> এটা সে ধরনের ইন্ডাস্ট্রি নয়। এটা সাবানের, বালতির, তালার কারখানা নয়। এটা খবরের কাগজের অফিস। (অষ্টম দৃশ্য)

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক দেশবাণী পত্রিকার সাংবাদিকদের মধ্যে দলছুট ব্যক্তি যুগ্ম-সম্পাদক সিরাজ। সাংবাদিক হিসেবে সে আদর্শচালিত হয়নি, হয়েছে স্বার্থতাড়িত। নাটকে তার চিন্তা-চেতনা অসুস্থ এবং অপরিচ্ছন্ন। কবিরের রিপোর্টটি প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সে। অতঃপর মাহবুব সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করলে সে তোয়াজ-তোষামোদের মাধ্যমে সম্পাদক-পদটি আঁকড়ে ধরতে চায়। শুধু তাই নয়, মাহবুব সম্পর্কে সে উচ্চারণ করে অসত্য বক্তব্য :

> আমার মনে হয় এডিটর সাহেব আর একটু Practicle ও realistic হলে আজ আমাকে এসব Problem face করতে হতো না। হয়তো হলেও বয়স তো হয়েছে– Stuff দের ঠিকমতো tackle করতে পারছেন না। তাছাড়া এখানে কিছু adverse elementও আছে। আমি কিন্তু প্রথমেই কিছু লোককে 'স্যাক' করতে চাই। (অষ্টম দৃশ্য)

মনসুর *দৈনিক দেশবাণী* পত্রিকার বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের চেয়ারম্যান; কিন্তু 'সাংবাদিকতার ধরন' তার অজানা। পত্রিকায় কবিরের ব্রিজ-দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং এ কারণেই সম্পাদকের ওপর ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে মাহবুবের অবিচল ব্যক্তিত্ব এবং জনপ্রিয়তা শেষাবধি তাকে আশান্বিত করে। নাটকের শেষ দৃশ্যে মাহবুব এবং মনসুরের কথোপকথন উল্লেখযোগ্য :

> মাহবুব: তবে একটা কথা ভবিষ্যতে পলিসি ম্যাটারে, নিউজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে কে?
> মনসুর: আপনি নেবেন, যেমন নিচ্ছিলেন। অবশ্য যদি প্রযোজন মনে করেন। আমরা যদি কোনো সাহায্যে আসতে পারি– এনিথিং, আর কিছু? (অষ্টম দৃশ্য)

নাটকে নারী চরিত্রের মধ্যে রয়েছে পারু, সাহানা ও ডালিয়া। সাহানা পত্রিকার মহিলা বিভাগের সম্পাদক। পারু সাংবাদিক কবিরের স্ত্রী। স্বামীর অতিরিক্ত ব্যস্ততা কখনও কখনও হয়ে ওঠে তার অসহনীয় পীড়ার কারণ। এ কারণে স্বামীকে এ-পেশা থেকে নিবৃত্ত করতে চায় সে।

পত্রিকা অফিসে ঘটে যাওয়া ছোটো-খাটো বিষয়গুলোও চিত্রিত হয়েছে *রজনী*তে। সাব-এডিটর এবং রিপোর্টারদের পারস্পরিক সম্পর্ক উপস্থাপিত হয়েছে মুনীর এবং কবিরের সংলাপে। গভীর রাতে কাজের ভারে ক্লান্ত মুনীর পত্রিকার রিপোর্টারদের উদ্দেশে ব্যক্ত করে তার মনের জমায়িত ক্ষোভ :

> রাত জেগে খাটার বেলায় আমরা। ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে অফিস করার বেলায় আমরা। আর পার্টি আর ফাংশনের বেলায় রিপোর্টার। তারপর আবার অ্যাডভান্সড। (প্রথম দৃশ্য)

অন্যদিকে কবিরের কাছে মনে হয় মুনীরের কাজই অধিকতর সহজ। কেননা–

> গাধার মতো খাটার নাম রিপোর্টিং। ভাই তোমাদের দেখলে হিংসে হয়। এজেন্সি মেসেজ তুলে মেরে দিয়ে খচ্‌খচ্‌ করে দু-কলম লিখে দিলেই কেল্লাফতে। (প্রাগুক্ত)

পত্রিকা অফিসে আগমন ঘটে নানা ধরনের মানুষের এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় বিভিন্ন জটিলতার। এতৎসম্পর্কিত বিষয়গুলোও নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে *রজনী*তে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দুজন যুবক পত্রিকা অফিসে একটি অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা দাবি করে এবং সাব-এডিটর হেমায়েত তা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তারা অনুষ্ঠানের সংবাদ ছাপানোর জন্য আবদার করে। এরকম নানা বিষয় উঠে এসেছে আনিস চৌধুরীর *রজনী* নাটকে।

ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় অবলম্বনে রচিত *রজনী* আনিস চৌধুরীর নাট্যসম্ভারে এক অভিনব সংযোজন। একটি পত্রিকা শুধু ভয়ানক সংবাদই উপস্থাপন করে না, কখনও কখনও এর ভেতরের পরিবেশও হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। এ বিষয়টি জীবন্ত হয়ে উঠেছে নাট্যকারের অভিজ্ঞতাসূত্রে। একইসঙ্গে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির জোরে মধ্যবিত্তের সুস্থ-সুন্দর সাংস্কৃতিক জীবনচেতনাকে যে অনেকসময় পর্যুদস্ত ও বাধাগ্রস্ত করা যায় না, অন্যায়-অসত্যের সঙ্গে যে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সবসময় আপস করে না এবং তাদের সমন্বিত কণ্ঠস্বরের কাছে সুবিধাভোগীরা যে কতটা অসহায় হয়ে পড়ে– তাই প্রতিফলিত হয়েছে *রজনী* নাটকে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে আনিস চৌধুরী এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। ভারত-বিভক্তির পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে তাঁর সদর্প আত্মপ্রকাশ ঘটে। ব্রিটিশ রাজত্বকাল, পাকিস্তানি আমল এবং বাংলাদেশ –এই তিন কালের পরিমণ্ডলে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর সাহিত্যিক চেতনা। শিল্পসাহিত্যের বিচিত্র শাখায় বিচরণ করলেও তাঁর প্রতিভার সর্বাধিক স্ফূরণ ঘটেছে নাট্যধারায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে যাঁরা বাংলা নাট্যচর্চায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। ইতিহাস কিংবা পুরাণ নয়, মূলত নাটকের বিষয়গত উপাদান তিনি আহরণ করেছেন সমকালীন জীবন থেকে। যে-জীবন তিনি যাপন করেছেন সেই জীবনের মর্মমূল থেকেই তিনি আহরণ করেছেন তাঁর নাট্যশিল্পের উপাদান। বাংলাদেশের নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের যথার্থ রূপকার তিনি। মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বেদনা-বিলাপ, অবক্ষয়, পলায়নপরতা, ভঙ্গুর মূল্যবোধ তাঁর নাটকে অর্জন করেছে শিল্পমূল্য।

মূলত কলকাতা-বিচ্ছিন্ন পূর্ববাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন আনিস চৌধুরী। তাই তাঁর নাটকের সব চরিত্রই বলা চলে মুসলিম ধর্মাবলম্বী। এ জনগোষ্ঠীর জাগরণ ও সামাজিক অবস্থান নিঃসন্দেহে তৎকালীন কলকাতা-সংলগ্ন প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্তের অনুরূপ নয়। এরা নব্যশিক্ষিত বলেই এদের কর্ম, চিন্তা-চেতনা বা সংস্কৃতিচর্চা তুলনামূলকভাবে আধুনিক কিংবা অভিজাত নয়। কারণ এদের নিয়ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে তীব্র জীবনসংগ্রামের মধ্যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরূহ সংকল্পে। আত্মপ্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে এদের সকলেই যে সফল হয়েছে, তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নব্যবিকশিত এ শ্রেণির পরাজয় ছিল অনিবার্য। তাদের শূন্যতা ও হতাশাবোধের সুরই আনিস চৌধুরীর নাটকে পূর্বাপর প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আনিস চৌধুরীর নাটকে চিত্রিত অধিকাংশ মধ্যবিত্তই পেশাজীবী। কেউ স্কুলের শিক্ষক (মজিদ, কলিম), কেউ কলেজের অধ্যাপক (ইনাম), কেউ ডাক্তার (ডা. নিসার), কেউ ব্যবসায়ী (আলিম), কেউবা সাংবাদিক (কবীর, মাহবুব, শহীদ, মুনীর, হেমায়েত, নাজির)। তাঁর নাটকে চাকরি-সন্ধানী বেকার যুবকের তালিকাও তুলনামূলক দীর্ঘ। এ তালিকায় রয়েছে শওকত, কবীরসহ অনেকে। পাশাপাশি কর্মজীবী মধ্যবিত্ত নারীও আনিস চৌধুরীর নাটকে অর্জন করেছে নতুন মাত্রা। তবু *অনন্যের* রাশিদা কিংবা *তারা ঝরার দিনের* রুবি তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

নারীসমাজের প্রেক্ষাপটে অনেকটা প্রাগ্রসর; যারা প্রয়োজনের তাগিদে নারীর সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে আপস করেনি; বরং স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে। অন্যদিকে *বলাকা অনেক দূরের* নায়িকা কেয়া কর্মজীবী না হলেও স্বামীর বিবেকহীন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেনি বা স্বামীকে সমর্থন করেনি; বরং সর্বদাই বজায় রেখেছে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা। নাটকে কেয়ার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ চোখে পড়ার মতো।

এই অভিসন্দর্ভে নাটকের প্রবণতা বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আনিস চৌধুরীর নাটকগুলোকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে : বিভাগোত্তরকালের নাটক ও স্বাধীনতা-উত্তরকালের নাটক। বলাবাহুল্য বিভাগোত্তরকালের নাটকেই আনিস-প্রতিভার সর্বাধিক পরিস্ফুটন ঘটেছে। এ পর্যায়ের নাটকেই তাঁর শিল্পসত্তা সর্বাধিক উচ্চকিত হয়েছে। তাঁর *মানচিত্র* কিংবা *এ্যালবাম* শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। বাংলা নাটকে মধ্যবিত্ত-জীবনের এরূপ বাস্তবধর্মী ছবি অন্যত্র প্রদর্শিত হয়েছে বলে মনে হয় না। *মানচিত্রের* মজিদ মাস্টারের পরিণতি কিংবা *এ্যালবাম* নাটকের ইনামের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়ণে আনিস চৌধুরী যে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সমকালে তাঁকে প্রদান করেছে বিরল জনপ্রিয়তা। বলা যায় এ-দুটো নাটকের সঙ্গে আনিস চৌধুরীর নাম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অন্য নাটকগুলো তাই অনেকটা লোকদৃষ্টির আড়ালেই চলে গেছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের নাটকে আনিস চৌধুরী প্রায়শ নগরকেন্দ্রিক। নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ক্রমবিবর্তমান মধ্যবিত্তের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর জীবনপরিবেশে, বিশেষত পঁচাত্তরের রক্তাক্ত পালাবদলের পর সমরশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধের অবক্ষয়, রুচিবিকৃতি, অনৈতিক লোভ-লালসার যে ঘৃণ্যচিত্র প্রকটিত হয়ে ওঠে তার প্রকৃত চিত্রই প্রতিবিম্বিত হয়েছে এ-পর্যায়ের নাটকে। লক্ষণীয় যে, এ পর্যায়ের প্রায় সবগুলো নাটকই বেতার ও টেলিভিশনের জন্য নির্মিত। তবে এই নাটকগুলো সমকালীন গণমাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও মঞ্চ-বিচ্ছিন্নতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই জনদৃষ্টির অন্তরালেই থেকে গেছে।

আনিস চৌধুরীর মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো জীবন-সংগ্রামী হলেও কোনো প্রচলিত সামাজিক প্রথা কিংবা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেনি। জেনারেল ম্যানেজারের অপকর্মের বিরুদ্ধে তবু *অনন্যের* রাশিদা প্রতিবাদ করলেও কোনো বিপ্লবী ভূমিকায় তাকে অবতীর্ণ হতে দেখা যায় না। বরং এক পর্যায়ে চাকরি থেকে পদত্যাগ করে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয় সে। একই পন্থা

অনুসরণ করেছে *মানচিত্রের* মজিদ মাস্টার, *এ্যালবামের* ইনাম কিংবা *যেখানে সূর্য* নাটকের কবীর। অবশ্য মধ্যবিত্তের বাস্তবধর্মী রূপায়ণের ক্ষেত্রে চরিত্রগুলোর এরূপ বৈশিষ্ট্য অপ্রত্যাশিত নয়। কেননা এ শ্রেণি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপসকামীই হয়।

নাট্যকার হিসেবে আনিস চৌধুরীর স্বীকৃতি সমকালীন নাট্যকার নুরুল মোমেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আসকার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী, কিংবা সিকান্দার আবু জাফরের মতো বিস্তৃত নয়– এ কথা সত্য। এর কারণ, ঢাকার তৎকালীন মঞ্চ আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে পারেননি তিনি। গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে বেতার এবং টেলিভিশন অঙ্গনেই তাঁকে সময় ও শ্রম দিতে হয়েছে অনেকবেশি। অবশ্য তাঁর এই কর্মোদ্যোগ যদি মঞ্চকেন্দ্রিক হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে *মানচিত্র* কিংবা *এ্যালবামের* মতো তাঁর আরো কিছু অনবদ্য নাট্যকর্মে সমৃদ্ধ হতে পারতো বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি
বর্ণক্রম-অনুসারে

মূলগ্রন্থ

আনিস চৌধুরী :*উপন্যাসসমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬

আনিস চৌধুরী :*গল্প সংগ্রহ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

আনিস চৌধুরী :*চেহারা*, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৭৯

আনিস চৌধুরী :*নাটক সংগ্রহ*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০

আনিস চৌধুরী :*মানচিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ১৯৭৬

আনিস চৌধুরী :*মানচিত্র (ড.দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত)*, পাঠকবন্ধু লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৯৯

সহায়ক গ্রন্থ

আবদুল মওদুদ :*মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত) :*সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী –দ্বিতীয় খণ্ড* বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৭

আবুল কাসেম ফজলুল হক :*উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য*, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাসেম ফজলুল হক :*আশা- আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৩

আবুল আহসান চৌধুরী ড. (সম্পাদিত) :*মীর মশাররফ হোসেন নাট্য-সমগ্র*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯৯

আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) :*দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ বিরচিত লায়লী মজনু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, নবম মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১২

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ :*বাংলার মধ্যবিত্তের বিকাশ*, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৮২

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ :*পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ (সংশোধিত) : ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

গিয়াস শামীম :*বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০২

গীতা সেনগুপ্ত ডক্টর :*বিশ্বরঙ্গারয় ও নাটক*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫

চঞ্চল কুমার বোস :*বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৯

জিয়া হায়দার :*নাট্য ও নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৫

নীলিমা ইব্রাহিম :*বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৭৯

প্রণব চৌধুরী (সম্পাদিত) :*বাংলাদেশের সাহিত্যের আলোচনা-পর্যালোচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত) :*শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*,বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ: বৈশাখ ১৪১৮

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লব হুমায়ূন :রবীন্দ্রনাথ : তৃতীয় দশ বছর, মূধণ্য, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১

বিষ্ণু বসু :*বাংলা নাট্যরীতি*, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ : বইমেলা ১৯৯৬

মাহবুবা সিদ্দিকী :*সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.) :*কালকেতু উপাখ্যান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৪১৪

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান :*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৩

মোবারক হোসেন (সংকলিত ও সম্পাদিত) :*একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৬৩-১৯৭৬)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৫

মোবারক হোসেন (সংকলিত ও সম্পাদিত) :*একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৭৭-১৯৭৯)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৬

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান :*বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৯

মোঃ জাকিরুল হক :দুই *বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৭

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন :মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯৮

রফিকুল ইসলাম :*বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮১

রফিকউল্লাহ খান :*বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭

রথীন্দ্রনাথ রায় ডক্টর (সম্পাদিত) :*দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী*– প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ: জুন ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত) :*নির্বাচিত নাটক : আবদুল্লাহ আল মামুন*, নালন্দা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত) :*বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৬

শ্রী অশোক সেন :*রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮২

শ্রী প্রমথনাথ বিশী :*রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ : আগস্ট ১৯৬৬

শ্রী বিভাস রায়চৌধুরী :*নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা*– (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংযোজিত সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৮১

সাঈদ আহমদ :*শেষ নবাব*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮

সাঈদ আহমদ :*সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক* , বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৭৬

সুকুমার বিশ্বাস :*বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

সেলিম আল দীন :*মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৬

সেলিম মোজাহার :*স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

সৈয়দ আকরম হোসেন :*বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ :*উপন্যাসসমগ্র*, প্রতীক, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দা খালেদা জাহান :*বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৩

সৌরভ সিকদার :*জীবনী গ্রন্থমালা : আনিস চৌধুরী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৫

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) :একুশে ফেব্রুয়ারী, সময় প্রকাশন, ঢাকা, সময় প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০১

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Anis Chowdhyry :*The Perfrct Model and Other Stories* (Translated by Kaiser Haq), weiters link, Dhaka, First published 2010

Muhammad Shahidullah Dr. :*Buddhist Mystic Songs*, Mowla Brothers, Dhaka, First Mowla Brothers Edition: February 2007

সহায়ক প্রবন্ধ

গিয়াস শামীম :'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক', *শ্যামলিমা* (রামপদ হালদার সম্পা.), ২০১৫, জগন্নাথ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মীর হুমায়ূন কবীর :'সিকান্দার আবু জাফরের নাটক : সিরাজ-উ-দ্দৌলা', *শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা*, দ্বিত্রিংশ বর্ষ (প্রথম সংখ্যা), ১৪২০ বঙ্গাব্দ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা

:'সিকান্দার আবু জাফরের রূপক নাটক', *সাহিত্য গবেষণাপত্র*, বর্ষ ॥ ১ সংখ্যা ॥ ১ অগ্রহায়ণ ১৪২১, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন :'সরদার জয়েনউদদীনের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা', *সাহিত্য পত্রিকা*, একত্রিংশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৩৯৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সহায়ক পত্রিকা

প্রথম আলো :ঈদ সংখ্যা, আগস্ট-২০১৩
সাপ্তাহিক বিচিত্রা :১৫ নভেম্বর ১৯৯০
দৈনিক সংবাদ :১৫ নভেম্বর ১৯৯০
দৈনিক আজাদী :১০ নভেম্বর ১৯৯০
সচিত্র সন্ধানী :১৩ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ৯ নভেম্বর ১৯৯০

সহায়ক ভিডিও ডকুমেন্টারি

ভিডিও ডকুমেন্টারি :গ্রন্থনা ও পরিচালনা আনিসুল হক বরুণ